বাংলার শ্রমশক্তি

সম্পাদক

রঞ্জিত সেন

অরুণা প্রকাশন
২, কালিদাস সিংহ লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ ঃ ১৪ এপ্রিল, ২০০০

প্রকাশক ঃ

শ্যামল ভট্টাচার্য্য
২, কালিদাস সিংহ লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯
ফোন নং ঃ ২৩৫২ ৭৬৬৩/৯৩৩৯৮৩১২৮৫

লেজার কম্পোজ ও মুদ্রণে ঃ

অরুণা প্রিন্টার্স
২, কালিদাস সিংহ লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯

প্রচ্ছদ ঃ
অরুণা প্রিন্টার্স
২, কালিদাস সিংহ লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯

যাদের শৃঙ্খল ছাড়া হারানোর কিছুই নেই
তাদের

ভূমিকা

বাংলার শ্রমশক্তির যে বিবর্তন বিংশ শতাব্দীতে দেখা গিয়েছিল তা বিস্ময়কর। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে হয়ত-বা ১৮৭০-এর দশকের কোন সময় থেকে বাংলার শ্রমিক শ্রেণীর উদ্ভব হতে থাকে। চটকল শ্রমিক, চা-শ্রমিক, বন্দর ও ডক শ্রমিক, ট্রাম ও রেল কোম্পানীর শ্রমিক ইত্যাদি নানা স্তরের শ্রমিকদের নিয়ে গড়ে উঠেছিল বাংলার শ্রমজীবী সমাজ। শহর কলকাতার যখন জন্ম হয়েছিল তখন নগরজীবনের চাহিদা মেটাতে আত্মপ্রকাশ করেছিল গোয়ালা, ধোপা, নাপিত, মুচি, গাড়োয়ান প্রভৃতি নানা জীবিকার মানুষ। নগরায়ণের সঙ্গে এল শিল্পায়নের ধারা। এই ধারায় জন্ম নিল আধুনিক শ্রমিক শ্রেণী। দেশের আধুনিক শিল্পের প্রথম পর্যায়ে কৃষক, তাঁতী, কারিগর, ভূমিহীন-সরঞ্জামহীন বিভিন্ন ধরনের মানুষরা পাশাপাশি অবস্থান করতে লাগল। তাদের মধ্য থেকে গড়ে উঠেছিল আধুনিক শ্রমিক শ্রেণী। অবহেলিত অথচ সভ্যতার বনিয়াদি পর্যায়ের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় যে মানুষ তাদের উত্থানের, তাদের গঠন-বিন্যাসের, তাদের নেতৃত্বের ও আনুগত্যের নানা দিক আলোচিত হয়েছে এই বইয়ে। এই বইয়ের দুই মলাটের মধ্যে পাওয়া যাবে অসংখ্য তথ্য, আর তাদের ঘিরে নানা প্রশ্ন, নানা মন্তব্য, নানা তত্ত্ব — যার থেকে জন্ম নিয়েছে বাংলার শ্রমশক্তি সম্বন্ধে এক প্রজ্ঞা। এই প্রজ্ঞাই ইতিহাসের অন্ধকারে প্রদীপ্ত করে মানুষের অন্য এক মুখ। কিন্তু এই মুখেই আছে নিঃসীম কোন বেদনার বিরামহীন আভাস। শ্রমিকদের মধ্যে পুরুষের সাথে সমানতালে কাজ করে নারী, কিন্তু তাদের মর্যাদা স্বীকৃত নয় কেন? নেতৃত্বের উচ্চতর পর্যায়ে তাদের অবস্থান কতটুকু? ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন কী জবাব দেবে এই প্রশ্নের? খেটে খাওয়া মানুষদের পাশে সংগঠন করেছিলেন প্রশাসনিক পর্যায়ের নিম্নকর্মীরা — কারণিকরা। তাদের কী আমরা বাংলার শ্রমশক্তির অন্তর্ভুক্ত করে আলোচনা করব? ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলার শ্রমশক্তি কী কোন ইতিবাচক ভূমিকা গ্রহণ করেছিল? এ সমস্ত প্রশ্নের মীমাংসা আছে এই বইতে — এই প্রথম, সাবলীল কথায়, বাংলা ভাষায়। যে কথা ঐতিহাসিকরা এতদিন আড়াল করে রেখেছিলেন তারই সবিস্তার উপস্থাপনা আছে এই বইয়ের ছত্রে ছত্রে। গবেষণা পরিবর্তন করে ধারণা। এই বই তারই ইস্তাহার।

এই ইস্তাহারের মূল কথা কী? তা সম্ভবত এই: শ্রমিক সভ্যতার পিলসুজ। তার শ্রম ছাড়া সভ্যতার বাতি জ্বলত কিনা, সভ্যতার চাকা ঘুড়ত কিনা, আদিম মানুষ প্রস্তর যুগ থেকে তার যাযাবর বৃত্তি ছেড়ে স্থিতিশীল কৃষিজীবনে আসতে পারত কিনা তা নিয়ে কোনদিন তর্ক ওঠেনি। শ্রমিক-কৃষক — এক কথায় শ্রমজীবী মানুষ — সভ্যতার অন্তর্পটের স্থায়ী শক্তি, চিরন্তন, অনির্বাণ, অপরাজেয়। কিন্তু সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে শ্রমজীবী মানুষের সামাজিক পশ্চাৎ-অপসারণ প্রায় নিয়ত ও নিশ্চিত ঘটনা হয়ে দাঁড়াল। পেশী শক্তিকে আড়াল করে সভ্যতা নিয়ে এল যন্ত্রশক্তিকে, প্রথমে বাষ্পতাড়িত, পরে বিদ্যুৎচালিত যন্ত্রশক্তি। মানুষের ও পশুর উভয়ের পেশী শক্তি হার মানল যন্ত্রশক্তির কাছে। কিন্তু মানুষ অপরাভূত, তার মেধা ও মনন, তার বল ও কৌশল তার প্রয়োগ ও পরিচালন — এ সবের কাছে যন্ত্র কতখানি স্বপ্রণোদিত, স্বশক্তিমান? মানুষ সৃষ্টি করেছে যন্ত্র। মানুষই চালায় যন্ত্র। মানুষই রূপ দেয় যন্ত্রের সমস্ত সার্থকতাকে। ফলে যন্ত্র কোথাও কোথাও শ্রমের বিকল্প হলেও কোনদিনই শ্রমিকদের বিকল্প হতে পারল না। কিন্তু পরিবর্তন আসল গোপনে, ভিন্নপথে। পুঁজির যিনি মালিক সচরাচর তিনিই হয়ে দাঁড়ালেন যন্ত্রের মালিক। শ্রমিকের যন্ত্রস্বত্ব

রইল না, তা হয়ে দাঁড়াল মালিকের পুঁজিপতির। আগে শ্রমিক কারিগররা নিজেদের ছোটখাটো যন্ত্র, হাতিয়ার নিয়ে কাজ করত। তাদের কর্মশালা ছিল হয় নিজের বাড়িতে না হয় ছোট ছোট কারখানায়। আঠারো শতক থেকে এল শিল্পবিপ্লব, বড় বড় কারখানা ও ফ্যাক্টরির যুগ। শিল্পায়নের উদ্যোগ, প্রসার ও কলরোলে ডুবে গেল সনাতন শ্রমিক কারিগর। কৃষকরা ভিন্ন প্রক্রিয়ায় গ্রাম থেকে উঠে আসতে লাগল শহরে। ছিন্নমূল কৃষক কারিগররা ভিড় জমালো শহরের আনাচে-কানাচে, বড় বড় কল-কারখানার চৌহদ্দির মধ্যে গড়ে ওঠা ঘনীভূত বস্তির নোংরা, ঘিঞ্জি, অন্ধকার, অস্বাস্থ্যকর বেষ্টনীর মধ্যে। এইভাবে তৈরী হল আধুনিক শ্রমিক — সর্বহারার দল যাদের শৃঙ্খল ছাড়া আর হারাবার কিছুই রইল না। তাদের সম্পত্তি ছিল একটাই — প্রকৃতির দান — তাদের গায়ের শক্তি, তাদের শ্রম। বাজারে প্রতিযোগিতা মূলক মূল্যে (competitive price), কখনো বা অধোমূল্যে (depressed price) তারা বিক্রয় করে দিত তাদের শ্রম। বড় বড় শিল্প হল সেইসব শ্রমবিক্রয়ের বাজার। বেশীরভাগ সময়ে অত্যন্ত স্বল্পমূল্যে তাদের শ্রম কিনে নিত শিল্পের মালিক, পুঁজিপতিরা। তলিয়ে যাওয়া ভাগ্যের অসহায় আবর্তনে সভ্যতার আদিশক্তি এই শ্রমজীবী মানুষ তার শতাব্দী পরম্পরার অসহায়তাকে বিধিলিপি বলে মেনে নিত এবং তা মেনে নিয়ে কুব্জ দেহে ন্যুব্জ পৃষ্ঠে সভ্যতার ভার বহন করে তার চাকাকে ঘুরিয়ে চলত উদয়াস্ত। কাল নিরবধি, তাই শ্রমের এই বিশীর্ণ, বিদীর্ণ, বিপন্ন চিত্রটিও আবহমান, আজও সমানভাবে চলছে।

ইতিহাসের এক মার্ক্সবাদী ছাত্ররূপে বাংলাদেশে শ্রমিকদের এই চিত্রটিকে আমি বুঝতে চেয়েছিলাম। যাঁরা এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধাবলী লিখেছেন তাঁরা সকলেই নিজেদের মত করে আমাকে এই কাঙ্ক্ষিত বিষয়টি বুঝতে সাহায্য করেছেন। তাঁদের সকলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। আমার ছাত্রছাত্রীদের শ্রেণীকক্ষে পড়াতে গিয়ে অনেক প্রশ্ন অনেক সময়ে আমার মনে জমা হয়েছে যা অন্যথায় হয়ত উত্থিত হত না। তাই হয়ত অজান্তে আমার ছাত্রছাত্রীরাও আমার প্রেরণা। সত্যিকারের সহযোগিতায় যিনি সারাক্ষণ আমার গবেষণার সঙ্গী হয়ে থাকেন তিনি হলেন আমার স্ত্রী ডঃ স্নিগ্ধা সেন। আর আমার গবেষণাকে যাঁরা মুদ্রণের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেন তাঁরা হলেন অরুণা প্রকাশনের কর্ণধার শ্রী শ্যামল ভট্টাচার্য্য ও তাঁর সহধর্মিনী শ্রীমতী অরুণা ভট্টাচার্য্য। এঁদের সকলের জন্য রইল আমার কৃতজ্ঞতা। অরুণা প্রকাশনের কর্মচারিবৃন্দ ও কলকাতা জাতীয় গ্রন্থাগারের পাঠকক্ষের কর্মচারি ও অধিকারিকবৃন্দ নানা সময়ে আমায় সাহায্য করেছেন। তাঁদের কাছে আমি যথার্থভাবে ঋণী। এছাড়া কোন সারস্বত উদ্বোধনের কাজে থাকে অলক্ষ্যের বিপুল মানুষ, নানা খন্ডমুহূর্তের অসংলগ্ন জনতা। তারাই এ গবেষণা পুস্তকের অন্তরাল শক্তি। তারা বাংলার বৃহত্তর শ্রমজীবী মানুষের অংশ, শ্রমজীবীর ইতিহাস রচনায় তারা মুখ্য উপাদান। মুদ্রণশিল্পের শ্রমিকের ইতিহাস আজও লেখা হয়নি। আশা করি এই অনালোকিত, অবহেলিত শ্রমিকগোষ্ঠী কোনদিন কোন গবেষকের পরিষেবার মধ্যে এসে ইতিহাসের একটি সর্বজনীন শক্তিরূপে গ্রাহ্য হবে। শ্রমশক্তির প্রকৃত ইতিহাস রচিত হবে।

রঞ্জিত সেন

পূর্বকথা

পরাধীন ভারতে বাংলার শ্রমশক্তি কীরকম ছিল তা জানার আগ্রহ আমার অনেক দিনের। কিন্তু এমন বই আমি কখনোই হাতে পাইনি যার সাহায্যে আমি আমার আগ্রহ মেটাতে পারি। বই অনেক আছে কিন্তু এমন কোন বই নেই যার মধ্যে আমি শ্রমচর্চার প্রথম পাঠ গ্রহণ করতে পারি। তাই একদিন সাহস করে শ্রম-ইতিহাসের পন্ডিতদের শরণাপন্ন হই। তাঁদের অনুবোধ করি এমন কয়েকটি প্রবন্ধ লিখে দিতে যার মধ্যে পরিসংখ্যান থেকে বেশি থাকবে সরল বর্ণনা, বিতর্কের থেকে বেশি থাকবে সহজ আলোচনা, আর সব মিলিয়ে সাধারণ পাঠকদের জন্য থাকবে সাধারণ ভাবনা। আমার আবেদনে সাড়া দিয়ে গবেষক-শিক্ষকরা লিখে দিলেন বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ যেগুলি পাঠ করলে মোটামুটিভাবে ঔপনিবেশিক কালের বাংলার শ্রমজগতের একটা ধারণা পাওয়া যায়। ইংরাজী ভাষায় যাকে বলে exhaustive অর্থাৎ জ্ঞানের নিঃশেষ উপস্থাপনা তা বর্তমান প্রবন্ধগুলির একটিও নয়। তার কারণ প্রবন্ধগুলির লেখক লেখিকারা তাঁদের লেখায় পন্ডিতি করতে চাননি — চেয়েছেন তাঁদের অধীত বিদ্যার সরল উপস্থাপনা যা সাধারণ পাঠক-পাঠিকার বোধগম্য হবে। এই বইটির পেছনে লক্ষ্য একটাই — গবেষকদের জ্ঞান ও শিক্ষকদের উপলব্ধিকে একটি সংশ্লেষের মধ্যে আনা যার দ্বারা শ্রমজগতের ব্যাপ্ত কর্মক্ষেত্রের কিছু কিছু আভাস দুই মলাটের মধ্যে ধরে রাখা সম্ভব হয়। লেখক-লেখিকারা সম্মিলিতভাবে একটি প্রজন্মের মানুষ নন। সত্তরোর্ধ বয়স থেকে তিরিশের কোঠায় দাঁড়িয়ে থাকা মানুষদের লেখাকে সাজানো হয়েছে লেখক-লেখিকার বয়ঃক্রম ও পরিচিতির অগ্রগণ্যতাকে মাথায় রেখে। যেহেতু আলোচ্য বিষয়গুলি কোন একটি সামগ্রিক ঐক্যের মধ্যে বিধৃত নয় সেইহেতু লেখার পরম্পরাকে এইভাবে সাজানো হয়েছে।

আসামে চা-কুলি আন্দোলন কানাইলাল চট্টোপাধ্যায়ের একটি বিশিষ্ট রচনা। আমাদের দেশে শ্রমজীবী সচেতনতা কীভাবে এল, উনিশ শতকের সংস্কার আন্দোলনের সঙ্গে তা কীভাবে জড়িত ছিল তা এখানে আলোচিত হয়েছে। এই আলোচনার প্রেক্ষিতেই বিচার করা হয়েছে আসামের চা কুলি আন্দোলন। এছাড়া আছে আরও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য — আসামে চা আবিষ্কার, আড়কাটি ব্যবস্থা ও চা-শিল্পে শ্রমজীবী নিয়োগ, কীভাবে কুলি সংগ্রহ করে আসামের চা বাগানে পাঠানো হত ইত্যাদি। এছাড়া আছে আড়কাটিদের সঙ্গে ব্রিটিশ চা-মালিকদের সম্পর্ক, কুলিদের প্রতি সেই মালিকদের হৃদয়হীনতা এবং তৎসংলগ্ন নানা তথ্যাবলি। উনিশ শতকের শেষের দিকে ব্রাহ্মযুবকেরা ভারতীয় প্রান্তিক অর্থনীতির এই অবহেলিত দিকটির প্রতি আকৃষ্ট হন এবং ব্রিটিশ

সরকারকে বাধ্য করেন দেশের চা-শিল্পে কুলি আইন সংশোধন করতে। মনে রাখতে হবে যে শ্রমজীবী মানুষদের সম্পর্কে শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর বাঙালির একটা সচেতনতা অনেক দিন থেকেই গড়ে উঠছিল। রামমোহনের যুগ থেকে শুরু করে ইয়ং বেঙ্গলের যুগ হয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের সময় পর্যন্ত ব্যাপ্ত কালের পরিধিতে যে চেতনা গড়ে উঠেছিল তাকেই ব্রাহ্ম যুবকেরা এক বৃহত্তর আন্দোলনে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেই অর্থে প্রগতিশীল ব্রাহ্মযুবকেরা ছিলেন এক জাতীয় উদ্বোধনের বেতনবাহী মানুষ।

দীপিকা বসুর **বাংলায় আধুনিক শিল্প শ্রমিকের জন্ম ঃ কৃষক থেকে শ্রমিক** একটি অনবদ্য রচনা। শ্রমিকের জন্ম পুঁজিবাদের আবির্ভাবের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটি ঘটনা — বলা যেতে পারে যে পৃথিবীর ইতিহাসে শিল্পযুগ সূচনার একটি প্রাসঙ্গিক বিষয়। এই বিষয়কে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দীপিকা বসু ইউরোপের শ্রমিক ইতিহাসের প্রসঙ্গ টেনে এনে বাংলার আধুনিক শিল্প শ্রমিকদের উদ্ভব বর্ণনা করেছেন। ঐতিহাসিক ই.পি. টমসন ইংল্যান্ডের শ্রমিক শ্রেণীর নির্মাণের ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন যে এটি একটি ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া ... কোন এক নির্দিষ্ট সময়ে সূর্য ওঠার মতো তার আবির্ভাব ঘটেনি। এই প্রক্রিয়ার মধ্যে ছিল আধুনিক শিল্প শ্রমিকদের পূর্বসূরীরূপে কারিগর ও অন্যান্য শ্রমজীবী মানুষদের উত্থান, তাদের প্রসার এবং তাদের সংগ্রামী ঐতিহ্যের নানা দিক। এর প্রেক্ষিতেই বলা যেতে পারে আমাদের দেশের শিল্প শ্রমিকরাও হঠাৎ করে গড়ে ওঠেনি। তাদের আত্মপ্রকাশের অন্তরালে আছে প্রাকশিল্পায়ন শ্রমজীবী মানুষের উত্থান, তাদের বিস্তার ও তাদের সংগ্রাম ও আত্ম-উৎক্ষেপণের ধারাবাহিক ঐতিহ্য ও অন্যান্য নানা দিক। আমাদের দেশে আধুনিক শিল্পের সূচনায় আছে কৃষক, তাঁতী, কারিগর ও ভূমিহীন, সরঞ্জামহীন বিভিন্ন ধরণের মানুষদের পাশাপাশি অবস্থানের চিত্র। তারা কখনো নিজেদের জীবিকায় নিবিষ্ট থেকেছে, কখনো-বা জীবিকাচ্যুত হয়েছে, কখনো-বা একক কখনো-বা সংঘবদ্ধভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে, কখনো-বা স্বতন্ত্র বা সম্মিলিতভাবে পলায়ন করে দেশের অর্থনীতিতে সঙ্কট ঘনিয়ে তুলেছে। এ সমস্ত কিছুর মধ্য থেকে তাদের সমবেত প্রতিরোধ লক্ষ্যণীয় বিষয় হয়ে উঠেছে। ইতিমধ্যে কলকাতা শহরের উত্থান ঘটেছে। নগর জীবনের চাহিদা মেটাতে নতুন পেশার জন্ম হয়েছে — গোয়ালা, ধোপা, নাপিত, মুচি, গাড়োয়ান প্রভৃতি মানুষেরা সমাজ জীবনে অপরিহার্য হয়ে উঠেছে এবং শেষ পর্যন্ত নানা নাগরিক বঞ্চনার শিকারও হয়েছে তাবা। সময়-সময়ে তারা নানা শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সামিল হয়েছে তাদের নিজস্ব কায়দায়। আদিপর্বের এইসব শ্রমজীবী জনগণের বিক্ষোভ ও আন্দোলনকে আধুনিক শ্রমিক আন্দোলনের সূচনাপর্ব বলা যেতে পারে। বর্তমান সম্পাদকের কাছে পাঠানো একটি প্রতিবেদনে দীপিকা বসু লিখেছেন যে বাংলাদেশে আধুনিক শিল্পের মধ্যে প্রধান ছিল চটশিল্প। এই চটকল শ্রমিকদের

আন্দোলনের ইতিহাস সমীক্ষা করলেই দেখা যায় কিভাবে তারা ধীরে ধীরে স্বতঃস্ফূর্ত দাঙ্গা-হাঙ্গামার স্তর থেকে তাদের নিজস্ব দাবী-দাওয়া নিয়ে সংগঠিত আন্দোলনের স্তরে উন্নীত হয়েছে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে তাদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনারও আভাস পাওয়া গেছে। ১৯২১ সালে চটকল শ্রমিকদের অসন্তোষ একটি ব্যাপক সাধারণ ধর্মঘটে পরিণত হয় যা শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে নিঃসন্দেহে একটি নতুন ঘটনা। এই প্রেক্ষিত থেকে উত্থিত হয়েছে গবেষকের উপলব্ধি, ঐতিহাসিকের সিদ্ধান্ত — নিজের লেখা বর্তমান প্রবন্ধের শেষ কথা যা তিনি জানিয়েছেন বর্তমান সম্পাদকের লেখা তাঁর প্রতিবেদনে — "কাজেই শ্রমিকদের গড়ে ওঠার এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে দেখা যায় যে ফ্যাক্টরী লেবার কমিশনের (১৯০৮) সিদ্ধান্ত যে তারা ছিল মূলতঃ কৃষক, এদেশে শ্রমিক বলে কিছু ছিল না এও যেমন ঠিক নয় তেমনই আধুনিক গবেষকের বক্তব্য যে প্রাক ধনতান্ত্রিক সম্পর্কগুলি বজায় থাকায় শ্রমিকরা শ্রেণী হিসাবে গড়ে ওঠেনি — তাও মানা যায় না। নানা বাধা-বিপত্তি, পিছুটান সত্ত্বেও ধীরে ধীরে শ্রেণী হিসেবে তারা নিজেদের স্থান করে নিয়েছিল।"

আধুনিক শ্রমিকদের জন্ম হলে প্রশ্ন ওঠে যে শ্রমিকদের সংগঠন কী ছিল, তাদের নেতৃত্বে ছিলেন কারা? মহিলারা কী শ্রম-আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন? এই প্রশ্নগুলিকে মাথায় রেখে কলম ধরেছেন মঞ্জু চট্টোপাধ্যায়, লিখেছেন তাঁর প্রবন্ধ **শ্রমিক আন্দোলন ও গোড়ার যুগের মহিলা নেতৃত্ব**। এই লেখাটি মানবীবিদ্যার (Women Studies) একটি অঙ্গও বটে। লেখিকা বলেছেন যে ১৮৬২ সালের মে মাসে হাওড়া স্টেশনের কুলিরা ৮ ঘন্টার কাজের দাবিতে একদিন ধর্মঘট করে। এইটিই লেখিকার মতে "ভারতের শ্রমিক জাগরণের প্রথম অস্ফুট সূচনা। তখন সংগঠনও নেই, নেতৃত্বও নেই" (সম্পাদককে প্রেরিত প্রতিবেদন)। উনিশ শতকের শেষে শ্রমিক জাগরণের প্রকৃত সূচনা হয়। বাংলা ও বোম্বাইতে চটকল ও সুতাকলের সংখ্যা বাড়তে লাগল, বাড়ল শ্রমিকদের সংখ্যাও। তার সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পেতে লাগল শ্রমিকদের উপর জুলুম ও অত্যাচার। দিনে ১৪-১৫ ঘন্টা কাজ করত তারা, কিন্তু মজুরি পেত কম। অত্যাচারের মুখে শ্রমিক শ্রেণী সংঘবদ্ধ প্রতিরোধের দিকে পা বাড়াল — দেখা দিল সংগঠন ও নেতৃত্ব। ১৯২০-তে তৈরী হল সর্বভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস।

শ্রমিকের উত্থান, সংগঠন ও স্থিতিশীলতা — এই প্রসারের মধ্যে নারীর ভূমিকা কী? বিভিন্ন কলকারখানায় নারী-পুরুষ-শিশুরা কাজ করত। অতএব নারী ও শিশুর নিরাপত্তার প্রশ্ন তুলল প্রথম ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস। দাবি করল যে কর্মস্থলে নারী ও শিশুরা অর্থাৎ মহিলা শ্রমিকের সন্তানদের নিরাপদে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। "আজও এ ব্যবস্থা হয়েছে বলে মনে হয় না। এখনও নারী পুরুষ শ্রমিকের মধ্যে

মজুরীর পার্থক্য আছে। নেতৃত্বে এবং সিদ্ধান্ত নেবার ব্যাপারেও মেয়েদের বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় না। এমনকি ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনেও মেয়েদের ক্ষমতা খুবই কম। আজও বহু কর্মস্থলে (প্রধানত বেসরকারী ক্ষেত্রে এবং চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকের ক্ষেত্রে) মেয়েদের মাতৃত্বকালীন সুযোগ-সুবিধা কিছুই দেওয়া হয় না। উচ্চশিক্ষিত ও উচ্চবিত্তের দ্বারা পরিচালিত জাতীয় কংগ্রেস শ্রমিক আন্দোলনকে স্বীকার করতেই চায় না" (প্রতিবেদন)। এই প্রেক্ষিতেই শ্রমিক আন্দোলনে মহিলাদের নেতৃত্বে আসাটা খুবই আশ্চর্যজনক বলে লেখিকার মনে হয়েছে। যুক্ত বাংলায় শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে নারীরা যুক্ত হয়েছিলেন বিশের দশকে। যাঁরা যুক্ত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে সন্তোষকুমারী দেবী ছিলেন "অন্যতমা এবং তিনিই সর্বপ্রথম।" তাঁর সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে লেখিকা যুক্তিসঙ্গতভাবেই উচ্ছ্বসিত — লিখলেন ঃ 'সন্তোষকুমারীর মতো মহিলা কেন পুরুষই বা কজন শ্রমিক আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছেন? গঙ্গার পার ধরে অজস্র চটকল — নৈহাটি থেকে বজবজ — সন্তোষকুমারী শ্রমিকদের সংগঠন করেছেন, আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন, 'শ্রমিক' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেছেন — প্রায় এক দশক ধরে তিনি শ্রমিকদের পাশেই ছিলেন — তিনি শ্রমিকদের 'মাইরাম'। সাহসী, অসাম্প্রদায়িক, রাজনৈতিক সঙ্কীর্ণতার এবং জাত-পাত সমস্যার ঊর্ধ্বে উঠে শ্রমিকদের জন্য কাজ করেছেন। শ্রমিক আন্দোলনকে জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে এক করতে চেয়েছেন' (প্রতিবেদন)। সন্তোষকুমারীর মত আরও নেত্রীর কথা লিখেছেন মঞ্জু চট্টোপাধ্যায়। যেমন ডঃ প্রভাবতী দাশগুপ্ত, যিনি ধাঙরদের বাঁচার লড়াই এবং চটকল আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন; সাকিনা বেগম যিনি ৩০-৪০-এর দশকে কর্পোরেশনের কাউন্সিলর হিসেবে ধাঙরদের আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন, তাদের দাবি-দাওয়া আদায় করার জন্য লড়েছেন; সুধা রায় ও ডাঃ মৈত্রেয়ী বসু যাঁরা বন্দর শ্রমিকদের মধ্যে আন্দোলন করেছেন; বিমল প্রতিভা দেবী যিনি আসানসোলে কয়লা খনির শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করেছেন। "অবাক লাগে," মঞ্জু চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, "এঁরা উচ্চশিক্ষিত উচ্চবিত্তের মানুষ—অথচ দেশের নিপীড়িত, দুর্গত মানুষের পাশে এসে অনায়াসে দাঁড়িয়েছেন — শুধুই কি নেতৃত্বের লোভে? দেশ এঁদের স্বীকৃতি দিল না — এমন কি ইতিহাসবিদরা এঁদের কথা বললেন না। মহিলা — তাই কী তাঁরা তাঁদের দৃষ্টির অগোচরে রয়ে গেলেন?"

উচ্চবিত্ত ও উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিরাই যে শ্রম আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তা নয়। সরাসরি শ্রমিক থেকে নেতৃত্বে উঠে এসেছিলেন বিলাসপুরের আদিবাসী মহিলা দুখমত দিদি। তিনি ছিলেন আলমবাজার চটকলের মহিলা শ্রমিক। তিনি আশ্চর্যভাবে পরিশ্রম করে মেয়েদের সংগঠনকে দাঁড় করিয়েছিলেন, নিষ্ঠার সঙ্গে, নিজের আহৃত দক্ষতাকে নিয়ে সমানভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন সব লড়াইয়ে, প্রশ্ন তুলেছিলেন

অবহেলিত নারী শ্রমিকদের নিয়ে — তাঁর উপলব্ধির গভীরে ছিল আরও বড় প্রশ্ন ঃ সব শ্রমিকদের দাবী-দাওয়া, দুঃখ-কষ্ট ত একই, তবে এত দল, এত ইউনিয়ন কেন? এতে কী মালিকের হাত শক্ত হচ্ছে না? "রাজনীতি ত তিনি শিখেছিলেন জীবন দিয়ে, বই পড়ে নয়।" (প্রতিবেদন)।

শ্রম আন্দোলনে মহিলা নেতৃত্বের কথা বড় করে লেখা না হলেও সে নেতৃত্বের অবদান, তার অগ্রগামিতা, তার দায়বদ্ধতা কম নয়। সুকুমারী চৌধুরীর কথাই ধরা যেতে পারে। স্বাধীনতার সময়ে দাঙ্গা বিধ্বস্ত বাংলা থেকে কলকাতায় আসার পর থেকে কি কর্ম্মমুখর তাঁব জীবন। জবর দখল কলোনীর অন্তর্গত হয়ে শুরু করলেন জীবন, নারী সেবা সঙ্ঘের কর্মী হলেন, তারপরে হলেন বেঙ্গল ল্যাম্পের শ্রমিক। সেখানে তিনি ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত হলেন, ইউনিয়নে নিয়ে এলেন মেয়েদের। সাহসের সঙ্গে লড়াই করলেন শ্রমিক স্বার্থরক্ষার সমস্ত কর্মসূচিতে, পরিণত হলেন নেত্রীতে। তাঁর সম্বন্ধে মঞ্জু চট্টোপাধ্যায়ের উক্তি, "ধর্মঘটে আছেন, পুলিসের লাঠির সামনে আছেন, নেই শুধু ধর্মঘট মেটাবার আলাপ-আলোচনার নেতাদের সঙ্গে।"

"ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন এটা কোনদিন ভাবলই না — আজও কি ভাবে?" (প্রতিবেদন)।

উনিশ শতকের শেষ থেকেই বাংলার শ্রম আন্দোলনের একটা বড় ধারা প্রকাশ পেয়েছিল কলকাতা ও খিদিরপুব ডক শ্রমিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। তার ইতিহাস চমৎকার করে লিখেছেন ইরা মিত্র। তাঁর প্রবন্ধ **"কলকাতা ও খিদিরপুর ডকে শ্রমিক সংগঠনের প্রথম তিন দশক ১৯০৫-১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দ"** ১৮৭০ এর দশক থেকে এই শ্রম আন্দোলনের ইতিহাস আলোচনা করেছে। এই দশকেই ব্রিটিশ পুঁজিতেই পত্তন হয়েছিল কলকাতা বন্দর। কলকাতার মহিমা তখন রমরমা, কারণ ব্রিটিশ সূর্য তখন মধ্য গগনে। সেই সময় থেকে পরবর্তী বহু বছর এই বন্দর ভারতীয় উপমহাদেশে সর্ববৃহৎ ও সবথেকে ব্যস্ততম বন্দর রূপে নিজের স্থান করে নিয়েছে। শ্রমিকদের সংখ্যাগত হিসাব ধরলে চটশিল্পের পরেই ছিল কলকাতার স্থান। বন্দরের পরিকাঠামোতে অনেকগুলি ভাগ ছিল। আর এই ভাগ অনুযায়ী শ্রমিক-কর্মীরাও নানা বিভাগে বিভক্ত ছিল — যেমন সিম্যান, জেটি ওয়ার্কার্স, মেরিনার্স, পোর্ট ওয়ার্কার্স এবং ডক ওয়ার্কার্স। সামগ্রিকভাবে কলকাতা বন্দরের প্রশাসনের দায়িত্ব ছিল কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টের উপর। পোর্ট ট্রাস্ট আবার অনেক সময়ে প্রশাসনের দায়িত্ব ভাগ করে দিতেন অন্য কোন সংস্থার উপর। যেমন জেটিগুলির দেখাশোনার ভার তারা ছেড়ে দিয়েছিলেন বার্ড কোম্পানীর উপর। বার্ড কোম্পানী ছিল একটি বিদেশী কোম্পানী। তাই কলকাতা ও খিদিরপুর ডকের নানা কাজকর্মের দায়িত্বভার অর্পণ করা হয়েছিল একদল দেশীয়

স্টিভেডরদের উপর। এই স্টিভেডররা নির্ভর করত ঘাট সর্দারদের উপর। এই ঘাট সর্দাররা দৈনিক মজুরির ভিত্তিতে প্রতিদিনেব প্রয়োজনীয় শ্রমিকদের যোগান দিত। এই শ্রমিক ও সর্দারদের সাহায্যে বন্দরের কার্যনির্বাহ হত। এই ব্যবস্থায় ঠিকাদারিটা একটা বড় ব্যাপার ছিল। আর সমস্ত ব্যবস্থায় বনিয়াদি পর্যায়ে এক বিপুল ভাসমান শ্রমশক্তি বন্দরের প্রাত্যহিক কাজকর্মের পরিচালিকা শক্তি হিসাবে কাজ করত। ইরা মিত্র বর্তমান সম্পাদককে লেখা একটি প্রতিবেদনে বলেছেন ঃ "সামগ্রিকভাবে হিসেব করলে ম্যারিন ও ডক — বন্দরের এই দুটি বিভাগের কাজকর্মের ধরণ অনুযায়ী এখানে দক্ষতা ছিল শ্রমিক নিয়োগের প্রধান মাপকাঠি। এতদসত্ত্বেও, অফুরন্ত শ্রমিক সরবরাহের কারণে একটি অনিয়ন্ত্রিত শ্রমের বাজার গড়ে উঠেছিল যা মালিকপক্ষকে বাজার বহির্ভূতভাবে শ্রমিকদের নানাভাবে পোষণের সুযোগ করে দিয়েছিল।" এই শ্রমপোষণ বন্দর শ্রমব্যবস্থার একটি বিশিষ্ট দিক।

একথা উল্লেখযোগ্য যে কলকাতা বন্দরে শ্রমিকদের মধ্যে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন শুরু করতে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল ডক শ্রমিকরা। উনিশ শতকের শেষ দশক থেকেই, বলা যেতে পারে যে ডকের কাজকর্ম শুরুর প্রায় প্রারম্ভিক পর্ব থেকেই, শ্রমিকদের মধ্যে উত্তেজনা ও জঙ্গী মনোভাব দেখা যেতে থাকে। মালিকপক্ষ ক্রমাগত শ্রমিক প্রতিবাদের সম্মুখীন হচ্ছিল। মালিক-শ্রমিক দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক এই সময় থেকেই সূচিত হচ্ছিল। শ্রমিকরা যে প্রথম থেকেই তাদের শোষণের ব্যাপারে সোচ্চার হচ্ছিল তা কম কথা নয়। কিন্তু তাদের যাবতীয় সোচ্চার হওয়া, তাদের প্রতিবাদ নিছকভাবেই তাদের 'প্রাথমিক চেতনাবোধ' থেকে উত্থিত হয়েছিল। কাল যত গড়িয়েছে শ্রমিক চেতনা ততই উন্নত হয়েছে। উচ্চতর চেতনা গড়ে তুলতে শ্রমিকদের সময় লেগেছিল। "শ্রমিক সংগঠন গড়ে ওঠার ব্যাপারে এই যে দীর্ঘ পথ পরিক্রমা তাতে ডক ও কলকাতা ট্রাম শ্রমিকদের ক্ষেত্রে যেটি বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় তা হল এ ব্যাপারে তাদের ধারাবাহিকতা। তৈরী হতে অনেক সময় লাগলেও শ্রমিকদের বিপথগামী হতে কখনও দেখা যায়নি। উদাহরণ স্বরূপ ১৯০৫-১৯০৮ সাল ও ১৯২০-১৯২২ সালের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে উচ্চতর চেতনাবোধের অনুসন্ধান তারা করেছিল। বিপরীতভাবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শুরু থেকে শেষ হবার সময়কাল এবং বিশেষ করে, হঠাৎ করে অসহযোগ ও খিলাফৎ আন্দোলনের পরিসমাপ্তির পর যে সাম্প্রদায়িকতার বাতাবরণ তৈরী হয়েছিল, অনুসন্ধানের ভিত্তিতে দেখা গেছে ডক ও ট্রাম শ্রমিকরা সেখানে একেবারেই অনুপস্থিত ছিল। বরং বলা যায়, দুঃসহ পারিপার্শ্বিক রাজনৈতিক পরিবেশ, উপরোক্ত উভয় সংস্থার শ্রমিকদের মধ্যে উন্নত চেতনাবোধ অর্জনের ব্যাপারে বেশি আগ্রহশীল করে তুলেছিল। আর উপরন্তু দুটি সংস্থার শ্রমিকদের মধ্যে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন সম্পর্কে যে ব্যতিক্রমী চরিত্র গড়ে উঠেছিল

তার মূলে ছিল উভয় সংস্থার পরিকাঠামোতে বিশেষ বৈশিষ্ট্য। উভয় ক্ষেত্রেই উচ্চবর্ণের দক্ষ মানুষকে শ্রমিক হিসাবে নিয়োগ করার সুযোগ ছিল। এর ফলে সংস্থাগতভাবে ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃত্ব গড়ে উঠত, সম্পূর্ণভাবে বাইরের নেতৃত্বের উপর নির্ভরশীল হতে হতো না।" (প্রতিবেদন) তাহলে প্রশ্ন জাগে বন্দর ও ডক শ্রমিকদের আত্মসচেতনতা, তাদের সংগঠন, তাদের মধ্যে নেতৃত্ববোধের উদ্বোধন — এসব কিছুর পেছনে মটিভেশন এসেছিল কোত্থেকে? এ প্রশ্ন বাংলার শ্রমশক্তির চর্চায় একেবারে অমীমাংসিত না থাকলেও, তার আলোচনা বেশীদূর অগ্রসর হয়নি।

ভারতের শ্রমশক্তি কী ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে প্রযুক্ত হয়েছিল? এ প্রশ্নের আলোচনা করেছেন অমল দাস তাঁর **বাংলার শ্রমশক্তি — ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাদের ভূমিকা** এই প্রবন্ধে। লেখক তাঁর প্রতিবেদনে জানিয়েছেন ঃ "ঐতিহাসিকরা ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের উঁচুতলার মানুষদের কীর্তি কাহিনী নিয়ে অনেক বেশি ইতিহাসচর্চা করেছেন। তুলনায় নীচুতলার মানুষদের কথা তেমনভাবে উঠে আসেনি। বরং দুই তিন দশক পূর্বেও তা প্রায় উপেক্ষিত থেকে গেছে।" এই প্রেক্ষিতেই লেখক একটি সামাজিক শ্রেণী হিসাবে উপেক্ষিত শ্রমিক শ্রেণীর স্বাধীনতা আন্দোলনে কী ভূমিকা ছিল, কী অবদান তারা রেখে গেছে তার আলোচনা করেছেন। প্রাথমিক পর্বে বাংলার শ্রমিক শ্রেণী উদ্ভবকালীন নানা সমস্যার জন্য পিছিয়ে পড়েছিল। তারপর ধীরে ধীরে তারা পরিশীলিত হতে থাকে; অভিজ্ঞতা, শিক্ষা আর নিজেদের সমাজ অবস্থানের দ্বান্দ্বিকতার দ্বারা তাড়িত হয়ে ক্রমশ একটি সুসংহত শ্রেণীতে পরিণত হয়। লেখকের বলা কথায় শ্রমিক শ্রেণীর অভিজ্ঞতাজাত পরিশীলন এইরকম ঃ "বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে বাংলার জনগণের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে বাংলার সাধারণ শ্রমিক শ্রেণীও সংগ্রামে নেমে পড়েছিল। তাদের প্রতিবাদী আন্দোলন এবং ধর্মঘট সবটাই ঘটেছে বিদেশী মালিকানাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিতে এবং চটকলে। স্বদেশী যুগে শ্রমিক বিক্ষোভের রাজনৈতিক গুরুত্বকে অস্বীকার করার উপায় নেই। তবে শ্রমিকদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা ও সংগ্রামী মনোভাব থাকা সত্ত্বেও বাংলার জাতীয়তাবাদী নেতারা তা কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয়েছিল" (প্রতিবেদন)। স্পষ্টতই বিংশ শতাব্দীর শুরুতে বাংলার শ্রমিক আন্দোলন ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলন পরস্পরের সঙ্গে একাত্ম হতে পারেনি। তখনও শ্রমিক নেতৃত্ব সবলভাবে গড়ে ওঠেনি। জাতীয় নেতৃত্বও সুসংগঠিতভাবে আত্মপ্রকাশ করতে পারেনি। মনে রাখতে হবে যে কংগ্রেস সংগঠন তৈরী হওয়ার পর থেকেও ভারতীয় রাজনীতি পূর্ণরূপ নেয়নি। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশিকতায় যা আত্মপ্রকাশ করেছিল তা হল এজিটেশনের রাজনীতির প্রাথমিক রূপ। তখনও বিস্ফারিত স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু হয়নি, অস্ফুট রাজনীতির অন্তঃকরণে তখনও সোস্যাল ইনক্লুসিভনেসের চেতনা বিকাশ লাভ করেনি এবং

সোস্যালি এক্সক্লুসিভ রাজনীতির অভিমুখী হয়ে তার রক্ষণশীলতাকে বিদীর্ণ করার ক্ষমতাও তখন বাংলার শ্রম আন্দোলনে গড়ে ওঠেনি। ফলে কেউই নিজের গন্ডির বাইরে আসতে পারেনি।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর পর্বে অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছিল। অস্বাভাবিক দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, শ্রমিকদের মজুরি হ্রাস, শ্রমিক ছাটাই, মালিকদের রুক্ষতা ও ঔদ্ধত্য, সরকারের অবহেলা, বিশ্ববাজারে অগ্রসরশীল মন্দা এবং তার জন্য অর্থনীতিতে সংকোচন এইসব নানা কারণে কলকাতা, বম্বে, মাদ্রাজে চটকল সহ বিভিন্ন কলকারখানায় শ্রমিক অসন্তোষ ও ধর্মঘট শুরু হয়। এটি ছিল ভারতবর্ষে রাজনৈতিক দিক পরিবর্তনের সময়। গান্ধীজি পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলন এই সময়ে খিলাফত আন্দোলনের সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়ে এক দেশব্যাপী নতুন বৃহত্তর আন্দোলনের সূচনা করেছিল। শ্রমিক শ্রেণী সেই আন্দোলনে যোগদান করে। স্বাধীনতা আন্দোলন ও শ্রম আন্দোলনের মধ্যে এইভাবে যোগসূত্র তৈরী হয়। শ্রমিকদের সাংগঠনিক কাজকর্ম দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং তাদের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা আস্তে আস্তে ম্যাচুরিটির দিকে অগ্রসর হয়। এইরকম পরিস্থিতি সত্ত্বেও গান্ধী পরিচালিত জাতীয় আন্দোলন কতখানি শ্রমিক আন্দোলনের প্রতি সহৃদয় আচরণ করতে পেরেছিল তা নিয়ে ভাবনার অবকাশ আছে। অমল দাস লিখলেন "গান্ধীজি বা জাতীয় কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ সারা ভারতবর্ষ জুড়ে শ্রমিক আন্দোলনের প্রতি আশাব্যঞ্জক সাড়া দিতে পারেননি। তাঁরা শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মূল স্রোতের সঙ্গে সংযুক্ত করতে চাননি। বরং জাতীয় রাজনীতি, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও শ্রমিকশ্রেণীর এই সংগ্রামে অগ্রগণ্য ভূমিকা এক নতুন দিকে মোড় নেয় বামপন্থী রাজনীতি বা কম্যুনিস্টদের আসার পর থেকে। উভয়ের মেলবন্ধন একদিকে জাতীয় রাজনীতি ও স্বাধীনতা সংগ্রামকে যেমন জোরদার করে তোলে তেমনি অন্যদিকে শ্রমিক শ্রেণীর সংগঠনও অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে উঠতে শুরু করে।" (প্রতিবেদন)

শ্রমিক শ্রেণীর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতা না থাকলে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলন একটি বিস্ফারিত গণ-আন্দোলনের রূপ নিত কিনা বলা কঠিন। সাইমন কমিশন বিরোধী আন্দোলন উত্তাল হয়েছিল কারণ ভারতের তথা বাংলার শ্রমজীবী মানুষ সে আন্দোলনে নিজেদের সঁপে দিয়েছিল এমন কথা বলার মতন নির্ভরশীল তথ্য আমাদের হাতে নেই। কিন্তু শ্রম-জাগরণ ও শ্রম-আন্দোলন যে একটা বড় মাপের আলোড়নকে ঘনিয়ে তুলেছিল তাকে অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। কোন দেশে যখন কোন বিপ্লবের বাতাবরণ তৈরী হয় তখন তার পেছনে সেই দেশের শ্রমিক কৃষকদের অবদান থাকে। এই অবদান থেকেই আন্দোলনের ঢেউ উত্তাল হয়। একথা

স্মরণ রেখে অমল দাস লিখলেন ঃ "সাইমন বিরোধী আন্দোলন এক গণ আন্দোলনের রূপ নিল। শ্রমিক শ্রেণী জোরালো সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামে লিপ্ত হল। পূর্ণ স্বরাজের দাবীতে সভা-সমিতি, মিছিল করল। 'দুনিয়ার মজদুর এক হও', 'ভারতের স্বাধীন রিপাব্লিক দীর্ঘজীবি হউক' এই ধ্বনিতে কলকাতা ও ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে তারা ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলল। ব্রিটিশ সরকার ক্রমবর্ধমান শ্রমিক আন্দোলনে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। আন্তর্জাতিক স্তরেও উপনিবেশগুলিতে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন প্রবল আকার ধারণ করল। ১৯২৭-২৯ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে একের পর এক শ্রমিক অশান্তি ও ধর্মঘট সাম্রাজ্যবাদকে ভয় পাইয়ে দিল" (প্রতিবেদন)।

এইভাবে শ্রম-জাগরণ ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনে যখন ব্রিটিশ সরকার কোণঠাসা তখনই গান্ধীজি ডাক দিয়েছিলেন আইন অমান্য আন্দোলনের। শ্রমিক-উত্থানের প্রেক্ষিতে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলন নতুন পর্যায়ে উন্নীত হল। "গান্ধীজি অবশেষে পূর্ণস্বরাজের লক্ষ্যে পৌঁছাবার জন্য ইংরেজ বিরোধী সংগ্রামে অগ্রসর হলেন। শুরু হল আইন অমান্য আন্দোলন। ডান্ডি অভিযানে গান্ধীজির গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে যে গণ-বিক্ষোভ সারা ভারত জুড়ে হয়েছিল তাতে শ্রমিক শ্রেণী বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেছিল। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্তিম পর্যায়ে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পাশাপাশি শ্রমিক আন্দোলনের ভয়াবহতা আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল। এ সময়ে সাম্রাজ্যবাদের অবসানের জন্য তাদের জঙ্গী ও আপোসহীন সংগ্রাম ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে একটি চিরস্মরণীয় অধ্যায় হিসাবে গণ্য হতে পারে।" (প্রতিবেদন)

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্তর্পটে শ্রমজাগরণ যে কী গতিশীল শক্তি হিসাবে কাজ করেছিল তার ইতিহাস আজও পূর্ণাঙ্গভাবে চর্চিত হয়নি — যেমন চর্চিত হয়নি বাংলার শ্রমিক আন্দোলনের ধারাবাহিক ইতিহাস। এই অবহেলিত দিকে পদসঞ্চার করেছেন নির্বাণ বসু তাঁর **বাংলার শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসচর্চা** নামক প্রবন্ধে। তিনি লিখেছেন যে ভারতবর্ষে আধুনিক শিল্প ও তার শ্রমিকদের উদ্ভব ঘটেছে সাধারণভাবে বলতে গেলে উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগ থেকে। তখন থেকেই সারা ভারতের শিল্পায়ন প্রক্রিয়ায় বাংলা এক অগ্রণী নেতৃত্বের ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। বাংলাদেশেই গড়ে উঠেছিল পাটশিল্প, ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প, কয়লাখনি, চা-বাগান ইত্যাদি। ঔপনিবেশিক শিল্প ব্যবস্থায় দেশীয় মালিকানার ও দেশীয় পুঁজির বিকাশ সচরাচর হয় না। বাংলাদেশে অধিকাংশ শিল্পই ছিল ব্রিটিশ মালিকানাধীন। নির্বাণ বসু লিখলেন যে ভারতীয় শিল্পে "দেশীয় পুঁজির প্রবেশ ঘটেছিল অনেক পরে ও সীমিত আকারে। শ্রমিকদের মধ্যেও অধিকাংশই ছিল বহিরাগত। নানা কারণে শ্রমিক শ্রেণী ও তাদের

পর্যন্ত ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি সেভাবে আকর্ষণ করেনি। প্রথমে অর্থনীতিবিদ, সমাজতাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষকরাই ১৯২০-র দশক থেকে শ্রমিক চর্চা শুরু করেন।" [সম্পাদককে প্রেরিত লেখকের প্রতিবেদন] মনে রাখতে হবে যে শ্রমচর্চার ইতিহাস লেখার জন্য শুধু প্রখর মন ও সুগভীর গবেষণা থাকলেই হয় না — চাই দেখার একটা দৃষ্টিভঙ্গী, গভীর মমতাবোধ আর সচেতন আদর্শ। এটি শুধু শ্রমিকদের সম্বন্ধে স্পর্শকাতরত নয়, শ্রমিক-কৃষক-কারিগর — এক কথায় সমস্ত মেহনতী মানুষদের নিয়ে আলোচনার জন্য প্রয়োজনীয় একটা সমাজকল্যাণবোধ যাকে বাদ দিয়ে ইতিহাস রচনার অন্তঃকরণ তৈরী হয় না। এরকম একটা সমাজকল্যাণ আদর্শের দিক থেকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেই শ্রমতত্ত্ব ও শ্রমিক পর্যালোচনা শুরু করেছিলেন ঐতিহাসিকেরা। অবশ্য মার্কসবাদী ঐতিহাসিক ও সমাজতত্ত্ববিদরা যে একান্তভাবেই বঙ্গভূমি নিয়ে আলোচনা করেছিলেন তা নয়। নির্বাণ বসু লিখলেন : "অনেকদিন পর্যন্ত শ্রমিকচর্চা সংক্রান্ত অধিকাংশ গ্রন্থই রচিত হয়েছে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে। তার ফলে বাংলার শ্রমিক শ্রেণী ও তাদের আন্দোলনের অনুপুঙ্খ বৈশিষ্ট্য এইসব আলোচনায় আদৌ ধরা পড়েনি। তাছাড়া শ্রমিক শ্রেণীর ইতিহাস বলতে অনেকদিন পর্যন্ত বোঝাত সংগঠিত ট্রেড ইউনিয়নের ইতিহাস ও বড় বড় ধর্মঘটের ইতিবৃত্ত। উনিশশো সত্তরের দশকের পর থেকে শ্রমিক ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে একের পর এক নতুন ধারা আসতে থাকে।" সত্তরের দশক এক সময়ে অতিবাম বিপ্লবী মার্কসবাদীরা 'মুক্তির দশক' বলে চিহ্নিত করেছিলেন। এই দশক থেকেই বাংলার রাজনীতি ও সরকার গঠনে নিবিড় বামপন্থী ভাবনা প্রায় প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেতে শুরু করেছিল। ফলে এই সময়েই শ্রমচর্চা ও শ্রমিক বিশ্লেষণ ইতিহাস সাধনার অঙ্গীভূত বিষয় হয়ে উঠল। একসঙ্গে সারা ভারতের কথা না বলে নির্দিষ্ট অঞ্চলে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট শিল্পের শ্রমিকদের নিয়ে আলোচনা শুরু হল। সর্বভারতীয় বিস্তার ছেড়ে প্রাদেশিক ভিত্তিতে, তারপর তাকে ছেড়ে বিশেষ শিল্পের কোন সংক্ষিপ্ত পর্বের দিকে এবং তারপরে তৃণমূল স্তরের অঞ্চলভিত্তিক, স্থানিক সংগঠন-নির্ভর শিল্পের আলোচনায় বিশেষীকরণের ধারা এগুতে লাগল। সংগঠিত শিল্প শ্রমিকের পাশে আলোচনায় স্থান করে নিল কায়িক শ্রমে নিযুক্ত অন্যান্য শ্রমিক, সরকারি বেসরকারি কর্মচারী এবং এমনকী কেরানী, শিক্ষক, অধ্যাপক শ্রেণীর মানুষজন যাদের ঐতিহাসিকরা বাবুকর্মী বা *white colour employees and labour* বলে উল্লেখ করে থাকেন। আলোচনা যখন সার্বিক হতে শুরু করল তখন তার বিষয়ও গভীরতর হয়ে উঠল। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রযন্ত্র-পুঁজিপতি-শ্রমিক এই তিনের মধ্যে যে ত্রিভুজ সম্পর্ক, নারী শ্রমিকদের অবস্থান, তাদের কষ্ট-দুর্দশা সবই আলোচনার বিষয় হয়ে উঠল। এইসব আলোচনায় কালের মাত্রায় প্রাক্-স্বাধীনতা যুগই বেশি প্রাধান্য পেয়েছে, উত্তর স্বাধীনতা অধ্যায় সে গুরুত্ব

পায়নি। এই মত পোষণ করতে গিয়ে নির্বাণ বসু লিখলেন যে উনিশশো সত্তরের দশকের পর থেকে সারা বিশ্ব তথা ভারতের শ্রমিক ইতিহাসচর্চার পরিধি ও বৈচিত্র্যই শুধু অভূতপূর্বভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে তা নয়, শ্রমিক ইতিহাসচর্চার দৃষ্টিভঙ্গীর ক্ষেত্রেও একটা বড় পরিবর্তন আসতে শুরু করেছে। উত্তর আধুনিকতাবাদ, সাব অলটার্ন ঐতিহাসিক গোষ্ঠীর উদ্ভব এবং নতুন সামাজিক রচনার উপর গুরুত্ব দান প্রভৃতির প্রভাবে সাধারণভাবে ইতিহাসচর্চাও পরিশীলিত হয়েছে। "যে সব প্রশ্ন এতাবৎকাল উত্থিতই হয়নি," নির্বাণ বসু লিখলেন, "এখন সেই ধরণের প্রশ্নেরও উত্তর খোঁজা শুরু হয়েছে। আজকের অধিকাংশ সমাজবিজ্ঞানীদের মতে 'শ্রমিককে' প্রকৃতভাবে বুঝতে হলে শুধু জঙ্গী আন্দোলনের মুহূর্তগুলিই যথেষ্ট নয়। তাদের উদ্ভব, নতুন শিল্পজীবনে প্রবেশ, তাদের বস্তুকেন্দ্রিক সমস্যাগুলি যেমন ভাতা, বাসস্থান, খাদ্য, কাজের সময় ও পরিবেশ, তাদের মানসিক জগৎ, শিক্ষা, অবকাশ-বিনোদন, রাজনৈতিক ও সামাজিক চেতনা, ধর্মীয় ও সম্প্রদায়বোধ, পারিবারিক জীবন ও যৌনতাবোধ, তাদের বাসস্থান বা 'মহল্লার' পরিবেশ ও পরিপার্শ্ব — সবকিছুর সামগ্রিক আলোচনার উপরই ঐতিহাসিকরা এখন জোর দিচ্ছেন। 'শ্রেণী' হিসাবে শ্রমিকের বিকাশ ও উদ্ভবকে অর্থনৈতিক বিচারকেই একমাত্রিক মাপকাঠি না ধরে, ভাষা-ধর্ম-লিংগ-বর্ণ প্রভৃতি বহুমাত্রিক পরিচিতির উপর গুরুত্বদান করা শুরু হয়েছে। এককথায় এতকাল 'উপর থেকে' যে ইতিহাস লেখা হয়েছে, তার সঙ্গে 'নীচের থেকে লেখা' ইতিহাসকে সংযোজিত করার প্রয়াস শুরু হয়েছে।" (প্রতিবেদন)

উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে বাংলাদেশের শ্রমিক শ্রেণীর সার্বিক অস্তিত্ব নিয়ে আলোচনার ঝোঁক ঐতিহাসিকদের মধ্যে বৃদ্ধি পেয়েছে। এতদিন ধরে শুধু আর্থ-রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকেই শ্রমচর্চা ও শ্রমিক বিশ্লেষণের কাজ চলত। শ্রমিকদের ভাবা হত একটি শ্রেণীবদ্ধ মানবরূপে। এই ধরণের আলোচনায় একটি যান্ত্রিক কাঠামো তৈরী হত যেখানে শ্রমিক আত্মপ্রকাশ করত একটি ব্যবস্থার অঙ্গীভূত বিষয়রূপে, এক নৈর্ব্যক্তিক শক্তির ক্রিয়মান হাতিয়াররূপে। এখন শ্রমিক আর শুধু শ্রেণী-কাঠামো আবদ্ধ সমষ্টিবদ্ধ জীবনের অংশরূপে প্রতীয়মান হয় না। তার নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য ও সার্বভৌমত্ব রয়েছে একথা স্বীকার করে নেওয়া হয়। আজকাল শ্রমিকদের নিয়ে যে ব্যাখ্যা দেখা যায় তার বেশির ভাগটাই সামাজিক সাংস্কৃতিক ব্যাখ্যা, আর্থ-রাজনৈতিক ব্যাখ্যার ঝোঁক কমে গেছে। অবশ্য প্রশ্ন উঠতে পারে যে বাংলার শ্রমিকদের নিয়ে সামাজিক সাংস্কৃতিক ব্যাখ্যাই বা কতটুকু হয়েছে? নির্বাণ বসুর উত্তর এ ব্যাপারে স্পষ্ট: "কিন্তু ভারতের অন্যান্য শিল্পাঞ্চলের শ্রমিকদের নিয়ে সাম্প্রতিককালে এই ধরণের (সামাজিক-সাংস্কৃতিক) যে রকম কাজ হয়েছে, বাংলার ক্ষেত্রে চটকল শ্রমিকদের উপর দীপেশ চক্রবর্তীর উল্লেখযোগ্য কাজ ছাড়া অনুরূপ গবেষণা এখনও পর্যন্ত প্রায়

অনুপস্থিত।" (প্রতিবেদন)। ইতিহাস চর্চায় যথাযোগ্য প্রবণতার অভাব গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু তার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ অন্য দুই প্রবণতা যার সম্বন্ধে নির্বাণ বসু একটি পরিমিত বোধের মধ্যে সোচ্চার হতে চেয়েছেন। তাঁর কথায় "এর পাশাপাশি, অর্থনীতি বহির্ভূত বিষয়গুলির উপর ঝোঁক সৃষ্টির ফলে মূল আর্থ-রাজনৈতিক সমস্যাকে গুরুত্ব না দেওয়ার প্রবণতা এবং বিশাল অসংগঠিত শ্রমজীবী মানুষের কথা আলোচনা না করে শুধুমাত্র তথাকথিত সংগঠিত শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা — শ্রমিক ইতিহাসচর্চার এই দুই বিপদ সম্বন্ধেও সতর্কতা প্রয়োজন।" (প্রতিবেদন)

শ্রমিকদের সার্বিক বিষয় নিয়ে আলোচনা যেমন একটি প্রচলিত প্রবণতা সেইরকম শ্রমিকদের ভৌগোলিক অবস্থান এবং তৎসংশ্লিষ্ট করে নারী শ্রমিকদের নিয়ে আলোচনাও ইদানিংকার শ্রম-ইতিহাসচর্চার একটি বড় ঝোঁক হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। শমিতা সেন ও অনিন্দিতা ঘোষের যৌথ প্রবন্ধ **"নারী-শ্রমিক ও অভিবাসন ঃ উত্তর ভারত, বাংলা ও আসাম, ১৮৭০-১৯২০"** এই ধরণের একটি রচনা। ১৮৭০-এর দশক থেকে যখন দেশে শিল্পায়নের প্রসার ঘটল তখন শিল্পের তাগিদে প্রয়োজন হল শ্রমিকের, আর তার সাথে নারী শ্রমিকেরও। ১৮৭০ থেকে ১৯২০ এই পঞ্চাশ বছরের মধ্যে নারীরা শ্রমিক হিসাবে বিভিন্ন স্থানে অভিবাসিত হতে লাগল। এই অভিবাসিত নারীদের ভিন্ন পরিবেশে অবস্থা কী হত তারই এক চিত্র এই প্রবন্ধে তুলে ধরেছেন লেখিকাদ্বয়। প্রবন্ধে বাংলাকে, উত্তর ভারত ও আসামের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করে ভাবা হয়েছে — অর্থাৎ, উত্তর ভারতের নারী শ্রমিক সংক্রান্ত ঘটনাবলীকে একটা সামগ্রিকতার মধ্যে বিধৃত করে আলোচনা করা হয়েছে। বিবাহিত, অবিবাহিত ও নাবালিকাদের অবৈধ অভিবাসন ছিল সাধারণ ঘটনা। এই ধরণের অভিবাসনকে বন্ধ করার জন্য ঔপনিবেশিককালে নানারকম আইন প্রণয়ন করা হয়েছিল। কিন্তু সেইসব আইনের ফাঁকও ছিল। আর এই ফাঁক-ফোকরের সুযোগ নিয়ে নারীকে দেশের বাইরেও অভিবাসিত করা হত। সীমাবদ্ধ অঞ্চলের মধ্যে অনেক সময় নারী-অভিবাসন পুরুষ-অভিবাসনকে ছাপিয়ে যেত। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, আন্তঃরাজ্য যুক্তকৃষি ব্যবস্থায় পুরুষের পাশাপাশি বিপুল পরিমাণ নারী অভিবাসিত হত। শ্রমিক হিসাবে পাচার হয়ে যাওয়ার মধ্য দিয়েই যে শুধু নারীরা অভিবাসিত হত তা নয়, দেখা গেছে যে উত্তর ভারতে বিবাহের মধ্য দিয়েও দূরে-দূরান্তরে নারীরা অভিবাসিত হত। লেখিকাদ্বয়ের গবেষণার থেকে দেখা গেছে যে উত্তর ভারতের অধিকাংশ মেয়েরই বিয়ে হত দূরে দূরে। তার ফলে বিবাহ ব্যবস্থা সেখানে হয়ে দাঁড়িয়েছিল অভিবাসনের মাধ্যম। এর সঙ্গে ছিল অপহরণ, প্রতারণা, নিয়োগকারিদেব চক্রান্ত আরও কত অসৎ ব্যবস্থা। ১৮৭০ সালের পর থেকে নিয়োগকারিদের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ আসতে থাকে, তারা নানা ঘটনার গোপন চক্রের সঙ্গে জড়িত আছে বলে সন্দেহ করা হয়। এরই

প্রেক্ষিতে ১৯০১ সালে কয়েকটি আইন প্রণয়ন করা হয়। এই আইনের ফলে বিবাহিত নারীদের অভিভাবক বা স্বামীদের মত ছাড়া নিয়োগ নিষিদ্ধ হয়ে যায়। গ্রামান্তরে পরিবারের অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে নারীর যে একটি বিশেষ ভূমিকা আছে তা আইনের অন্তর্ভুক্ত ভাবনার মধ্য দিয়ে স্বীকৃত হয়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পরিবারের চৌহদ্দির মধ্যে নারীর শ্রমের উপর পুরুষদের দাবিও সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়। এটি হল নারী শ্রমের উপর রাষ্ট্রিক নিয়ন্ত্রণের একটা দিক। এর অন্য দিকটি উপস্থাপিত হল যখন শিল্পকারখানা বাড়তে লাগল। কারখানার মালিকরা নারী অপেক্ষা পুরুষ শ্রমিক নিয়োগকেই বেশি উৎসাহ দিতেন। দেখা গেছে যে কলকারখানায় যে নারী শ্রমিকরা আসত তারা আসত নিম্নস্তর থেকে যেমন মুচি, চামার ইত্যাদিদের স্তর থেকে। তারা কারখানাগুলিতে প্রায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে ঠিকায় কাজ করত। তখন গ্রামের সঙ্গে তাদের সংযোগ প্রায় ছিন্ন হত। আবার গ্রামে অনেক পরিবার ছিল যাদের নারীকুল ঐতিহ্যগত সংস্কৃতির কারণে পরিবার থেকে উৎপাটিত হয়ে স্থানান্তরে সঞ্চালিত হত না। অনেক সময়ে তাদের পুরুষরা পরিবারের আয়ের জন্য নিজেদের তালুক মুলুক ছেড়ে অন্যত্র চলে যেত, কিন্তু ঘরে রেখে যেত তাদের স্ত্রী-কন্যাদের। ফলে স্বাভাবিক নিয়মেই সেখানে নারী অভিবাসন বাধা পেত। কলকারখানায় যেমন মালিকরা মেয়েদের নিয়োগ করতে চাইত না সেইরকম এর ঠিক বিপরীত ঘটনাটি ঘটত প্ল্যানটেশন শিল্পে যেমন চা-বাগিচাগুলিতে। এই শিল্পে কিছু কিছু কাজ ছিল যা নিতান্তভাবেই 'মেয়েলী' বলে চিহ্নিত ছিল। ফলে বাগিচা মালিকরা উৎসাহবোধ করতেন মেয়েদের নিয়োগে। ১৮৭০-এর দশকের শেষ থেকে চা-বাগিচাগুলির উড়ানপর্ব শুরু হয়। তখন থেকেই মালিকরা বুঝতে পারছিল যে স্থানীয় জনসংখ্যা কম থাকায় শ্রম যোগানের জন্য তাদের রপ্তানীকৃত শ্রমিকদের উপরই নির্ভর করতে হবে। বিদেশে ভারতীয় শ্রমিক রপ্তানী অবশ্য এর অনেক আগে থেকেই শুরু হয়েছিল। দেখা গেছে যে মহাবিদ্রোহের ঠিক পরেই ১৮৫৮ থেকে ১৮৬০ সালের মধ্যে বিদেশে অভিবাসনের হার মারাত্মক বৃদ্ধি পায়। শুধু কলকাতা থেকেই এই সময়ে বিদেশে পাঠানো হয়েছিল ৫১,২৪৭ জন শ্রমিককে। এইসব শ্রমিকরা বেশিরভাগই আসত বিহার ও যুক্তপ্রদেশ থেকে। এই অঞ্চলগুলি ছিল ভারতবর্ষের দুটি শহরের শ্রমিকদের মূল যোগানদার। পূর্ব ভারতে তখন রমরমা ছিল পাটশিল্প, পশ্চিম ভারতে বস্ত্রশিল্প। এই দুই শিল্পের চাহিদা অনুযায়ী যেমন শ্রমিকরা এই দুই বন্দর-নগরীর পশ্চাদভূমিগুলির শিল্প সন্নিকটে ভিড় করত সেরকম এই যোগানের একটা বিরাট অংশ চলে যেত আসামে। আবার আরেকটা ধারাকে এনে ফেলা হত বম্বে-কলকাতা দুই বন্দরে। সেখান থেকে তারা অভিবাসিত হত বিদেশে। এই শ্রমিক-যোগান, শ্রমিক-সঞ্চালন, শ্রমিক-অভিবাসন নারী পুরুষ উভয়কে নিয়েই সংঘটিত হত। গ্রাম থেকে যে নারীরা শিল্পাঞ্চলে আসত গ্রামের

সঙ্গে প্রায়ই তাদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যেত। কিন্তু গ্রাম থেকে উঠে আসা পুরুষদের তা হত না, কারণ তাদের সংসার, জমি, ভিটে, খেত-খামার কোন কিছুর সঙ্গেই তাদের বিচ্ছেদ ঘটত না। শহরের স্থায়ী বাসিন্দা যে সব মেয়েরা শিল্পাঞ্চলে শ্রমিকরূপে কাজ করত তাদের অধঃপতিত নৈতিকতার প্রতীক হিসাবে দেখা হত। সমাজচ্যুত, কুলভ্রষ্ট, চরিত্রহীন ইত্যাদি নেতিবাচক বিশেষণে তাদের চিহ্নিত করা হত। এইভাবে শহর জীবনের অবনমনের সঙ্গে জড়িয়ে নারী শ্রমিককে আখ্যায়িত করা হত। নারী শ্রমিকের এই দুর্দশার কাহিনী ইতিহাসে কমই লেখা হয়েছে।

তবে সুখের কথা এই যে সাম্প্রতিক ইতিহাসচর্চার ধারায় মানবীবিদ্যা (women studies) এক বড় ভূমিকা নিচ্ছে। এর পেছনে একটা বড় প্রেরণা এসেছে মার্কসবাদ থেকে। ভারতবর্ষে মার্কসবাদী ইতিহাসচর্চার যে ধারা মানবেন্দ্র নাথ রায়ের হাত ধরে সূচিত হয়েছিল তার বিকাশ হয়েছে নানা পথে, নানা ধারায়। ভারতবর্ষে মার্কসবাদ বড় আকারে এক প্রেরণা হয়ে দাঁড়িয়েছিল দুই বিশ্বযুদ্ধ মধ্যবর্তীকালীন সময়ে। এই সময়ে বাংলার শ্রমিক আন্দোলন মার্কসবাদী ধারায় অনুপ্রাণিত হয়েছিল। তার ইতিহাস বিপুল ও ব্যাপক। সে ইতিহাসের কয়েকটি দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন সুস্নাত দাশ তাঁর **দুই বিশ্বযুদ্ধ মধ্যবর্তীকালীন বাংলায় শ্রমিক আন্দোলনে মার্কসবাদী ধারা** নামক প্রবন্ধে। এটি এই গ্রন্থের দীর্ঘতম প্রবন্ধ। তথ্যের সমাহারই এই প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্য। ১৯২০ সালের অক্টোবর মাসের শেষ দিনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস (All India Trade Union Congress — সংক্ষেপে AITUC)। সেই একই বছরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি AITUC-র উপর প্রাধান্য স্থাপন করে ১৯২৯ সালের পর যখন নরমপন্থী বা মডারেট নেতারা এম.এন.যোশী, ভি.ভি.গিরি প্রমুখের নেতৃত্বে AITUC-র থেকে সরে এসে Indian Federation of Trade Unions (IFTU) গঠন করেন। বলা বাহুল্য যে তখন AITUC মস্কোপন্থী চিন্তাধারায় আচ্ছন্ন ছিল এবং এর নেতৃত্ব পদে আসীন ছিলেন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ যেমন ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, বঙ্কিম মুখার্জী, সুভাষচন্দ্র বসু প্রমুখ ব্যক্তিরা। এঁদের প্রচেষ্টা ছিল AITUC-কে একটি সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগঠনে পরিণত করা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা কতখানি সার্থক হয়েছিল বলা কঠিন কারণ তখন কমিন্টার্ণ-এর নির্দেশে কমিউনিস্টরা একটা বুর্জোয়া বিরোধী কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করছিলেন। আবার পুঁজিপতিরাও কমিউনিস্টদের ঠেকাতে একটা লবি গড়ার চেষ্টা করছিলেন। অনুমান করা হয় যে বামপন্থীরাও তাঁদের নিজস্ব পদ্ধতিতে একটি ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। AITUC-র অভ্যন্তরীণ ভাঙ্গনের ফলে কমিউনিস্টরা শক্তিশালী হয়েছিল, না কমিউনিস্ট আদর্শ ও সংগঠনের বলে তারা AITUC-র ভেতর স্থান করে নিয়েছিল তা সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায় না। তবে একথা ঠিক যে তখনও কমিউনিস্টদের

প্রাদেশিক সংহতি জোরালো হয়ে ওঠেনি। ১৯২০-র দশকের মাঝামাঝি থেকে ১৯৩০-এর দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত সময়ে শ্রমিক আন্দোলনের মাথায় ছিলেন মূলতঃ কংগ্রেসী নেতারা — মৃণালকান্তি বসু, সুভাষচন্দ্র বসু, প্রভাবতী দাশগুপ্ত প্রমুখ ব্যক্তিরা। কিন্তু একেবারে শ্রমিকদের মধ্যে থেকে কাজ করতেন কমিউনিস্টরা বা এমন ব্যক্তিরা যাঁরা কমিউনিস্ট আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ক্ষেত্রে কমিউনিস্টরা দুটি ধারাকে মিশিয়ে একটি সবল জঙ্গী ধারা তৈরী করেছিল — এক, অর্থনীতি ঘেঁষা শ্রেণী সংগ্রাম যেমন মজুরি বাড়ানো বা ছাটাই কমানোর আন্দোলন এবং দুই সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদ বিরোধী রাজনৈতিক চেতনা গড়ে তোলার আন্দোলন। সুস্নাত দাশ লিখেছেন যে উনিশশো তিরিশের দশকে বাংলায় বামপন্থী ও কমিউনিস্ট প্রভাবিত শ্রমিক আন্দোলন ও ট্রেড ইউনিয়ন তৎপরতাই বেশি ছিল। তখন দেশে মোট শ্রমিক সংখ্যা ছিল ১৬ লক্ষ ৫২ হাজার। তার মধ্যে মাত্র ২ লক্ষ ৬৮ হাজার অর্থাৎ ১৫ শতাংশ শ্রমিক সংগঠিত ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের মধ্যে এসেছিল। মনে রাখতে হবে যে তখন কমিউনিস্টরা শহরের শিল্পাঞ্চলে শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে আবদ্ধ থাকায় তারা গ্রামীণ কৃষক শ্রমশক্তিকে প্রভাবিত করতে পারেনি। পরবর্তীকালে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে সমালোচনা উঠেছিল যে তারা গ্রামীণ হতে পারেনি। "To go rural" বলতে যা বোঝায় তা তখন কমিউনিস্টরা হতে পারেনি। যে প্রভাব তারা শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যে রাখতে পেরেছিল সে প্রভাব তারা কৃষক-আন্দোলনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি। পাঠকদের অনুধাবনের জন্য আমরা সাম্প্রতিক একটি গবেষণা গ্রন্থ* থেকে একটি অংশ উদ্ধৃত করছি। তার থেকে পাঠকবর্গ ভারতবর্ষে শ্রমিক আন্দোলনের পাশাপাশি কৃষক আন্দোলনে কমিউনিস্টরা কতখানি অগ্রসর হতে পেরেছিলেন তা বুঝতে পারবেন।

> "ভারতবর্ষের অনেক সাধারণ মানুষের মতো একসময়ে কমিউনিস্টরা মনে করত যে গান্ধীজি কল্পান্তের নেতা (Millennial leader)। অতএব শহরকে বাদ দিয়ে যে দেশের বিরাট অভ্যন্তর ভাগ রয়েছে সেখানে প্রবেশ করার অধিকার তারা গান্ধীজির উপরই ছেড়ে দিয়েছিল। ১৯২৬ সালের পর থেকে বোম্বাইতে বস্ত্রশিল্পের শ্রমিকদের মধ্যে যখন গভীরভাবে কমিউনিস্টরা প্রবেশ করছিল তখন দেশের গ্রামাঞ্চলে সমানুপাতিক ও সমান্তরাল প্রবেশের ধারণাটি তারা গড়ে তুলতে পারেনি। কিন্তু বরদৌলিতে বল্লভভাই প্যাটেলের যে সাফল্য তা স্পষ্টভাবে প্রমাণ করেছিলো যে তখনও দেশের অভ্যন্তরে বিস্তীর্ণ মানব জমিন পতিত ছিল যাকে কর্ষণ করলে সোনা ফলত। এশিয়ার অন্যান্য দেশের মতো ভারতবর্ষের কমিউনিস্টরা মূলত কমিন্টার্ন

(Comintern) থেকে তাদের প্রেরণা লাভ করছিল। ঠিক দেশের অভ্যন্তর থেকে কাজের প্রেরণাকে গ্রহণ করে আদর্শ ও বাস্তবের সমন্বয়ের ভিত্তিতে কর্মসূচি রচনার তাড়না (impulse) তাদের ছিল না । হঠাৎ করে ১৯২৭ সালে ভারতবর্ষের কমিউনিস্টরা কিছুটা উৎসাহ পেয়েছিলেন যখন শাপুরজী সকলতওয়ালা (Shapurji Saklatvala) ভারতবর্ষে এসেছিলেন। সকলতওয়ালা ছিলেন একজন স্বনামধন্য ভারতীয় যিনি ব্রিটিশ কমিউনিস্ট প্রতিনিধি হিসাবে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে যোগদান করেছিলেন। সকলতওয়ালাকে কংগ্রেস নিয়ন্ত্রিত মিউনিসিপ্যালিটিগুলি নাগরিক সম্বর্ধনা দিয়েছিল। এমনকি গান্ধীজিও 'কমরেড সকলতওয়ালার স্বচ্ছ নিষ্ঠার' ('Comrade Saklatvala's transparent sincerity'-র) প্রশংসা করেছিলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও তিনি কমিউনিস্টদের জানিয়ে দিতে কসুর করেন নি যে তারা কৃষকদের স্বার্থ নিয়ে কিছুমাত্র অগ্রসর হতে পারেন নি।

ইন্দোনেশিয়া এবং চীনের কমিউনিস্ট পার্টি গ্রামাঞ্চলে যে পরিমাণ প্রভাব বিস্তার করেছিল ভারতবর্ষের কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে তা ছিল স্বপ্নাতীত। যে কোনো কারণেই হোক ভারতবর্ষের কমিউনিস্ট পার্টি শুরু থেকেই শহরের প্রলেটারিয়েটের মধ্যে নিজেদের আবদ্ধ রেখেছিল। দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যে ভারতবর্ষের কমিউনিস্ট পার্টি গ্রামীণ হতে ('to go rural') পারেনি। সম্প্রতি জনৈক ঐতিহাসিক লিখেছেন যে কমিউনিস্টদের সদস্যসংখ্যা এতই কম ছিল যে তারা ১৯২০-র দশকে গ্রামে প্রবেশ করতে পারেন নি। কমিউনিস্ট পার্টির কার্যবিধির সমর্থনে একথাও বলা হয়েছে যে তারা যদিও গ্রামে প্রবেশ করতে পারেনি তবুও তারা প্রথম থেকেই দুটি দাবীকে প্রাধান্য দিয়ে আসছিল, যে দুটি দাবী অনেক দোদুল্যমানতার পর কংগ্রেস ১৯৩০-এর দশকের মধ্যভাগে গ্রহণ করতে পেরেছিল। সে দুটি হল জমিদারি প্রথার বিলোপ এবং জমির পুনর্বণ্টন। একথা বলার মধ্যে দিয়ে ঐতিহাসিকরা যে কথাটি অনুচ্চারিত রেখে যান তা হল এই যে চীন এবং ইন্দোনেশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি থেকে ভারতবর্ষের কমিউনিস্ট পার্টি ছিল কিছুটা পৃথক কারণ এটি ছিল শহুরে দল এবং প্রায় এলিটদের দ্বারা ভারাক্রান্ত। এই দলের সমস্ত প্রেরণা আসত কমিন্টার্ন (Comintern) থেকে। ফলে এঁদের সমস্ত দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল ১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লবের প্রলেটারিয়েটের ভূমিকার ওপর। সমকালীন পরিস্থিতিকে তাঁরা পর্যাপ্তভাবে বুঝতে পারেনি।"

উপরের আলোচনা থেকে একথা কখনোই ভাবা উচিত নয় যে শ্রমিক আন্দোলনে মনপ্রাণ নিয়োজিত করেছিল বলে কমিউনিস্টরা কৃষি জগৎ ও কৃষক আন্দোলন সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি নির্দিষ্ট সময়কালের মধ্যে কমিউনিস্টরা

শ্রমশক্তি সঞ্চালন ও শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে মনোনিবেশ করেছিলেন। ভারতবর্ষের কমিউনিস্টরা প্রভাবিত হয়েছিলেন রুশ বিপ্লবের ধারা ও আদর্শের দ্বারা। রুশ বিপ্লব ছিল শ্রমিক শ্রেণী-নির্ভর সমাজ বিপ্লব। তখনও চীনের বিপ্লব পূর্ণতা লাভ করেনি। কৃষি বিপ্লবের মডেল তখনও ভারতবর্ষের কমিউনিস্টদের হাতে আসেনি। ফলে মাও-জে-তুং-এর নেতৃত্বে চীনা কমিউনিস্টরা যেভাবে গ্রাম দিয়ে শহর ঘিরে ফেলার টেকনিকটির পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাচ্ছিল তার বিশদ তথ্য ভারতবর্ষের কমিউনিস্টদের জানা ছিল না। আমাদের দেশের কমিউনিস্টরা রুশ মডেলটি অনুসরণ করে এবং তাদের সাধ্যের মধ্যে তারা সাফল্য লাভের চেষ্টা করেছিল। একথা মাথায় রেখে আমাদের সুস্নাত দাশের প্রবন্ধটি পাঠ করতে হবে। এ প্রবন্ধের গুরুত্ব হচ্ছে যে সর্বভারতীয় প্রেক্ষিতকে মাথায় রেখে বাংলার শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস তিনি চর্চা করেছেন। দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তীকালীন সময়ের জটিলতার ভেতর থেকে ভারতবর্ষের কমিউনিস্ট আন্দোলনের একটি ধারাকে তিনি যেভাবে প্রকাশ করেছেন তাকে একটি বিরল প্রচেষ্টা বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। এর স্বচ্ছতা একে পাঠক-বান্ধব করে তুলেছে।

বাংলাদেশের শ্রমিক আন্দোলনের একটি দুরূহ এবং সম্ভবত সেই কারণে অবহেলিত বিষয় হল নারী শ্রমিকের ইতিহাস। তার উপর সেই নারী শ্রমিক যদি ভূগর্ভের শ্রমিক হয় তাহলে বিষয়টি প্রায় অধরা থেকে যায়। এইরকম একটি অধরা বিষয় নিয়ে কাজ করেছেন রাখি রায়চৌধুরী — দৃষ্টিপাত করেছেন একটি অজ্ঞাত ও অবজ্ঞাত অনুসন্ধানের গভীরে। তাঁর প্রবন্ধের শিরোনাম **উনিশ শতকে পূর্ব ভারতের কয়লাশিল্পের ভূগর্ভের নারী শ্রমিক ঃ ঔপনিবেশিক শোষণের অবাধ ক্ষেত্র**। এই নিবন্ধের সময়কাল ১৯০০ থেকে ১৯৩৯। দীর্ঘ তিন দশক ধরে একটি সংগঠিত শিল্পে নারী শ্রমিকদের — যাদের অধিকাংশই ছিল আবার আদিবাসী — তাদের খনিজ উত্তোলনের কাজে কী নিবিড় ও নির্মমভাবে ব্যবহার করা হয়েছে তার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখেছেন তিনি। এক ধারার বিশ্লেষণের আতস কাঁচের নীচে তিনি মেলে ধরেছেন নানা বিষয় — যেমন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে পর্যন্ত খাদান-কামিনদের দৈনিক শ্রম-বিন্যাস এবং তা বিশ্লেষণ করে তিনি দেখিয়েছেন "কিভাবে ১৯৩০ পর্যন্ত নির্ধারিত দৈনিক সময়সূচীর অভাব, শ্রমবিরতি ও ছুটির ক্ষেত্রে নিরন্তর বঞ্চনা, ১৯৩৪-এর পূর্বে মাতৃত্বকালীন ছুটির অভাব, ক্রেশ ও মেটারনিটি হোমের অপ্রতুলতা, আপৎকালীন বীমার অভাব, ঝুঁকিপ্রবণ এই শিল্পে পেশাগত প্রশিক্ষণ ও নিরাপত্তার ব্যাপারে নিয়োগকর্তাদের ঔদাসীন্য শ্রমিক শোষণকে নিরবচ্ছিন্ন ও নিরঙ্কুশ করে তুলেছিল" (সম্পাদককে প্রেরিত প্রতিবেদন)। এক নির্বিকার, উদাসীন, রূঢ় মালিকপক্ষের পদদলিত থেকে খনি শিল্পের শ্রমিকরা তাদের ঘাম ঝরাত, তাদের ঘামে সিক্ত হত এই শিল্পের অমানবিক ভিত্তি। সেই কারণে এই শিল্পকে 'স্বেদ-সিক্ত' বা 'Sweated Industry' আখ্যাটি দেওয়া হয়েছিল। 'স্বেদসিক্ত' বললে কম

বলা হয়। এ শিল্পে শ্রমিকদের ঝুঁকি ছিল অনেক, প্রাণঘাতী বিপদের মুখোমুখি কাজ করতে হত তাদের, এক লহমায় ঘটে যেতে পারত অঙ্গহানি থেকে জীবনহানি পর্যন্ত যে কোন ঘটনা। পূর্বভারতে এই শিল্প গড়ে উঠেছিল বাংলা ও বিহারের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে — কয়লাখনিগুলি ব্যেপে। এইসব খনিতে উত্তোলন পদ্ধতি ছিল আদিম, আর শ্রমিক নিযুক্তির প্রকরণটিও ছিল পরিবার-কেন্দ্রিক। পুরুষ শ্রমিকের পাশে একজন তার পরিবারের কোন মহিলা কর্মী থাকলে খনিজ আহরণ অপেক্ষাকৃত বেশী হত বলে এই শিল্পের সূচনা থেকেই এর মধ্যে নারী শ্রমিকের অবাধ প্রবেশ ঘটেছে। এইভাবে নারীশ্রমে পুষ্ট হচ্ছিল যে শিল্প তার মালিকানা আঠারো-উনিশ শতকে অধিকার করে রেখেছিল মূলত ইউরোপীয়রা। তাদের হৃদয়হীনতা তাই ছিল এত নির্বিচার ও নির্মম। আঠারো শতকের গোড়ার দিকে কয়লা উত্তোলনের কাজে নিয়োগ করা হত বাউরিদের, কারণ তাদের মধ্যে ছিল এক প্রথাগত দক্ষতা। পরে ১৮৮৭ সালে বেঙ্গল-নাগপুর রেলপথ খুলে দেওয়ার ফলে ছোটনাগপুরের আদিবাসী জনগণকে এনে হাজির করা হয় কয়লাখনির কাজে। এইভাবে যেমন জনশক্তির অভিবাসন ঘটতে থাকে সেইরকমভাবে সাঁওতাল, কোরা, কোল নারী পুরুষেরা এক নতুন জীবিকার সন্ধান পায়। তারা বাউরিদের থেকে অনেক বেশি সাহসী ও দৈহিকভাবে বলশালী। ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা ছিল তাদের অনেক বেশি। খনির অতলে তারা নেমে যেত অনায়াসে। তাই কয়লা উত্তোলনের কাজে তাদের ছিল একচ্ছত্র প্রাধান্য। নারী শ্রমিকদের মধ্যে সন্তান সম্ভবারাও নেমে যেত খনিতে। তাই খনিগর্ভে শিশু-ভূমিষ্ঠ হওয়ার ঘটনাও ঘটে যেত মাঝে মাঝে। খনিগর্ভে তখন পর্যাপ্ত বায়ুরন্ধ্রের (Ventilation) ব্যবস্থা ছিল না। অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চলত উত্তোলনের কাজ। খনিগর্ভের ঋজু সুড়ঙ্গপথ, অনিশ্চিত পরিবেশ, অদ্ভুত আঁধার — সব মিলিয়ে মানুষের দেহমনের ভারসাম্য ঠিক রাখার পরিপন্থী পরিবেশ বিরাজ করত সেখানে। আর তার মধ্য দিয়ে নির্বিকার শ্রমদানের মধ্য দিয়ে উত্তোলিত হত এক অতি প্রয়োজনীয় খনিজ। রাখি রায়চৌধুরী চমৎকার করে দেখিয়েছেন যে ভূগর্ভ শ্রমিকদের নিরবচ্ছিন্ন শোষণ বন্ধ হওয়ার কোন পথ ছিল না। এই একটি শিল্প যেখানে একই পরিবারের নারীর পাশে কাজ করত সেই পরিবারের পুরুষ, আর নারীর নিশ্চিত অবস্থানের জন্য পুরুষের উপস্থিতি ছিল নিয়মিত। নারী শ্রমিক বা খাদান কামিনরা সন্তুষ্ট থাকত স্বল্প মজুরিতে। মালিকের সহজ নিয়ন্ত্রণাধীনও ছিল তারা। তাদের পুরুষকুল থাকত তাদের পাশেই। ফলে মালিকের মুনাফা ঠেকায় কে? এ ব্যবস্থাকে মালিকপক্ষ বদলাতে দেবে কেন? ব্যবস্থা বদলায়নি। আর মালিকপক্ষের অধিকাংশই যেখানে অভারতীয় সেখানে ঔপনিবেশিক সরকার শ্রমদরদী হতে যাবে কেন? তারা শ্রমদরদী হননি। সবচেয়ে দুঃখের কথা যে নারী শ্রমিকরা পুরুষ শ্রমিকদের পাশে থেকে কখনো কখনো একনাগারে শ্রম দিয়েছে দিনে ১৬ থেকে ১৭ ঘন্টা। কিন্তু

এর বদলে তারা কী কোনদিন পেত তাদের যোগ্য মজুরি? শুধু কী তাই? শোষণের কত মাত্রাকে দেখিয়েছেন রাখি রায়চৌধুরী — যেমন শ্রমিকদের অসুস্থতার জন্য কোন ছুটি বরাদ্দ ছিল না। ছিল না কাজের অনুপস্থিতিতে মজুরি দাবি করার অধিকার। নারী শ্রমিকের ক্ষেত্রে অনেক সময়ে মাতৃত্বের ছুটিও ছিল না। তাই অনুপস্থিতির বিকল্প অনাহার একথা জেনে নারী-পুরুষ উভয় শ্রমিকই কাজে আসত, হাড়ভাঙ্গা শ্রমের বিনিময়ে খনিজ উত্তোলন করত, নিজেদের শ্রমে-ঘামে-রক্তে গড়ে তুলত মালিকদের মুনাফার পাহাড়। নিম্নবর্গের এই মানুষদের ইতিহাস এতদিন ঢাকা ছিল 'কালোরাত্রির খামে'। নিজের গবেষণার মধ্য দিয়ে রাখি রায়চৌধুরী তার মধ্যে নিয়ে এলেন সূর্যোদয়ের আলো। ইতিহাসের অনালোক থেকে আত্মপ্রকাশ করল বাংলার শ্রমশক্তির দুর্জয় কাহিনী।

একেবারে নিম্নবর্গের শ্রমিক শ্রেণীর বাইরে শ্রমিকের নতুন সংজ্ঞা রচনা করেছেন অনুরাধা কয়াল তাঁর **ঔপনিবেশিক বাংলায় বাবুকর্মীদের আন্দোলন** শীর্ষক প্রবন্ধে। তিনি বর্ণনা করেছেন 'বাবুকর্মী' নামে চিহ্নিত এক শ্রমিক শ্রেণীকে যাঁদের ইংরাজী ভাষায় white collar labour বলা হয়ে থাকে। দেশের উন্নতমানের শিল্পাঞ্চলে ছিল এদের বাস। কৃষিভিত্তিক দেশে এঁদের কোন ব্যাপক আত্মপ্রকাশ সম্ভব ছিল না। সামাজিকভাবে এঁরা ছিলেন মধ্যশ্রেণীর, বিত্তের বিন্যাসে মাঝারিবিত্তের মানুষ — আর সকলেই ছিলেন চাকুরির বৃত্তের মধ্যে কর্মরত। এঁরা হলেন সরকারি বা বেসরকারি সংস্থায় নিযুক্ত, যাদের আলোচ্য প্রবন্ধে সরকারি-বেসরকারি সংস্থায়, ব্যাঙ্ক, বীমা, স্কুল, পৌরসংস্থা ইত্যাদিতে কর্মরত 'কেরানী' বলা হয়েছে। এঁদের দুটি অবিধায় চিহ্নিত করা হয়েছে — 'শিক্ষিত' ও 'মধ্যবিত্ত'। বর্তমান সম্পাদককে লেখা একটি প্রতিবেদনে অনুরাধা কয়াল জানিয়েছেন যে এই শ্রেণীর শ্রমিকদের আবির্ভাব ঘটতে শুরু করেছিল উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে। দেশে রেলের আবির্ভাবের পাশাপাশি গড়ে উঠেছিল ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প, আত্মপ্রকাশ করেছিল চা-বাগিচা, পাট শিল্প ও কয়লা খনি। এখানে দরকার হত নতুন প্রশাসনিক পরিষেবা, নতুন পরিচালন পদ্ধতি (management), হিসাব-নিকাশ ও দলিল-দস্তাবেজ রক্ষণের কাজ ইত্যাদি, আর এর জন্য দরকার ছিল লিপিকার করণিকদের। সমস্ত ভারতবর্ষ জুড়েই এই ঘটনা ঘটছিল, তার মধ্যে পূর্ব ভারতে বেশি। বাবুশ্রমিকরা সর্বত্র থাকতে পারেন না, তাই দেশের নির্দিষ্ট কিছু অঞ্চলে তারা সীমাবদ্ধ ছিলেন। অনুরাধা কয়ালের ভাষায় "আধুনিক শিল্পায়ন, পশ্চিমী শিক্ষার প্রসার এবং নতুন পদ্ধতির প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বাবুকর্মীদের আবির্ভাব ঘটেছিল। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে কেরাণীবাবুদের আন্দোলনের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল মুদ্রণকর্মী ও রেলকর্মীদের মধ্যে। কিন্তু ১৯০৮-এর মধ্যলগ্ন থেকে কেরাণীবাবুদের সংবাদের ফাইলগুলি ১৯২১ পর্যন্ত ফাঁকা হয়ে যায়। ১৯২০-র মধ্যে বাংলায় বিভিন্ন

কেরানী সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১৯৩০-৪০-এর দশকে সমগ্র ভারতবর্ষ নানা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সাক্ষী হয়ে উঠেছিল। এই আবহাওয়ায় শুধু বাংলাতেই নয় সমগ্র ভারতবর্ষে কেরানী ও শ্রমিক আন্দোলন নতুন মাত্রা অর্জন করেছিল।" (প্রতিবেদন) ভারতবর্ষে স্বাধীনতা আন্দোলনের ধারা, বিশ্ব-অর্থনীতির মন্দা ও বিপর্যয়ে দেশীয় অর্থনীতির উপর চাপ, দেশে মার্কসবাদী বামপন্থী আদর্শের প্রভাব, মধ্যশ্রেণীর মধ্যে শিক্ষা বিস্তার, তাদের চেতনায় রাজনীতিক বোধের গভীর সঞ্চার এসবই কেরানীকুলের আন্দোলনকে প্রভাবিত করেছিল। অনুরাধা কয়াল লিখেছেন, "১৯৪৪-৪৫ সাল নাগাদ কমিউনিস্ট পার্টি কেরানীদের সংগঠিত আন্দোলনকে সমর্থন করতে শুরু করেছিল। এই সময় থেকেই কেরানীরা তাঁদের অবস্থা সম্পর্কে আরও সচেতন হতে আরম্ভ করেন এবং তাঁরা রাজনৈতিকভাবে সচেতন ও সংগঠিত হওয়ার পথে অগ্রসর হয়েছিলেন" (প্রতিবেদন)। বাবু কর্মচারীদের যে কতরকম সংগঠন বা ইউনিয়ন সারা দেশে আত্মপ্রকাশ করেছিল তার বিস্তৃত খতিয়ান দিয়েছেন অনুরাধা কয়াল। বাবুকর্মীদের নিয়ে আলোচনা এর আগে বেশি হয়নি। অনুরাধা কয়াল এ বিষয়ে গবেষণার নিশ্চিত একজন পথিকৃত। শ্রমশক্তি নিয়ে গবেষণার একটি নতুন মাত্রা বর্তমান প্রবন্ধের মধ্যে তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন। এই প্রবন্ধের মাধ্যমে শ্রমিকের ইতিহাস রচনার নতুন দ্বার উদ্‌ঘাটিত হল তাঁর লেখনীতে।

সূচিপত্র

আসামে চা-কুলি আন্দোলন

কানাইলাল চট্টোপাধ্যায়*

উনিশ শতক বাংলায় তথা ভারতে জনচেতনার যুগসন্ধি। জড়োপাসনা, অজ্ঞতা, কুসংস্কার, বহুবিবাহ প্রভৃতি অষ্টাদশ শতকের সমাজে যে অচলাবস্থার সৃষ্টি করেছিল তার পরিবর্তন উন্নয়নের কাল এই শতাব্দী। কলকাতা তখন বৃটিশ ভারতের রাজধানী; পশ্চিমী নব্য শিক্ষাদীক্ষার আদি বিদ্যাপীঠ; ভারতের বৃহত্তম বাণিজ্যিক কেন্দ্র। উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণের শিশুশয্যা এই কলকাতা।

উনিশ শতকে শহর জীবনে পরিবর্তনের ছোঁয়া এসে লাগল পশ্চিমী শিক্ষার মাধ্যমে। মধ্যবিত্ত বাঙালী যারা কলকাতার আশেপাশে এসে ভিড় করেছিল তারা সহজেই ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত হতে সচেষ্ট হলেন। এরাই গড়ে তুলল মধ্যবিত্ত বা অভিজাত সমাজ। এই উচ্চ শিক্ষিত সমাজই উনিশ শতকের সমাজ সংস্কার আন্দোলন সুরু করেন। তাঁরা সুরু করেছিলেন সামাজিক, আর্থিক ও রাজনৈতিক সংস্কার। একটা সীমিত ক্ষুদ্র অংশ ছিল যারা এই সংকীর্ণতা পেরিয়ে মেহনতী মানুষের কথা চিন্তা করেছিল। রামমোহন রায় যিনি আমাদের দেশের প্রায় সর্বস্তরের সংস্কারের পথপ্রদর্শক, তিনিও এই সীমিত দলের মধ্যে ছিলেন। ইতস্ততঃ কৃষকবিদ্রোহ সত্ত্বেও দেশের অগণিত শ্রমজীবি মানুষ তখন মূলতঃ অসংগঠিত, সুতরাং অসহায় ও নীরব। এই রামমোহন যে তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন, তার অনেক প্রমাণ আছে। লবণ প্রস্তুতে যে মলংগা

* ইতিহাসের বিশিষ্ট গবেষক এবং উলুবেড়িয়া কলেজের ইতিহাস বিভাগের প্রাক্তন রীডার ও প্রধান, ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের আধুনিক ভারত শাখার প্রাক্তন সভাপতি।

শ্রমিকরা নিয়োজিত হত তিনি তাদের উন্নতির জন্য আন্দোলন করেছিলেন। শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি তাঁর সহানুভূতির প্রমাণ পাওয়া যায় বিলেতের শ্রমিক আন্দোলনের পথিকৃৎ রবার্ট ওয়েনের মতের পক্ষে মত দেওয়া—যা তাঁর চিঠি থেকে জানা যায়।[১]

এ ছাড়া রামমোহন-পরবর্তী যুগে 'ইয়ং বেঙ্গলের' বেশ কয়েকজন সমাজের অবহেলিত শ্রেণীর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। রামগোপাল ঘোষ তাঁর পত্রিকা 'বেঙ্গল-স্পেক্টেটর'-এ প্রজাদের দুঃখ-দুর্দশার কথা বলেছেন। ইয়ং বেঙ্গলের আর এক দিকপাল দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রজাদের ক্ষমতার ওপর জোর দিয়েছেন। তাঁর মতে জমির মালিক প্রজারা।[২]

নির্ভীক চিন্তানায়করাও অনেকেই দেশের গরীব কৃষকদের অবস্থা সাধারণের কাছে প্রকাশ করার জন্য বিভিন্ন পত্রিকা মারফৎ নিজেদের মত প্রকাশ করেছেন। এদের মধ্যে অন্যতম হলেন বিদ্যাসাগর ও অক্ষয় কুমার দত্ত। উভয়েই ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'তত্ত্ববোধিনী সভার সদস্য' ও 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার' নিয়মিত লেখক। অক্ষয কুমার তাঁর প্রসিদ্ধ 'পল্লীগ্রামের প্রজাদের দুরবস্থা' লিখে প্রজাদের উৎপীড়নের কথা জনসমাজে ব্যক্ত করে গেছেন। ১৮২৭ সালের পাল্কী বাহকেবা ইংরাজ সরকারের বিরুদ্ধে ধর্মঘট করায় বাংলার অভিজাত সমাজের অনেকেই পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে এই ধর্মঘটের সমর্থনে মত প্রকাশ করেন। জরীপ বিভাগের কুলিদের উপর ইংরাজ অফিসাররা অকথ্য অত্যাচার করত। ইয়ং বেঙ্গলের রাধানাথ শিকদার কুলীদের উপর এই অত্যাচারের প্রতিবাদ করেন।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, নিম্নশ্রেণীর মানুষ, বিশেষত চাষী ও শ্রমজীবিদের দিকে শিক্ষিত অভিজাত সম্প্রদায়ের একটা অংশের দৃষ্টি পড়েছিল। চেতনা দেখা দিয়েছিল এদের উন্নতি করার। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এদেশের দরিদ্র মজুর, কৃষক ও শ্রমজীবিদের স্বার্থই যে দেশের স্বার্থ সেটা প্রথম বোঝা যায় ১৮৫৭ সালের পর বিশেষ করে নীলচাষীদের ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে। নীলচাষী শ্রমিক, চা-বাগান শ্রমিক এবং ইংরাজ কুটির শ্রমিকদের উপর অকথ্য অত্যাচারের প্রতিবাদে 'Hindoo Patriot' ও 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকা দুটি মুখর হয়ে উঠল।

মেহনতী মানুষের প্রতি দৃষ্টি পড়েছিল বঙ্কিমচন্দ্রেরও; তিনি তাঁব 'বঙ্গদেশের কৃষক' ও 'সাম্য' প্রবন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন মেহনতী মানুষের কথা। তাঁর এই প্রবন্ধগুলিতে ইউরোপের প্রসিদ্ধ সমাজতান্ত্রিক নেতা সেন্ট সাইমন, ফুরিয়ের, প্রুধো এবং বাকুনিনের চিন্তাব ছাপ আছে। সামন্ততান্ত্রিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাঁর কলম সোচ্চার হয়ে উঠেছিল। বিবেকানন্দ আরও একধাপ এগিয়ে গিয়ে বললেন 'হে ভারতের শ্রমজীবি, তোমায় প্রণাম।'

আমাদের দেশে শ্রমজীবিদের উন্নতির দিকে যাঁরা দৃষ্টি দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন কেশবচন্দ্র সেন ও শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়। উভয়েই ব্রাহ্মসমাজের

নেতৃস্থানীয় ছিলেন। এঁদের শ্রমিক কল্যাণের চেতনার উপর কয়েকটি জিনিষ বিশেষ করে ছায়াপাত করেছিল।

উনিশ শতকের সত্তরের দশকে ইংলণ্ডে কয়েকজন সমাজ সংস্কারকের আবির্ভাব হয়, যাঁরা শ্রমজীবীদের উন্নয়নের জন্য সচেষ্ট হন। এদের আদর্শ ছিল অনেকটা 'সহৃদয় অভিভাবকত্বের' (Benevolent Paternalism)। রবার্ট ওয়েন, বেনথাম, মিল প্রভৃতির সামাজিক মতবাদের সংগে এই ব্রাহ্ম নেতাদের বিশেষ পরিচিতি ছিল। পরিচিতির মাধ্যমে আমাদের দেশেও এই সহৃদয় অভিভাবকত্বের চিন্তাধারার ছায়া পড়েছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যখন ১৮৬২ সালে হাওড়া স্টেশনে কুলিরা আটঘণ্টা কাজের দাবীতে ধর্মঘট করে তখন 'সোমপ্রকাশে' এই আন্দোলন সমর্থন করে লেখা বেরিয়েছিল।[৩] কিন্তু এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল নিজেদের সম্বন্ধে শ্রমজীবিদের সচেতন করে তুলতে না পারলে তাদের উন্নতি নেই। সচেতনতা জাগাতে গেলে তাদের শিক্ষিত ও নৈতিক উন্নতি করা ছাড়া অন্য পথ নেই। তাই এদের লেখাপড়া শিখিয়ে এবং নৈতিক উন্নতির মাধ্যমে শিক্ষিত করে তোলাই ছিল এই সব মানবতাবাদী সংস্কাবকদের কাজ। পরবর্তী যুগের অছি মতবাদের (Trusteeship) সঙ্গে এই দৃষ্টিভঙ্গী তুলনীয়। এই সব জনদরদি ব্যক্তিদের চিন্তায় এবং কাজে শ্রেণীসংগ্রামের চেয়ে মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গীই প্রাধান্য পেয়েছিল।

আগেই বলা হয়েছে যে কেশবচন্দ্র সেন ছিলেন এই আন্দোলনের পুরোধা। তিনি তাঁর চারপাশে আরও কতকগুলি প্রাণবন্ত শিক্ষিত যুবকদের আকৃষ্ট করতে পেরেছিলেন, যারা পরবর্তী সংস্কার আন্দোলনে এক-একটি দিকচিহ্নের সৃষ্টি করেছিল। এঁরা হলেন আনন্দমোহন বসু, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী, দুর্গামোহন দাস ও শিবনাথ শাস্ত্রী। এই যুবকদল শিবনাথ শাস্ত্রীর নেতৃত্বে 'সমদর্শী দল' গঠন করেন।

ইতিমধ্যেই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আশা-আকাঙ্ক্ষার এবং কৃষক শ্রেণীর পক্ষ সমর্থন করে উদারচেতা রাজনৈতিক দল গঠন সুরু হয়। ১৮৭৫-৭৬ এই সব যুবকদল 'কৃষকসভা' ও 'পিপলস্ এ্যাসোসিয়েশন' গঠন করেছিল বর্ধমান, ঢাকা, মুর্শিদাবাদ, বরিশাল, কৃষ্ণনগর, যশোহর প্রভৃতি শহরে। শেষপর্যন্ত ভারতসভা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৭৬ সালে।[৪] সম্ভবতঃ এটিই ছিল ভারতবর্ষের প্রথম সমতান্ত্রিক রাজনৈতিক সভা যেখানে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চিন্তাভাবনা স্থান পেয়েছিল। ১৮৬০ সালের পরবর্তী অধ্যায়ে বিভিন্ন পত্রপত্রিকার মাধ্যমে আসাম ও উত্তরবঙ্গের চা-শ্রমিকদের অবর্ণনীয় অত্যাচারের কাহিনী প্রকাশিত হতে থাকে।

এই পটভূমিকায় প্রথম রামকুমার বিদ্যারত্ন ও পরে দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী 'সঞ্জীবনী' পত্রিকার মাধ্যমে চা-কুলিদের অত্যাচারের কাহিনী প্রকাশ করতে থাকেন। ব্রিটিশ ভারতের

আইনে দাসপ্রথার প্রচলন না থাকলেও পেছনের দরজা দিয়ে 'কনট্রাক্ট-লেবার' বা 'ইনডেনচার-লেবার' নাম নিয়ে ভারতে প্রবেশ করে। যখন নীলকররা প্রজাদের দাদন দিতে সুরু করেন তখন দাসপ্রথা একটি নতুন মাত্রা লাভ করে। সৌভাগ্যবশতঃ নীলচাষ ভারতে দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। কিন্তু আসামের চা-বাগানে কুলীদের উপর অত্যাচার আরও তীব্র হয়। চা-বাগানে পৌঁছাবার পর চা-কুলীদের অবস্থা মুক্তির আগে আমেরিকার নিগ্রোদের অবস্থার থেকেও খারাপ ছিল।

এবার আসামে চা-চাষ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক। ১৮৩৩ সালে চার্টার আইন পাস হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আসামে চা চাষের সুযোগ এলো। এই আইনে বলা হয়েছিল যে ইউরোপীয়রা এদেশে জমি সংগ্রহ করতে পারবে। এই সময়েই চার্লটন ও জেনকিন্স আসাম ও হিমালয়ের পাদদেশে চা-গুল্ম আবিষ্কার করেন। সরকার এব্যাপারে খুব উৎসাহ দেখান এবং আসামে দ্রুত চা-শিল্পের বিস্তার ঘটে। ১৮৩৯ সালে ইংলণ্ডে আসাম কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হয়। তাদের কাছে সরকারী তত্ত্বাবধানে নির্মিত চা-বাগানগুলি বিক্রি করে দেওয়া হয়।[৪] ১৮৫৯ সালের মধ্যে আসামে চা-বাগানের সংখ্যা দাঁড়ায় ৫১, তাদের দখলে ছিল ৮০০০ একর জমি।[৫]

এই সময় আসামের চা-শিল্পে অনেক ইংরাজ তাদের অর্থ বিনিয়োগ করেন। ১৮৭৪ এবং ১৯০৪ সালের মধ্যে যে সমস্ত কোম্পানী নথিবদ্ধ হয়, তাদের মধ্যে চা-শিল্পের সংখ্যাই ছিল সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। এই সময় স্টার্লিং কোম্পানীর সংখ্যা ছিল ৬৩, তাদের মধ্যে ৩০টিই ছিল চা-কোম্পানী।[৬] ১৮৯২ সালে আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আসামকে চট্টগ্রাম বন্দরের সংগে যুক্ত করে। আলোচ্য সময়ে কয়েকজন দেশী ব্যক্তিও একত্রিত হয়ে একটি চা-কোম্পানী স্থাপন করেন। ১৮৮০ সালে লেখা একটি পুস্তক থেকে দেখা যায়, ডিব্রুগড়ে-২১২, শিবসাগরে -২৫২, নওগাঁতে-১৩০, তেজপুরে-১১৫, গুয়াহাটীতে-৬৪ এবং গোয়ালপাড়ায়-৭—সর্বমোট ৭৮০টি চা-বাগান ছিল। সমগ্র আসামে তখন ৩,৭০,২৪৭ একর জমিতে চা-চাষ হতো।

আসামে যে সব চা-বাগান ছিল, তাদের অধিকাংশই ছিল ইংরাজ মালিকানাধীন। কিন্তু ক্রমে ক্রমে প্রায় প্রতি জেলাতেই ২।৪টি বাগান বাঙালী ও আসামবাসীদের দ্বারাও পরিচালিত হতে সুরু করে। এদের মধ্যে আসামের অন্নদাচরণ ফুকন ও মানিকচন্দ্র বড়ুয়ার চা-বাগান এবং বিক্রমপুর টি কোম্পানীই প্রধান।[৭]

চা-চাষের প্রধান উপকরণ ছিল শ্রমিকের জোগান। আসামের জনসংখ্যা বেশী হলেও চা-শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকের যে চিত্র আমরা পাই, তাতে দেখা যায়, আসামের বাইরে থেকেই সর্বাধিক সংখ্যক শ্রমিক সংগ্রহ করা হতো। বিদেশী চা-কোম্পানীগুলি এই শ্রমিক সংগ্রহের জন্য ঠিকাদারদের সংগে ব্যবস্থা করত। তারা আবার 'আড়কাঠি' নিয়োগ

করত সুদূর গ্রামাঞ্চল থেকে কুলিদের প্রলোভিত করে আসামে পাঠাবার জন্য। ১৮৭২ সালে মোট কুলির সংখ্যা ছিল ৩৪,৪৩৩ জন। তাদের মধ্যে প্রায় ২।৩ অংশ ভিন্ন রাজ্যের কুলি।[৮] আসামের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কুলিদের জীবনহানীর সংখ্যাও ছিল খুব বেশী। ১৮৬৩ থেকে ১৮৬৬ সালের মধ্যে আসামে নিযুক্ত ৮৪,৯১৫ জন কুলির মধ্যে প্রায় ৩০,০০০ প্রাণ হারিয়ে ছিল আসামের জঙ্গলে। তৎকালীন 'কুলি-আইনে' এবং 'শর্তভঙ্গকারী কুলি আইনে' বলা ছিল, শর্তভঙ্গকারী কুলিদের একমাত্র সরকারই শাস্তি দিতে পারবেন। কিন্তু চা-বাগান মালিকরা নিজেদের হাতেই আইন তুলে নিতেন এবং তাদের উপর নির্মম অত্যাচার করতেন।[৯]

আসাম প্রদেশে যাতায়াতের পথ তখন ছিল অত্যন্ত দুর্গম। ছিল না ভালো রাস্তা বা রেলপথ। আসামের আবহাওয়াও অন্য প্রদেশের লোকের পক্ষে সহ্য করা সহজ ছিল না, তাই যে সমস্ত কুলি মাদ্রাজ, বাংলা, উড়িষ্যা, সাঁওতাল পরগনা ও বিহারের ছোটনাগপুর অঞ্চল থেকে আসত তাদের পক্ষে ঐ আবহাওয়ায় মানিয়ে চলা প্রায় অসম্ভব হতো। এর উপর অমানুষিক পরিশ্রম ও অর্ধাহার। সব মিলিয়ে আসামে চা-কুলিদের অবস্থা দাঁড়ায় বন্দী পশুর মতো। অপছন্দ হলে বা স্বাস্থ্যের কারণে তারা আসাম থেকে ফিরে আসতে পারত না, ফেরার পথে যদি ধরা পড়ত, তাহলে তাদের উপর এমন অমানুষিক অত্যাচার করা হতো, যাতে তারা আর কোনদিনও পলায়নে সাহসী না হয়। এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে আদালতে আবেদন করেও কোন ফল পাওয়া যেত না কারণ সমস্ত জজই ছিলেন সাহেব এবং স্বভাবতই তাদের স্বজাতি চা-মালিকদের প্রতি দরদ অনেক বেশী ছিল।

এই কুলি সংগ্রহের পদ্ধতি সম্বন্ধে খানিকটা আলোকপাত করা যায়। কুলিদের অধিকাংশই দরিদ্র ও শুধুমাত্র পেট ভরে খাবার জন্য দূরবর্তী আসামের জঙ্গলের অস্বাস্থ্যকর স্থানে যেতেও তাদের বাধেনি। এদের মধ্যে সকলেই স্বেচ্ছায় আসামে যায়নি; কিম্বা সরকারও তাদের বাধ্য করে পাঠিয়েছেন, তাও নয়। সেই সময় কলকাতায় কতকগুলি কুলির ডিপো ছিল। সেই রকম ডিপোর মহাজনেরা পল্লীগ্রাম থেকে কুলি সংগ্রহ করে আনত আড়কাঠি মারফত। আড়কাঠিরা ধর্মের এবং অন্যান্য প্রলোভন দেখিয়ে কুলবধূদের পর্যন্ত ঘরের বাহির করত এবং এই কুলির সামান্য কাজে তাদের প্রেরণ করত।

কুলি ধরার একটি কৌশলের উল্লেখ আছে রামকুমার বিদ্যারত্নের লেখা 'কুলি-কাহিনী' পুস্তকে। একজন কুলি সংগ্রাহক আর একজন কুলি-সংগ্রাহককে জানাচ্ছেন সে কেমন করে কুলি সংগ্রহ করে। তার মতে, "আমাদের দেশের লোক বড়ো ধর্মভীরু, ধর্মের ভান করিয়া অসাধ্য কার্য তাদের দ্বারা সাধন করা যায়, তীর্থের নামে হিন্দুরা

পাগল। তুমি আড়কাঠিদিগকে জগন্নাথ, কামাখ্যা বা অপরাপর তীর্থের পাণ্ডা সাজাইবে। তাহারা পাণ্ডা হইয়া গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করিয়া তীর্থের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিলেই, ছোট লোকদের মন গলিয়া যাইবে। অবশেষে তীর্থযাত্রার ভান করিয়া তাহাদিগকে কলিকাতায় লইয়া আসিবে। তাহারা একবার কলিকাতায় ডিপোতে আসিলেই যেন তেন প্রকারেন রেজিস্টরী করিয়া চালান দিবে। এতো গেল বাঙালী কুলিদের পক্ষে। কিন্তু বুনো (হাজারিবাগ ও অন্যান্য সাঁওতাল) কুলিদিগকে মহাপ্রসাদ ঠুকলেই ধরা যাইতে পারে। এইরূপ করিলে কুলি সংগ্রহ করা অতি সহজ হইয়া উঠিবে। আমরা এই উপায়ে এবার সাতশত কুলি ধরিয়াছি।"

উপরিউক্ত আলোচনায় এবং ভাষায় স্পষ্টই প্রমাণিত হয় আড়কাঠি বা কুলি ডিপোর ঠিকাদারদের কাছে কুলিদের জীবনের মূল্য কিরূপ ছিল। কুলিদের দুরবস্থার কথা বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ছড়িয়ে আছে। সেগুলি যত্নের সঙ্গে পড়লে আমাদের ধারনা আরও স্পষ্ট হবে। সেই যুগের কয়েকটি পুস্তকে এই সব ঘটনা ছড়িয়ে আছে আর আছে কয়েকটি পত্র-পত্রিকার জীর্ণ পাতায়। সেগুলি আজ একান্ত দুষ্প্রাপ্য।

'পুঞ্জিবদ্ধ কুলিদের' প্রয়োজনীয়তা যত বাড়তে লাগল ততই আড়কাঠিদের অসৎ আচরণ বাড়তে লাগল। ভারতবর্ষে তখন পরিপূর্ণ কুলি-বাজারের সৃষ্টি হতে দেখা দিল। কিন্তু দিন দিন অর্থনীতির দ্রুত অবক্ষয়ে এই চাহিদা দ্রুতগতিতে বাড়তে লাগল। ফলে দাসবাজারের প্রয়োজনীয়তাও দ্রুত বৃদ্ধি পেল। এই দরিদ্র পীড়িত জনসাধারণ তবুও গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য সহজে এই দাসবৃত্তিতে নিজেকে নিয়োজিত করতে সহজে রাজি হল না। তাছাড়া গ্রামেও তাদের কাজের কোন সহজ সুযোগ ছিল না, ফলে এই সব শ্রমিকরা 'ভাল দাস শ্রমিকে' রূপান্তরিত হয়ে চাকুরিদানকারীদের সহজ শিকারে পরিণত হয়েছিল। এরাই আড়কাঠিদের সাধুতায় আকৃষ্ট হয়ে চুক্তিবদ্ধ হতে বাধ্য হচ্ছিল।[১০] যেইমাত্র ঐ কুলিরা চা-বাগানে উপস্থিত হতো তখন থেকেই তারা শ্বেত চা-করদের দয়ার উপর নির্ভর করতে বাধ্য হতো। দিনে অথবা রাত্রে তাদের মর্জি অনুযায়ী যে কোন কাজ করতে হতো, অন্যথায় শাস্তি ছিল "জুতো এবং লাথি"। এ ছাড়া যাবতীয় কুলি-মহিলাদের পক্ষে এই সব শ্বেতাঙ্গ নরপুঙ্গবদের 'কামনা-লালসা' চরিতার্থ করতে হতো, অন্যথায় তাদের উপর অত্যাচারের সীমা-পরিসীমা থাকত না। সতীত্ব ও সম্ভ্রম রক্ষা করা তাদের পক্ষে প্রায় দুঃসাধ্য ছিল। ফলে চা-করদের লালসা থেকে তাদের মুক্তি পাবার কোন পথ ছিল না।

এই ধরনের অত্যাচার ও শোষণ আসামে অবাধ গতিতে চলতে লাগল। যেহেতু আসামে যাবার যানবাহন তখন সহজ ছিল না, তাই এই সব খবর দেশবাসীর সহজে কর্ণগোচর হতো না। তাছাড়া সরকারী অফিসাররা যেহেতু সাদাচামড়ার লোক তাই

স্বভাবতই ইংরেজ চা-করদের প্রতি তাদের দুর্বলতা ছিল। কিন্তু ১৮৭৮ সালে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হলে এর ধর্ম-প্রচারকেরা ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে। যদিও আসাম তখন অগম্য ছিল কিন্তু ব্রাহ্ম প্রচারকেরা সব বাধা অতিক্রম করে এই চা-বাগানগুলিতে উপস্থিত হয়েছিলেন। এর মধ্যে একজন তরুণ ধর্মপ্রচারক রামকুমার বিদ্যারত্ন আসামে এসে উপস্থিত হলেন।[১১] চা-বাগানে কুলিদের অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশা দেখে তিনি বিস্মিত হলেন। চা-কুলিদের অত্যাচার ও পরিশ্রমের সঠিক সংবাদ সংগ্রহ করে কলকাতায় ফিরে এসে রামকুমার তা পত্রিকায় প্রকাশ করে দিলেন। সমগ্র ভারতবাসী এই প্রথম আসামে চা-কুলিদের অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্টের কথা জানতে পারলেন। এই সময় 'ভারতসভা' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ব্রাহ্মসমাজের নামী সদস্যরা যেমন দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী, কালীশঙ্কর সুকুল, কৃষ্ণকুমার মিত্র ও হেরম্ব চন্দ্র মৈত্র ভারতসভার প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ আসামে চা-কুলিদের মধ্যে সংস্কারে উদ্যোগী হলেন। ভারতসভার পক্ষে লর্ড লিটনের কাছে একটি প্রতিবেদন পেশ করা হয় যাতে রামকুমার বিদ্যারত্নের লেখা প্রবন্ধের কিছু অংশ ইংরেজিতে অনুবাদ করে তাঁকে পাঠানো হয়। সময়টি এই আন্দোলনের শুভমুহূর্ত ছিল কারণ প্রাদেশিক আইনসভায় শীঘ্রই 'এশিয়ান ইমিগ্রেসন বিল' আলোচিত হতে যাচ্ছিল। ১৮৮২ সালে সিন্ডিকেট কমিটি তাদের আলোচনা সমাপ্ত করলে লর্ড রিপন বললেন, "ভারতসভা আমাদের কাছে জানিয়েছে যে, চা-কুলিরা কি রকম অজ্ঞ ও অশিক্ষিত। তারা অদ্ভুত লেখা উদ্ধৃত করেছে একটি বই থেকে, যেটি লিখেছেন ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক রামকুমার বিদ্যারত্ন—যেখানে এই অনিচ্ছুক কুলিদের অবস্থা বর্ণনা করা আছে।[১২]

ব্রাহ্ম আন্দোলনের নেতা কৃষ্ণকুমার মিত্র ১৮৮৩ সালে বাংলাভাষায় 'সঞ্জীবনী' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকায় রামকুমার চা-করদের বিরুদ্ধে যে সমস্ত মামলা হচ্ছিল এবং তাতে ইংরাজ আইনজীবীরা কি রকম একতরফা রায় দিচ্ছিল তার কাহিনী নিয়মিত পাঠাতে লাগলেন। বেশিরভাগ সময়েই এই জজেরা একতরফা রায় দিতেন, আর যখন বাধ্য হতেন তখন নামমাত্র জরিমানায় শ্বেত চা-করদের মুক্তি দিতেন। এইসব বিচারের মধ্যে দুটি বিচার জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই দুটি হলো 'ওয়েবের কেস' এবং অপরটি হলো 'উমেশের কেস'। খবরের কাগজে এই বিচার দুটি প্রকাশিত হয়ে যাওয়ায় 'চা-কর' সাহেবরা হুঙ্কার ছাড়লেন "সঞ্জীবনী সংবাদদাতার জীবন চা-করের প্রথম গুলিতেই শেষ হবে।"[১৩] কিন্তু রামকুমার নির্ভীক ভাবে তাঁর প্রচার চালিয়ে যেতে লাগলেন। 'সঞ্জীবনীর' পাতায় তিনি দুটি বিচারের প্রহসন প্রকাশিত করলেন।

মিস্টার গর্ডন ছিলেন কালাজোলা নামে সিলেটের এক চা-বাগানের সর্বময় কর্তা।

তিনি ক্রোধান্বিত হয়ে উমেশ নামে ১৪ বছরের এক কুলি বালককে পেটে বুটজুতোসহ লাথি মারেন। বালকটি মাটিতে পড়ে গেলে জুতোসহ পা দিয়ে তার সারা শরীর মাড়িয়ে দেয় ফলে বালকটির প্লীহা ফেটে গিয়ে মৃত্যু হয়। গর্ডনকে বন্দী করে জেল আদালতে তার নামে নালিশ করা হয়। জেলা জজ গর্ডনকে সম্মানের সঙ্গে মুক্ত করে দেন। এই বিষয়টি 'সঞ্জীবনী' পত্রিকাতে প্রকাশিত হলে শিক্ষিত মহলে এ নিয়ে এক বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি হয়। এতে চা-কর সাহেবদের ক্রোধ চরম সীমায় ওঠে, এমনকি তারা রামকুমারকে হত্যা পর্যন্ত করতে মনস্থ করে। রামকুমার সঞ্জীবনীকে জানান যে তাঁর জীবন বিপন্ন। তিনি আরও জানান কেবল শ্বেতাঙ্গ চা-কররাই নয়, স্থানীয় হাকিম, উকিল, মোক্তার, সরকার, কেরানী, গোমস্তা যারা কোম্পানীর কর্মচারী ছিল—তারা সবাই তাঁর প্রাণনাশের চেষ্টা করেছিল।[১৪]

চার্লস ওয়েব কিন্তু চা-কর ছিলেন না, তিনি জেনারেল স্টীম নেভিগেশন কোম্পানীর কর্মচারী ছিলেন, এবং তিনি কোকিলামুখে নিযুক্ত ছিলেন। কুলিরা প্রথমে এখানে এসে তাঁর ব্যবস্থাপনায় সাময়িকভাবে থাকে। পরে বিভিন্ন নির্দিষ্ট চা-বাগানে স্থানান্তরিত হয়। তিনি ছিলেন যথার্থই একটি পশু, সুকুরমনি নামে একটি কুলি রমনীর তিনি সতীত্ব নষ্ট করতে চাইলেন। বিবাহিত রমনী আপ্রাণ বাধা দেবার চেষ্টা করেও সফল তো হলেনই না উপরন্তু আঘাত পেলেন। শেষ পর্যন্ত ওয়েব তার কামনা চরিতার্থ করল এবং হতভাগ্য কুলি রমনীটি মারা গেল। ওয়েবকে বন্দী করে হাজতে পাঠান হলো। যে ডাক্তারটি পোস্টমর্টেম করেছিলেন তিনি ভুল রিপোর্ট দিয়ে জানালেন সুকুরমনির স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এই ঘটনায় অনেকজন চাক্ষুষ সাক্ষী ছিল। ফলে সমগ্র কুলিবাহিনী সাহেবের উপর ক্ষেপে ওঠে। চা-কররা দেখল যে এই ঘটনাটা চাপা দেওয়া এত সহজ নয়। তাই বন্দী করার পর ওয়েবকে জোড়হাটে এ্যাসিট্যাস্ট কমিশনার এর কাছে বিচারের জন্য পাঠান হলো। এই ভদ্রলোক নিম্নোক্তভাবে তার রিপোর্ট পেশ করেন—"যদিও ওয়েব সুকুরমনিকে অন্যায় ভাবে আটক করেছিল এবং এই আটকের প্রকৃত কারণ জানা যায় না কারণ এর সঠিক আইনগত কোন প্রমাণ নেই।" এই রিপোর্ট অনুযায়ী তিনি ওয়েবকে মাত্র ১০০ টাকা জরিমানা করে মুক্তি দিলেন। মামলাটি কলিকাতা হাইকোর্টে বিচারের জন্য এলে এখানেও আগের নির্দেশই বহাল রাখা হয়।

এই হাস্যকর বিচারের বিরুদ্ধে খবরের কাগজগুলিতে ক্রমাগত লেখা প্রকাশিত হতে লাগল। কলকাতার কিছু গণ্যমান্য ব্যক্তি গভর্নর জেনারেল লর্ড রিপনের কাছে একটি প্রতিনিধি দল নিয়ে উপস্থিত হন। তিনি তাদের আশ্বস্ত করেন যে তিনি এর প্রতিবিধান করেবেন। কিছুদিন পরে গভর্নরের প্রাসাদ থেকে এইরূপ ঘোষণা করা হয় "গভর্নর-জেনারেল যত্নের সংগে সমগ্র বিচার বিবেচনা করে এই বিচারকে অসমাপ্ত ও

অসন্তোষ জনক বলে ব্যাখ্যা করলেন"। এই রকম অন্যায় ও উদ্দেশ্যমূলক বিচার সত্ত্বেও গভর্নর জেনারেল ঘোষণা করলেন তিনি হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে যেতে পারেন না কিন্তু ভারতসভা ও সাধারণ ব্রাহ্মসভা এখানেই থেমে থাকলেন না। এই সময় দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী উভয় সংগঠনেরই সহ-সচীব ছিলেন। 'ভারতসভা' এই বিচারের প্রহসনের উপরে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। কিছু তরুণ সদস্য এতেও সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। তারা আর একটি পুস্তিকা প্রকাশ করলেন যাতে ওয়েবের বিচার সংক্রান্ত হাস্যকর বিচারকদের সমস্ত ঘটনা বিস্তৃতভাবে ও প্রমাণ সহযোগে প্রকাশ করলেন। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্য উইলিয়াম স্কিওন ব্লাউন্ট-এর কাছে একটি কপি পাঠিয়ে দিলেন। পুস্তিকাটির প্রস্তাবনায় লেখা হলো, "ভারতে বিচারের মৃত্যু হয়েছে। ওয়েব সংক্রান্ত কাগজপত্র এতে আছে, যেখানে ভারতের একটি মহিলাকে একজন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান-এর কামনার বলি হতে হয়েছে।"[১৫]

ভারতসভা তার সহসচীব দ্বারকানাথ গাঙ্গুলীকে আসামের চা-বাগানে পাঠালেন সরেজমিনে তদন্ত করে আরো অধিক তথ্য সংগ্রহ করার জন্য। তিনি এক বাগান থেকে অপর বাগানে, জীবন পণ করে, খড়ের গাড়ীতে লুকিয়ে মাইলের পর মাইল গিয়ে বিস্তৃত তথ্য সংগ্রহ করেন। যে সমস্ত তথ্য তিনি সংগ্রহ করেছিলেন তা প্রবন্ধের আকারে বাংলায় 'সঞ্জীবনী' ও ইংরেজী পত্রিকা The Bengalee-তে Slavary in British Dominion নাম দিয়ে ১৩টি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন ১৮৮৬ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে ১৮৮৭ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত।[১৬] ভারতসভার বার্ষিক প্রতিবেদনে এই তথ্য প্রকাশিত হয়েছিল "যে বছরের সম্বন্ধে রিপোর্ট লেখা হচ্ছে সেই বছর 'ভারতসভায়' প্রতিনিধি হিসাবে সংস্থার সহসচীব দ্বারকানাথ গাঙ্গুলীকে আসামে পাঠান হয়েছিল কুলিদের দুরবস্থা সম্বন্ধে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহের জন্য। তিনি প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন এবং এ ব্যাপারে ভারতসচীবের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।"[১৭]

দ্বারকানাথ ও তাঁর সহযোগীরা আসামের চা-কুলিদের দুরবস্থা নিয়ে দীর্ঘদিন আন্দোলন চালিয়ে গিয়েছিলেন। ১৮৮৭ সালে জাতীয় কংগ্রেসের মাদ্রাজ অধিবেশনে কুলি-সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব নেবার অনুরোধও মডারেট নেতারা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, কারণ কুলি সমস্যা নাকি প্রাদেশিক সমস্যা। দ্বারকানাথ ও তাঁর সহযোগীরা আপত্তি জানিয়ে বলে যে কুলি সমস্যা কেবল আসামের নয়। কারণ কুলি আমদানির প্রধান কেন্দ্রগুলি হলো মধ্যপ্রদেশ, ছোটনাগপুর, বিহার, উড়িষ্যা ও বঙ্গদেশ। ১৮৮৮ সালে, বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল পলিটিক্যাল কনফারেন্সের কলকাতা অধিবেশনে ডঃ মহেন্দ্র লাল সরকারের সভাপতিত্বে এই প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রশ্নটি উত্থাপন করেন একজন তরুণ ব্রাহ্মণ। যিনি পরবর্তী কালে জাতীয় আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, সেই বিপিনচন্দ্র পাল। প্রস্তাবটি নিম্নরূপ

ছিল : "যে সমস্ত ঘটনা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে এবং ভারতসভা সেই মর্মে একটি প্রতিবেদন পাঠিয়েছে। সেই মর্মে এই সম্মেলনের মত যে কুলিদের স্বার্থে সরকারের উচিত এখনই একটি কমিশন গঠন করা যিনি আসামে চা-কুলিদের অবস্থা সরেজমিনে তদারক করে তাঁর প্রতিবেদন জমা দেবে। এই মর্মে অতীতে Act-II of 1858 এবং Act I of 1882 আইনে তাদের অবস্থার উন্নতির যে কথা বলা হয়েছিল তা কতটা পালিত হয়েছে তার সম্বন্ধেও তারা খোঁজখবর নেবেন।"

এই আন্দোলন থেকে চা-কুলিদের অবর্ণনীয় অবস্থা সম্বন্ধে প্রথম জানতে পারেন আসামের চা কমিশনার স্যার হেনরী কটন। তাঁর নির্দেশে আসাম সরকার কুলিদের উন্নতির জন্য কিছু সংস্কার ঘোষণা করতে বাধ্য হন। তাঁর প্রচেষ্টায় শীঘ্রই আসামের চা-কুলিদের 'ইনডেনচার সিস্টেমের' অবলুপ্তি ঘটে। আড়কাঠীদের অত্যাচার ও শোষণ ক্রমশঃ কমে আসে। শ্বেতাঙ্গ চা-করেরা কটন সাহেবকে সুনজরে দেখেননি কিন্তু সুবিচারের জন্য তাঁর প্রচেষ্টা এবং বিশেষ করে তাঁর সাময়িক কাজকর্মের জন্য ভারতবর্ষের সর্বস্তরের মানুষের তিনি অকুণ্ঠ সমর্থন পেয়েছিলেন।

বিগত শতকের সত্তরের দশক থেকে বাঙালী জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে একটি বাঁক নেবার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। যদিও এটি ছিল দুর্বল এবং একেবারেই নতুন, তবুও তাদের মধ্যে রাজনৈতিক আন্দোলনকে গরীব চাষী, শ্রমিক ও শ্রমজীবী আন্দোলনের সংগে যুক্ত করবার আকুল আগ্রহ দেখা যায়। এদের বেশীর ভাগই ছিলেন তরুণ ব্রাহ্মণ। বিংশ শতাব্দীর সুরুতে কলকাতার আশেপাশে একাধিক ধর্মঘট সাধিত হয়। এই সব ধর্মঘটের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বাঙালী জাতীয়তাবাদীরা।[১৮] সুতরাং এইভাবে অধ্যবসায়ের সংগে যে বীজ বপন করেছিলেন রামকুমার, দ্বারকানাথ প্রমুখ কয়েকজন অসীম সাহসী বালক তা শীঘ্রই বিরাট চারায় রূপান্তরিত হয়েছিল।

নির্দেশিকা

১। Rammohan Roys's letter to Robert Dale Owen—published in the Dilip Biswas and PC. Ganguly. ed. *Life and Letters of Raja Rammohan Roy*, 1962, PP-494-95.

২। Abhoy Charan Das, *The Indian Ryot*, Cal, 1881, PP-378

৩। *সোমপ্রকাশ*, ১৮৬২

৪। C.W.E. Cotton, *Handbook of Commercial Information*, Cal, 1924, PP-203.

৫। *Selection from the Records of the Govt. of Bengal*, 37 (1861).

৬। *Statistics and Commerce*, September, 1904.

৭। রামকুমার বিদ্যারত্ন, *উদাসীন সত্যশ্রবার আসাম ভ্রমণ*। ১৮৮১, পৃ-১২৬-২৭

৮। *Bengal Administration Report, 1867-68.*

৯। D. Chamanlal, cited in A. Guha, *Planter Raj to Swaraj*, 1977.

১০। সনৎ বসু, *Studies in Bengal Renaissance*, পৃ-৫৩৩

১১। রামকুমার বিদ্যারত্ন, *উদাসীন সত্যশ্রবার আসাম ভ্রমণ*, পৃ-১

১২। প্রভাত কুমার গাঙ্গুলি, *ভারতের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের খসড়া*, পৃ-৬৯

১৩। তদেব।

১৪। *সঞ্জীবনী*, জুন ৬, ১৮৮৫

১৫। "জাস্টিস মার্ডারড ইন ইণ্ডিয়া," কলকাতা, ১৮৮৪, পৃ-১

১৬। লেখকের *সঞ্জীবনী* ও *Slavery in British Dominion* পুস্তক দুটি দ্রষ্টব্য।

১৭। '*দি বেঙ্গলী*', সেপ্টেম্বর, ২৫, ১৮০৬

১৮। ভি.বি.কার্নিক, *স্ট্রাইকস্ ইন ইণ্ডিয়া*, পৃ-৩৮-৪৩

২

বাংলায় আধুনিক শিল্প শ্রমিকের জন্ম ঃ কৃষক থেকে শ্রমিক

দীপিকা বসু*

ঐতিহাসিক ই.পি. টমসন ইংলন্ডের শ্রমিকশ্রেণীর নির্মাণের ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে এই শ্রেণীর গড়ে ওঠার প্রক্রিয়ার দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তাঁর মতে কোন এক নির্দিষ্ট সময়ে সূর্য ওঠার মতো শ্রমিকশ্রেণীর আবির্ভাব ঘটেনি। তিনি মনে করেন এটি একটি ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়াকে পরিস্ফুট করতে তিনি আধুনিক শিল্প শ্রমিকের পূর্বসূরী কারিগর ও অন্যান্য শ্রমজীবি মানুষের র‍্যাডিকাল চিন্তা ভাবনা, তাদের সংগ্রামী ঐতিহ্যের বিশদ চিত্র অত্যন্ত সযত্নে অঙ্কন করেছেন। তিনি স্পষ্টভাবেই জানিয়েছেন যে শ্রমিকশ্রেণীর নির্মাণের যে ইতিহাস তিনি রচনা করেছেন তার একেবারে কেন্দ্রে রয়েছে এই কারিগর প্রমুখ অন্যান্য শ্রমজীবি মানুষ। তিনি ১৭৯০ দশকের ফ্রান্সের জ্যাকোবিন আন্দোলনের সঙ্গে তাদের ১৮১৬-২০ সালের আন্দোলনের এক অদৃশ্য ধারাবাহিকতা উপলব্ধি করেছেন। করিগর প্রমুখ বিভিন্ন শ্রমজীবি গোষ্ঠীর বিচিত্র অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণ করে তিনি দেখিয়েছেন কিভাবে তারা পুরনো বিক্ষিপ্ত চিন্তাভাবনার পরিবর্তে এক শ্রেণী হিসেবে চিন্তাভাবনা করতে, উপলব্ধি করতে ও কাজ করতে শুরু করেছিল। তিনি মনে করেন শ্রমিকশ্রেণীর গড়ে ওঠার এই প্রক্রিয়া পূর্ণতা পেয়েছে চার্টিস্ট আন্দোলনের সময়কালে যখন এই বিভিন্ন গোষ্ঠী একই সাধারণ চিন্তাধারা, কর্মসূচী ও কর্মপন্থা গ্রহণ করেছিল এবং তাদের নিজস্ব এক সাধারণ প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিল।[১]

* প্রাক্তন অধ্যাপিকা, ইতিহাস বিভাগ, মুরলীধর গার্লস কলেজ, কলকাতা ও শ্রমআন্দোলনের গবেষক।

আমাদের দেশেও আধুনিক শিল্প বিকাশের অঙ্গ হিসেবে আধুনিক শিল্প শ্রমিকের উদ্ভব ও গড়ে ওঠার ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে প্রাক্-শিল্পায়ন শ্রমজীবি মানুষের সংগ্রামী ঐতিহ্যের কিছু ধারাবাহিকতা আমরা উল্লেখ করতে পারি। অবশ্য মনে রাখতে হবে যে শিল্প বিপ্লবের পীঠস্থান ইংলন্ডের শ্রমিকদের উদ্ভব ও গড়ে ওঠার সঙ্গে কোন ভাবেই আমাদের দেশের শ্রমিকদের গড়ে ওঠার ইতিহাস তুলনা করা যায় না। ভারতের ঔপনিবেশিক পরিমন্ডলে গোড়ার যুগের শ্রমিকরা ইংলন্ডের মতো কৃষক থেকে কারিগর, তারপর কারিগর থেকে শিল্প শ্রমিকে পরিণত হওয়ার সুযোগ পায় নি। ঔপনিবেশিক শাসকরা নিজেদের স্বার্থে প্রাক্ ধনতান্ত্রিক সম্পর্কগুলিকে বজায় রাখার চেষ্টা করেছে। সরাসরি কৃষকের স্তর থেকে শ্রমিকের জীবনে প্রবেশ করায় গোড়ার দিকে সম্প্রদায়গত চেতনা, ধর্ম, বর্ণের প্রভাব তাদের মানসিকতায় লক্ষ্য করা যায়। শিল্পোন্নত দেশের তুলনায় ভারতের মত উপনিবেশে শিল্প বিকাশের গতিও ছিল অনেক মন্থর ও অসম্পূর্ণ। শিল্প বিকাশের অসম্পূর্ণতার জন্য গোড়ার যুগের শ্রমিকেরা তাদের গ্রামীণ জীবন থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হতে পারেনি। তবে এই সব বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও এদেশের শিল্প শ্রমিক বিভিন্ন স্তবের মধ্য দিয়ে একটি শ্রেণী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়েছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি এদেশে বিক্ষিপ্ত ভাবে এবং অত্যন্ত মন্থরগতিতে যে আধুনিক শিল্পের সূচনা হল তার মধ্যে প্রধান হল বাংলাদেশের চট শিল্প আর বোম্বাইয়ের বস্ত্র শিল্প। আদি পর্বের এই শ্রমিকরা এসেছিল সমাজের একেবারে দুঃস্থ ও নিঃস্ব সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে। ইংলন্ডে আধুনিক যন্ত্রশিল্পের প্রচলন হলে প্রচলিত কুটির শিল্পগুলি আধুনিক যন্ত্র শিল্পে রূপান্তরিত হয় এবং সেখানকার কারিগররাও আধুনিক শিল্প শ্রমিকে পরিণত হয়। উপনিবেশ ভারতে তা ঘটে নি। ইংলন্ডের উন্নত যন্ত্র শিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের সনাতন তাঁতশিল্প এবং অনুষঙ্গ অন্যান্য শিল্প বিনষ্ট হওয়ায় তাঁতী ও অন্যান্য কারুশিল্পীরা তাদের দীর্ঘদিনের জীবিকা হারায়। অন্য কোন বিকল্প না থাকায় তারা ভিড় করে চাষের কাজে। জমির ওপর অতিরিক্ত চাপের ফলে কৃষিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আধুনিক কারখানার সূচনা হলে এইসব জীবিকাচ্যুত নিঃস্ব মানুষরাই যোগ দেয় কারখানার কাজে।

আধুনিক শিল্পের সূচনার আগেই এইসব কৃষক, তাঁতী, কারিগর প্রমুখদেরও অত্যাচার অবিচারের বিরুদ্ধে সমবেতভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলার ঐতিহ্য লক্ষ্য করার মত। ঊনবিংশ শতাব্দী জুড়েই তো বাংলাদেশে তথা ভারতে অসংখ্য কৃষক বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছে যার মধ্যে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য হল নীল বিদ্রোহ (১৮৬০), পাবনার কৃষক বিদ্রোহ (১৮৭২-৭৩), আর বাংলাদেশের বাইরে সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৮৫৫),

দাক্ষিণাত্যের বিদ্রোহ (১৮৭৫), মোপলা বিদ্রোহ (১৮৮৫-১৯০০) ইত্যাদি। তাছাড়া কৃষক, কারিগর ও অন্যান্য শ্রমজীবি মানুষও অন্যায়ের প্রতিবাদ জানাতে বা তাদের দাবী আদায়ের জন্য যৌথ ভাবে কাজ বন্ধ করে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে এমন অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। যেমন, ১৮২৫-২৬ সালে পাগলপন্থীদের বিদ্রোহের সময় শেরপুর নগরের শ্রমজীবি মানুষরা বিদ্রোহীদের প্রতি সহানুভূতি জানিয়ে সামরিক রাস্তা তৈরীর কাজ করতে অসম্মত হয়। ফলে রাস্তা তৈরীর কাজই বন্ধ করে দিতে হয়।[২] ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেটের এক রিপোর্টে দেখা যায় যে ১৮১৩ সালের কোন সময়ে চৌকিদারী ট্যাকস্ ধার্য করার প্রতিবাদে কোম্পানীর কারখানার প্রায় ৪০০-৫০০ শ্রমিক কাজ বন্ধ করে কাছারিতে গিয়ে হাজির হয়।[৩]

কারিগর বিশেষ করে তাঁতীদের সমবেত প্রতিরোধ আন্দোলন এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। ইংলন্ডের যন্ত্রশিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় এই সব তাঁতীরা তাদের দীর্ঘদিনের জীবিকা হারিয়ে একেবারে নিঃস্ব হয়ে গিয়েছিল। এদেশে আধুনিক শিল্পের সূচনা হলে তারা এসে ভিড় করেছিল এইসব কলকারখানায় এবং বলা যেতে পারে যে তাদের আন্দোলনের ঐতিহ্য তারা বহন করে নিয়ে এসেছিল।

শান্তিপুরের তাঁতীরা ছিল খুবই প্রতিবাদী। যেহেতু কোম্পানীর সঙ্গে কাজ করার চেয়ে বাইরের বণিকদের সঙ্গে কাজ করলে তাদের লাভ হত বেশী তাই প্রায়শঃই তারা কোম্পানীকে যথাসময়ে যোগান দিতে পারত না। কোম্পানীর কনট্রাক্টররা তাদের এই কাজে বাধা দিলে তাদের মধ্যে প্রবল অসন্তোষ দেখা দেয়। তারা প্রতিদিন সমবেত হয়ে তাদের এইসব অভিযোগ ও দাবী দাওয়া নিয়ে আলোচনা করে এবং কোম্পানীর কাজ করাই বন্ধ করে দেয়। শেষ পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করে এবং বিদ্রোহী নেতাদের গ্রেপ্তার করে তাদের এই আন্দোলন ভেঙ্গে দেওয়া হয়।[৪]

ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানীর ব্যবসা বাণিজ্যকে কেন্দ্র করে যখন কলকাতা শহরের গুরুত্ব বাড়তে থাকল তখন শহর কলকাতায় এসে ভিড় জমাতে লাগল নানাধরণের শ্রমজীবি মানুষের দল। শহরের বিত্তবান সম্প্রদায়ের দৈনন্দিন জীবনের চাহিদা মেটাতে প্রয়োজন হল গোয়ালা, ধোপা-নাপিত-মুচি যারা শহরের নতুন পরিবেশে নতুন বিধি-নিয়মের শাসনে নিযুক্ত হল নিজ নিজ পেশায়। শিল্পনগরী কলকাতার কর্মব্যস্ত জীবনের অনুষঙ্গ হিসেবে ঠিকা গাড়ীর চাহিদা বাড়ল। শহরের পরিবহণের প্রধান অঙ্গ হয়ে উঠল এই ঠিকা গাড়ী। আর দেশী বিদেশী সম্ভ্রান্ত মহিলাদের যাতায়াতের জন্য দরকার হল পাল্কীর। কাজেই ঠিকাগাড়ীর গাড়োয়ান আর পাল্কীবাহকেরাও কলকাতার শ্রমজীবী মানুষের ভিড়ে মিশে গেল।

কলকাতার এইসব শ্রমজীবি মানুষও ঊনবিংশ শতাব্দী জুড়ে প্রতিবাদ আন্দোলনে

সামিল হয়েছে তাদের নিজস্ব কায়দায়। বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত শ্রমজীবী মানুষের দল যারা রুজি রোজগারের আশায় শহর কলকাতায় এসে জড়ো হল, তারা শহর জীবনের নানা বিধি-নিষেধ, শ্বেতাঙ্গদের চোখ রাঙানি আর অত্যাচার, আরও নানাধরণের শোষণ বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছে। সনাতন পেশায় নিযুক্ত এইসব শ্রমজীবী মানুষ যেমন ধোপা, গোয়ালা, গাড়োয়ান, নাপিত—ইংরেজ সরকারের কঠোর নিয়ম কানুন ও অতিরিক্ত করের প্রতিবাদে যখন ধর্মঘট আন্দোলন গড়ে তুলত তখন তারা নিজস্ব বর্ণ ভিত্তিক সংগঠন স্থাপন করত। ধর্মঘটে যোগদান না করলে বা সংগঠনের নিয়ম লঙ্ঘন করলে নিজ নিজ বর্ণভিত্তিক সমাজ থেকে বহিষ্কার করার সিদ্ধান্তও নেওয়া হত।

১৮২৭ সালে উড়িয়া পাল্কী বাহকরা লাইসেন্স ফি ধার্য করা, বিশেষ ব্যাজ পরিধান করা আর শ্বেতাঙ্গ যাত্রীদের উদ্ধত আচরণের প্রতিবাদে এক যোগে কাজ বন্ধ করে এবং হাজার পাল্কী বাহক সমবেতভাবে সুপ্রীম কোর্টের কাছে তাদের দাবী পেশ করে। তাদের এই আন্দোলন কয়েকদিন ধরে চালিয়ে যাওয়ায় কলকাতার দৈনন্দিন জীবন যাত্রা কিছুটা ব্যাহত হয় কারণ পাল্কী ছিল তখন পরিবহণের এক বিশিষ্ট ব্যবস্থা।[৭]

১৮৪৯ সালে গরুর গাড়ীর গাড়োয়ানরা নতুন কর ধার্য করার প্রতিবাদে একযোগে গাড়ী চালান বন্ধ করে এবং কুলীরাও তাদের সঙ্গে যোগ দেওয়ায় প্রায় ৫০০০ গাড়োয়ান আর কুলী সমবেতভাবে সরকারের কাছে এই কর বাতিলের দাবী পেশ করে এবং তাদের কর্ম বিরতির ফলে ব্যবসা বাণিজ্য বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।[৮]

উনিশ শতকের শেষ দশকে কলকাতার বিভিন্ন এলাকার ঠিকাগাড়ীর চালকরা একদিকে ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশের জুলুম আর অন্যদিকে পশুরক্ষা সমিতির কঠোর বিধি নিষেধের প্রতিবাদে দফায় দফায় আন্দোলন আর ধর্মঘট করে কলকাতা শহরের জনজীবনকে বিপর্যস্ত করে তোলে। বিংশ শতকের একেবারে শুরুতে ১৯০১ সালের জুনমাসে কলকাতায় ঠিকাগাড়ী ও গরুর গাড়ীর গাড়োয়ানদের যুগ্ম ধর্মঘট শহরে প্রবল চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। সামান্য কয়েকটি এলাকা ছাড়া তাদের আন্দোলন সারা কলকাতা শহরে ছড়িয়ে পড়ে। এমন কি কলকাতার আশে পাশে হাওড়া প্রভৃতি এলাকার ঠিকা গাড়ী আর গরুর গাড়ীর গাড়োয়ানরা এই ধর্মঘটে যোগ দেয়। রেল স্টেশন, জেটি এলাকা, ব্যবসা বাণিজ্যের কেন্দ্রগুলিতে কোন গাড়ী না থাকায় কাজকর্ম সব অচল হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। সংবাদপত্রের পাতায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ পায়। সরকারও বাধ্য হয় তৎপরতার সঙ্গে তাদের অভিযোগগুলি সম্পর্কে তদন্ত করতে। ফলে ১১জুন ধর্মঘট প্রত্যাহার করা হয়। তাদের সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে ঐ বছরেই মেদিনীপুরে এবং ১৯০৩ সালের অকটোবর মাসে আসানসোলের ঠিকাগাড়ীর চালকরা বিভিন্ন দাবীতে ধর্মঘট করে।[৯]

১৮৭৮ সালে কলকাতা ও তার আশেপাশে প্রায় ২০০০ ধোপা একটি সভায় মিলিত হয়ে নতুন কর স্থাপন ও জিনিস-পত্রের মূল্য বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে কাপড় কাচার মজুরী বাড়াবার দাবী জানায়। তারা নিজেদের সংগঠিত করে একটি সমিতিও গঠন করে এবং সমিতির নিয়ম-কানুন রচনা করে। কোন সদস্য সেই নিয়ম লঙ্ঘন করলে তার যথোচিত শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়।[৮]

১৮৮০ সালে কলকাতার গোয়ালারা ম্যাজিস্ট্রেটের অন্যায় আদেশের প্রতিবাদে ধর্মঘট করে কলকাতার মানুষের সমস্যার সৃষ্টি করে। পশুদের প্রতি নিষ্ঠুরতা বিরোধী সমিতির নির্যাতনের প্রতিবাদে তারা ১৯০৩ সালে নিজেদের মধ্যে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠা করে এবং সমিতির সদস্যরা তাদের সমস্যা নিয়ে আলোচনার জন্য শহরের বিভিন্ন এলাকায় আলোচনা সভার আয়োজন করে।[৮]

কলকাতার রাস্তায় জল দেওয়ার জন্য নিযুক্ত ভিস্তিরা ১৮৯১ সালে কাজ বন্ধ করে সরকারী নির্দেশের প্রতিবাদ জানায়।[১০]

বিভিন্ন এলাকার প্রায় ৩০০০ মুচি ১৮৯৬ সালে তাদের চামড়ার ব্যবসায়ে আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার আর তার ফলে অনেকের কর্মচ্যুতির প্রতিবাদে সম্মিলিত ভাবে ধর্মঘট করে এবং ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের তাগিদে নিজেদের মধ্যে একটি সঙ্ঘ গঠন করে। সঙ্ঘের নিয়ম ভঙ্গ করলে পঞ্চায়েত সভার আয়োজন করে তার শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়।[১১]

কাজেই শহর কলকাতার জীবনযাত্রার সঙ্গে যুক্ত এইসব শ্রমজীবি মানুষ অন্যায় অত্যাচারের প্রতিবাদে, বিদেশী সরকারের নানাবিধ কঠোর আইন কানুন ও অন্যায় করের বিরুদ্ধে তাদের নিজেদের মতো করে আন্দোলন সংগঠিত করেছে। তখনও তারা পুরোপুরি শ্রমিক হয়ে ওঠেনি। তারা ছিল আধা কৃষক আর আধা শ্রমজীবি। তারা আন্দোলন করেছে নিজেদের পেশা আর বর্ণের ভিত্তিতে। শ্রমিক ঐক্যের ধারণা তখনও তাদের মধ্যে গড়ে ওঠেনি।

এরই পাশাপাশি এই পর্বে যে আধুনিক শিল্পায়নের সূচনা হ'ল যেমন রেল, টেলিগ্রাফ, ডাক বিভাগ—সেখানে নিযুক্ত শ্রমিকরাও আন্দোলনের পথে পা বাড়িয়েছে। বলা যায়, আধুনিক শিল্প শ্রমিকদের তারাই পূর্বসূরী। তাদের আন্দোলনের ধরণও ছিল কিছুটা ভিন্ন। প্রাক-শিল্প শ্রমজীবি মানুষের বর্ণভিত্তিক সংগ্রামের বদলে তারা এখন বর্ণ সম্প্রদায় নির্বিশেষে তাদের শিল্প প্রতিষ্ঠানে যৌথ আন্দোলনের কর্মসূচী গ্রহণ করেছিল। হাওড়া স্টেশনের প্রায় ১২০০ রেল শ্রমিক ৮ ঘন্টা কাজের দাবীতে ১৮৬২ সালের মে মাসে কাজ বন্ধ করায় স্টেশনের সমস্ত কাজকর্ম প্রায়

অচল হয়ে যায়।[১২] আবার ১৮৬৭ সালে ইস্ট-ইন্ডিয়া রেলের কর্মীরা বর্ণবৈষম্যের প্রতিবাদে বিক্ষোভ আন্দোলন সংগঠিত করে।[১৩] জেনারেল পোস্ট অফিসের পিওনরাও ১৮২৮ সালের আগস্ট মাসে ধর্মঘট করে কর্তৃপক্ষের অশালীন আচরণের প্রতিবাদ জানায়।[১৪]

আদি পর্বের শ্রমজীবি জনগণের এইসব বিক্ষোভ আন্দোলনকে আধুনিক শ্রমিক আন্দোলনের সূচনাপর্ব বলা যেতে পারে। এইসব আন্দোলন ছিল একেবারে স্বতঃস্ফূর্ত। গ্রাম থেকে শহরে আসা শ্রমজীবি মানুষের মধ্যে কৃষক সুলভ চেতনা তখনও ছিল লক্ষ্যণীয়। শ্রমিক চেতনা তখন একেবারে প্রাথমিক স্তরে। আধুনিক শিল্পে নিযুক্ত শ্রমজীবিরা যদিও শ্রমিকশ্রেণীর নিজস্ব আন্দোলনের ধারায় যৌথ আন্দোলন, ধর্মঘট ইত্যাদি গড়ে তুলেছিল তবে কৃষক সুলভ পিছুটান তখনও তাদের মধ্যে বজায় ছিল।

একটি ধারণা প্রচলিত আছে যে এদেশের শ্রমিকরা ছিল মূলতঃ কৃষক, যথার্থ শ্রমিক হিসেবে তারা গড়ে ওঠে নি। ১৯০৮ সালের ফ্যাকটরী লেবার কমিশন তার রিপোর্টে মন্তব্য করেছিল যে ভারতের কারখানার শ্রমিকরা আদতে কৃষক অথবা ক্ষেত মজুর .... তার বাসস্থান হল গ্রামে যেখান থেকে সে এসেছে, শহরে যেখানে সে কাজ করে সেখানে নয়, আর তাই ইউরোপীয় দেশগুলির মতো এখানে এখনও কারখানার শ্রমিক বলে কিছু নেই।

ফ্যাকটরী লেবার কমিশনের উপরোক্ত বক্তব্যকে সম্পূর্ণ গ্রহণ করা যায় না। কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসার মতো তথ্যের প্রাচুর্য না থাকলেও যেটুকু তথ্য পাওয়া যায় তার ভিত্তিতে বলা যায় যে শ্রমিকরা এই পর্বে তাদের গ্রামে ফিরে যেতে সব সময় উৎসুক ছিল না; কারখানায় কাজ চালিয়ে যেতে তারা আগ্রহী ছিল। ১৮৯০ সালের ফ্যাকটরী কমিশন যে ২৫জন শ্রমিকের সাক্ষ্য গ্রহণ করেছিল তাদের মধ্যে একজন বরাহনগর চটকলে ২০ বছর, একজন ইউনিয়ন চটকলে ১৯ বছর আর অন্য একজন বজবজ চটকলে ১৮-১৯ বছর ধরে কাজ করে যাচ্ছিল। সেন্ট্রাল চটকলে একজন মুসলমান শ্রমিক কাজ করছিল ১২ বছর ধরে। সুতাকলের ক্ষেত্রের দেখা যায় যে বেঙ্গল কটন মিলে একজন ১০-১৫ বছর, এমপ্রেস ইন্ডিয়া কটন মিলে একজন ১০ বছর আর বাউড়িয়া কটন মিলে উড়িষ্যা থেকে আগত এক শ্রমিক ১১ বছর ধরে কাজ করছিল। ১৯০৮ সালের ফ্যাকটরী লেবার কমিশনের কাছে দেওয়া সাক্ষ্যে ইমামন ইমানিশার নামে এক তাঁতী সর্দার জানিয়েছিল যে কাঁকিনাড়া চটকলে সে দীর্ঘ ২৬ বছর ধরে কাজ করছে।

আধুনিক কোন কোন গবেষকও আবার দেখাতে চেয়েছেন যে ঔপনিবেশিক ভারতে প্রাক ধনতান্ত্রিক সম্পর্কগুলি বজায় থাকায় এদেশের শ্রমিকেরা 'শ্রেণী' হিসেবে

গড়ে উঠতে পারে নি, সম্প্রদায়গত চেতনার মধ্যেই তারা সীমাবদ্ধ থেকেছে। শোষণের বিরুদ্ধে যৌথ প্রতিবাদ আন্দোলনের পরিবর্তে তাঁরা শ্রমিকদের মধ্যে চুরি ডাকাতি এবং এই ধরণের অপরাধমূলক কাজের প্রবণতা দেখেছেন।[১৫]

এদেশের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে কিন্তু ভিন্ন চিত্রই পাওয়া যায়। একথা ঠিকই যে ব্রিটিশ শিল্পপতিদের স্বার্থে এদেশে দেশীয় শিল্প বিনষ্ট হওয়ার ফলে এবং শিল্পায়নের অসম্পূর্ণতার জন্য শ্রমিকদের স্বাভাবিক বিকাশ ব্যাহত হয়েছে। তবে পরিস্থিতিগত এই সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এদেশের শ্রমিকরা যে শ্রেণী হিসেবে বিকাশ লাভ করেছে, একেবারে আদিম স্বতঃস্ফূর্ততার স্তর থেকে সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে স্তরে স্তরে তারা উন্নততর চেতনায় সমৃদ্ধ হয়েছে, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলেই এই সত্যটি পরিস্ফুট হয়।

বাংলা দেশের প্রধান শিল্প ছিল চটশিল্প। এই চটকল শ্রমিকদের আন্দোলনের ইতিহাস সমীক্ষা করলেই এই চেতনার বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। ১৮৯৫-৯৬ সালের মধ্যে দেখা যায় যে চটশিল্পে নিযুক্ত অধিকাংশ শ্রমিক ছিল অভিবাসী, যারা এসেছিল বিহার, উড়িষ্যা, উত্তর প্রদেশের অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত অঞ্চল থেকে। কতিপয় চটকলে বাঙালী শ্রমিকদের ছিল প্রাধান্য যেমন বজবজ, ফোর্ট গ্লস্টার। চটকল স্থাপনের গোড়ার যুগের শ্রমিকরা পরিচিত গ্রামীণ পবিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, কারখানার নিয়ম শৃঙ্খলার কঠোর শাসন, কারখানার ম্যানেজার, সুপারভাইজারদের অমানবিক আচরণ ইত্যাদিতে বিক্ষুব্ধ হয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কারখানার চত্বরে দাঙ্গা, ম্যানেজার সুপারভাইজারদের দৈহিক পীড়নের মাধ্যমে। ক্রমে ক্রমে তাদের চেতনা যখন আরও উন্নত হয়েছে, শ্রম ও পুঁজির সম্পর্ক তারা বুঝতে শুরু করেছে তখন শুধু দাঙ্গা, মারাপিট নয়, তারা নিজেদের দাবী দাওয়া সাজিয়ে, যেমন কাজের ঘন্টা হ্রাস, মজুরী বৃদ্ধি, অফিসারদের স্বৈরাচারী ব্যবহারের প্রতিবাদ—এইসব দাবী আদায়ের জন্য আন্দোলন সংগঠিত করেছে, এমন কি ধর্মঘট আন্দোলনেও তারা সামিল হয়েছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে শ্রমিকরা অনেকগুলি চটকলে, যেমন শিবপুর, হুগলী, কাঁকিনাড়া, গার্ডেনরীচ ক্লাইভ, বরাহনগর. শ্যামনগর, ঘুষুড়ী ইত্যাদিতে তাদের নিজস্ব দাবী, মূলতঃ অর্থনৈতিক, আদায়ের জন্য ধর্মঘটে সামিল হয়েছে। এই প্রসঙ্গে ১৮৯৫ সালের মে-জুন মাসে সর্দারের শোষণের প্রতিবাদে বজবজ চটকলের প্রায় ৭০০০ শ্রমিকের বিক্ষোভ ও ধর্মঘট আন্দোলন উল্লেখ করাব মতো। তাদেব এই বিক্ষোভ ও ধর্মঘটের ফলে প্রায় ৬ সপ্তাহ কারখানা বন্ধ রাখতে হয় এবং কোম্পানীর ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়ায় ৮০.০০০ টাকা।[১৬]

শুধু অর্থনৈতিক দাবী দাওয়া নয় এই পর্বে শ্রমিকদের মধ্যে সংহতিবোধও লক্ষ্য করার মতো। সহকর্মীদের ছাঁটাই বা নির্যাতনের প্রতিবাদে বা অন্য চটকলের ধর্মঘটী শ্রমিকদের সমর্থনেও তারা কাজ বন্ধ করেছে। যেমন, ১৮৯৫ সালের অকটোবর মাসে গার্ডেনরীচের হুগলী চটকলের শ্রমিকরা ২জন সহকর্মীকে ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে আর ঐ বছরেরই জুন মাসে হাওড়া রেল স্টেশনের চৌকিদাররা তাদের কয়েকজন সহকর্মীকে ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে ধর্মঘট করে।[১৭] এই প্রসঙ্গে ১৯০০ সালে কাঁকিনাড়া মিল শ্রমিকদের ধর্মঘটের সমর্থনে চাঁদা সংগ্রহের জন্য কামারহাটি মিলের কয়েকজন শ্রমিককে বরখাস্ত করলে প্রতিবাদে তারা যে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে তার উল্লেখ করা যায়।[১৮]

এইসব ধর্মঘটের পাশাপাশি ধর্ম সংক্রান্ত দাবীতে, গো হত্যাকে কেন্দ্র করে, ধর্মীয় কোন পার্বণে ছুটির দাবীতে বা মসজিদ নির্মাণের প্রশ্ন নিয়েও আন্দোলন সংঘটিত হয়েছে, কখনও কখনও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাও বেঁধে গেছে। এসবই এদেশের শ্রমিকদের অনুন্নত চেতনার পরিচয় বহন করে। আবার এই ধর্মভিত্তিক, গোষ্ঠী কেন্দ্রিক সাম্প্রদায়িক চেতনাই এই স্তরে শ্রমিকদের প্রধান চেতনা বলে মনে করা ঠিক নয়। এই সাময়িক সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার পেছনে অনেক সময় চিরাচরিত জীবনধারা হারিয়ে যাওয়ার বেদনা ও নৈরাশ্য বড় ভূমিকা পালন করেছে। এই পর্বেই দেখা যায় যে তারা তাদের নিজস্ব দাবী নিয়ে অনেক বেশী ধর্মঘট পরিচালনা করেছে এবং মালিক আর সরকারের সমস্ত নিপীড়ন সত্ত্বেও হিন্দু ও মুসলমান শ্রমিক একসঙ্গে লড়াই চালিয়ে গেছে।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে বাংলাদেশের চটকল শ্রমিকদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনারও আভাস পাওয়া গেছে। বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে যখন সারাদেশে ব্রিটিশ বিরোধী জাতীয় আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল তখন চটকলের শ্রমিকরাও সেই জাতীয় আহ্বানে সাড়া দিয়েছিল। পুরোপুরিভাবে রাজনৈতিক দাবীতে আন্দোলন না হলেও এই আন্দোলনগুলিতে রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রভাব নিঃসন্দেহে কাজ করেছিল। ১৬ই অকটোবর (১৯০৫) বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত কার্যকরী হওয়ার দিনে বিভিন্ন চটকল এলাকায় শ্রমিকদের মধ্যে ব্যাপক অসন্তোষ লক্ষ্য করা যায়। ফোর্ট গ্লস্টার চটকলের শ্রমিকেরা রাখী বন্ধনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ধর্মঘটের ডাক দেয়। তাছাড়া এই পর্বে প্রায় ১৮টি চটকলে শ্রমিকরা নানা দাবী নিয়ে আন্দোলন সংগঠিত করে।[১৯]

এই পর্বেই শ্রমিকদের কয়েকটি আন্দোলন ব্যাপকতায় ও স্থায়িত্বে সারা দেশজুড়ে আলোড়ন জাগিয়েছিল, যেমন — সরকারী ছাপাখানায় ধর্মঘট (১৯০৫), ইস্ট ইন্ডিয়া রেলের ধর্মঘট (১৯০৬), টেলিগ্রাফ পিওনদের ধর্মঘট আন্দোলন (১৯০৮)। কোন

কোন আন্দোলনে রাজনৈতিক চেতনারও প্রকাশ ঘটেছে। জাতীয় আন্দোলনের নেতারা শ্রমিকদের এই অসন্তোষকে সংগঠিত রূপ দিতে শ্রমিক সংগঠন গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছেন, যদিও ইউনিয়ন গঠনের প্রাথমিক উদ্যোগ এসেছে শ্রমিকদের দিক থেকেই। ১৯০৬ সালে গড়ে উঠেছে চটকল শ্রমিকদের নিজস্ব সংগঠন — ইন্ডিয়ান মিল হ্যান্ডস্ ইউনিয়ন; ছাপাখানার কর্মীদের নিয়ে গঠিত হল প্রিন্টার্স ইউনিয়ন আর রেল কর্মীদের ইউনিয়ন—রেলওয়ে মেনস্ ইউনিয়ন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী পর্বে শ্রমিক আন্দোলন আরও এক নতুন স্তরে উন্নীত হয়। অকটোবর বিপ্লবের সাফল্য, রুশ দেশে শ্রমিক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা সারা বিশ্বের শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে সাড়া জাগায়। এদেশের শ্রমিকরাও পিছিয়ে ছিল না। ১৯২০ সালে প্রতিষ্ঠিত হল নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস।

১৯২৭ সাল থেকে শ্রমিক আন্দোলনে আবার এক নতুন জোয়ার দেখা যায়। এই পর্বের শ্রমিক আন্দোলনে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গী ও কর্মসূচী নিয়ে আসে কমিউনিস্টরা যারা শ্রমিক কৃষকদের সংগঠিত করতে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছিল। এই পর্বে জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যেও একটি বামপন্থী গোষ্ঠী যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে ওঠে যার পুরোভাগে ছিলেন জওহরলাল নেহরু, সুভাষচন্দ্র বসু প্রমুখ নেতারা। ১৯২৭-৩০ এর পর্বে এদেশের শ্রমিক আন্দোলনে নিঃসন্দেহে আরও অগ্রসর চেতনার পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল এবং ব্যাপকতায়, দৃঢ়তায় এই পর্বের আন্দোলনগুলি আগের আন্দোলনকে অতিক্রম করেছিল। এই সব দীর্ঘস্থায়ী শ্রমিক আন্দোলনগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখ যোগ্য হল বিভিন্ন রেলপথে, বোম্বাই-এর সূতাকলে আর বাংলাদেশের চটকলে শ্রমিক আন্দোলন। কাজের মেয়াদ বৃদ্ধি সত্ত্বেও অনুপাতে মজুরী বৃদ্ধি না করায় বিভিন্ন চটকলে শ্রমিকদের অসন্তোষ ১৯২১ সালে একটি ব্যাপক সাধারণ ধর্মঘটে পরিণতি লাভ করে। ২৪-পরগণা, হুগলী সমেত কলকাতার প্রায় সমস্ত চটকলে বিস্তার লাভ করায় এই আন্দোলন একটি সর্বাত্মক সাধারণ ধর্মঘটের রূপ নেয়। শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে যা নিঃসন্দেহে একটি নতুন ঘটনা।

কাজেই গোড়ার যুগের এদেশের শ্রমিকদের গড়ে ওঠার এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে দেখা যায় যে তারা ছিল মূলতঃ কৃষক, এদেশে কারখানার শ্রমিক বলে কিছু ছিল না—ফ্যাকটরী লেবার কমিশনের এই সিদ্ধান্তও যেমন গ্রহণযোগ্য নয় তেমনই আধুনিক কিছু গবেষকের বক্তব্য যে এদেশে প্রাক্ ধনতান্ত্রিক সম্পর্কগুলি বজায় থাকায় শ্রমিকরা শ্রেণী হিসাবে গড়ে উঠতে পারেনি, তাও মেনে নেওয়া যায় না। নানারকমের বাধা-বিপত্তি, ওঠা-পড়া, পিছুটান সত্ত্বেও ধীরে ধীরে শ্রেণী হিসেবে তারা নিজেদের স্থান করে নিয়েছিল।

নির্দেশিকা

১। Thompson, E.P. *The Making of the English Working Class*, Pelican Books, 1980, pp 916-37

২। Kaviraj, N. *The Pagalpanthis of Mymensing* (1825-26), *Problems of National Liberation*, Vol 3, No 1, pp 1-8

৩। Govt of Bengal, Judicial Dept. Progs 31, July 1813

৪। Sinha, N.K., *An Economic History of Bengal*, Vol I, Calcutta 1970, pp 169-70

৫। An Article in *Hindusthan Standard* by Sakti Ghose, 12 April, 1970

৬। An Article by Panchanan Saha based on a report in *Sambad Bhaskar*, 26 June, 1849

৭। Judicial, Police, 14-29, December 1901; *Indian Daily News*, 10 June 1901; 20 October, 1903

৮। *Samachar Chandrika*, 21 November, 1878 (Report on Native Papers)

৯। *Indian Daily News*, 6 January 1903.

১০। *Ibid*, 13 June, 1891

১১। *Ibid*, 8 January 1896; Amrita Bazar Patrika, 10 January 1896

১২। *সোমপ্রকাশ*, ১৩ বৈশাখ, ১২৬৯

১৩। *National Paper*, 11 September 1867

১৪। Roy, B.P. *Note on the Early Postal System in Bengal Presidency* (1800-1830), *Problems of National Liberation*, Vol 5, No. 1, pp 47-48

১৫। Chakraborty, Dipesh, *Rethinking Working Class History : Bengal* 1890-1940, Princeton University Press, 1988, p 4. Also *Communal Riots and Labour*, Occasional Paper No II, Centre for Studies in Social Science, Calcutta 1976.

১৬। *Indian Daily News*, 4, 8 May, 1895; *Amrita Bazar Patrika*, 4, 9 May 1895

১৭। *Indian Daily News*, 14 October, 2, 24 July 1895

১৮। *Bengalee*, 16, 18 December, 1900

১৯। Sarkar, Sumit, *Swadeshi Movement in Bengal* 1903-08, New Delhi 1973, p 288;

Indian Daily News, 27 October, 1905

শ্রমিক-আন্দোলন ও গোড়ার যুগের মহিলা নেতৃত্ব

মঞ্জু চট্টোপাধ্যায়*

বিশ্বায়ন, উদারীকরণ এই সংজ্ঞাগুলো আর নতুন না, প্রত্যেকে নিজের নিজের দেশে এই শব্দ দুটির নিজের মতো করে ব্যাখ্যা করে নিয়েছে। মনে করা হয়েছিল একটা বিশ্ববাজার হচ্ছে ভোগবাদী পণ্যের, যে বিশ্ববাজারে সবাই সবার পণ্য বিকি কিনি করতে পারবে।

কিন্তু তা হল না। হবে কি করে? কারণ নিয়ন্ত্রণের দড়ি দড়াগুলো চলে গেল কয়েকটি শক্তিশালী দেশের হাতে। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা রইল অল্প কয়েকটি দেশের এবং কিছু বহুজাতিক সংস্থার নিয়ন্ত্রণে। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ক্ষমতা এল অল্প কয়েকজনের হাতে, যারা বহুজাতিক সংস্থার সঙ্গে সহযোগিতা করে নিজেদের মুনাফা বাড়িয়ে এক নয়া অর্থনীতির বাজার চালু করতে চাইল। তাই অবাক হলেও, বিশ্বের ধনীদের তালিকায় আজ ভারত শীর্ষস্থানীয়দের মধ্যে জায়গা করে নিতে পেরেছে। সম্পদ সমগ্র ভারতবর্ষের বাড়েনি, সম্পদ বেড়েছে কয়েকজন ব্যক্তির। বিশ্বায়নের হাত ধরেই আসে ব্যক্তি মালিকানা।

দেশের শিল্প সম্পদের জাতীয়করণ আজ বাতিল হয়ে, তার জায়গা নিল দেশী বিদেশী ব্যক্তির বা বহুজাতিক সংস্থার মালিকানা। যেন মনে হচ্ছে বিশ্বায়ন পুরোনো সাম্রাজ্যবাদকে নয়া মোড়কে পৃথিবীর ছোট বড় স্বাধীন দেশের মানুষের কাছ বিশ্ববাজারে

*প্রাক্তন রীডার, ইতিহাস বিভাগ, সরোজিনী নাইডু কলেজ, কলকাতা ও ইতিহাসের বিশিষ্ট গবেষক।

বিকোতে চাইছে। বিদেশী পণ্যে দেশের বাজার ছেয়ে গেছে, হাত বাড়ালেই যা চাই তা পাওয়া যাবে। তাই পারি না পারি ঐ জিনিষই কিনতে হবে। প্রশ্ন হল কজন কিনতে পারে? তার চেয়েও বড় প্রশ্ন হল আমাদের পণ্যের কি হবে?

আমাদের চায়ের, দেশে তো বাজার আছেই, বিদেশেও বড় বাজার আছে। তা যদি হয় তবে একটার পর একটা চা-বাগান বন্ধ হয়ে যাচ্ছে কেন? কেউ ভেবে দেখেছেন কত হাজার হাজার শ্রমিক এবং তাদের পরিবার এই চা-বাগানগুলোর সঙ্গে যুক্ত। তারা বাঁচবে কি করে ? শিল্প তো দেশের উন্নয়নে নিশ্চয়ই অপরিহার্য, কিন্তু যে শিল্প রয়েছে তাকে মেরে ফেলার মধ্যে তো কোন বাহাদুরী নেই। আজ যখন নাভিশ্বাস উঠেছে তখন সরকারী ভাবে চা-বাগানগুলোকে বাঁচাবার জন্য কয়েক কোটি টাকা ধার্য করা হয়েছে। সরকারী ভাবে, কি শ্রমিক নেতৃত্বের তরফে, চা-বাগানগুলোর সমস্যা কোথায় তার কোন খোঁজ নেওয়া হয়েছে? খাবারের অভাবে মানুষ যে ওখানে মরে যাচ্ছে তার খবরই বা কজন রাখছে? শহরে ভদ্রলোকরা যতদিন সকালে বিকালে চা পাচ্ছেন, ততদিন তো তাদেরও ভাবার কিছু নেই। কিন্তু এক সময় মানুষ ভাবতেন, তখন আমরা স্বাধীনও ছিলাম না, কোন শ্রমিক সংগঠনও ছিল না।

উনিশ শতকের দুজন মানুষ চা-বাগানের কুলিদের উপর সাহেবদের অকথ্য অত্যাচারের খবর শুনে সেখানে তাদের অবস্থা দেখতে গেছলেন। দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী এবং রামকুমার বিদ্যারত্ন নিজেদের পরিচয় গোপন করে, প্রাণ সংশয়ের ভয় না করে আসামে চা কুলিদের কাছে হাজির হয়েছিলেন। দীর্ঘ একমাস সেখানে থেকে সমস্ত খবরা খবর ছদ্মনামে লিখে পাঠাতেন 'সঞ্জীবনী' পত্রিকায়। তাঁরা লিখেছিলেন 'ভদ্রলোকরা, তোমরা সকালে যে চা পান করো মনে রেখো তাতে মিশে আছে কুলির রক্ত' রামকুমার বিদ্যারত্ন ফিরে এসে লিখলেন 'কুলি কাহিনী' বইটি।

একুশ শতকে আমরা কি উনিশ শতকের চেতনাও হারিয়ে ফেললাম। আজ কলকাতা শহর এবং শহরতলীতে গেলে মনে হয়, আমাদেরও একটা কলকাতা ছিল। এ কলকাতা আমরা চিনি না। দোকান পাট, বড় বড় বাড়ি, উড়াল পুল, দেশী বিদেশী সম্ভারে সাজানো 'শপিং মল'—নিশ্চয়ই এর দরকার আছে। কিন্তু উড়াল পুলের আনাচে-কানাচে, রেল লাইনের ধারে, বাস রাস্তার ধারে যারা ছেলে মেয়ে নিয়ে সংসার পেতেছে—তারা তো কলকাতার কলঙ্ক। এদের নিয়ে ভাবার কেউ নেই — সবাই বিরক্তিতে সযত্নে এদের এড়িয়ে চলে। এরা আজ আমাদের গবেষণার বস্তু।

কলকাতার রাস্তা ক্রমাগত ভেঙ্গে চুরে বড় করা হচ্ছে—কেননা গাড়ির সংখ্যা, লোকের সংখ্যা বড় বেশী হয়ে গেছে। এর পর অল্প দামের গাড়ি বাজারে এলে, তা কোথায় চালানো হবে?

আমাদের দেশে শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস যখনই বোঝার চেষ্টা করি তখন একটা কথা মনে হয়েছে সংগঠনের নেতৃত্ব কোন শ্রমিকের হাতে নেই, আছে শিক্ষিত ভদ্র শ্রেণীর মানুষের হাতে। অবশ্য যখন কোন সংগঠন তৈরী হয়নি তখন অনেক সময়ই শ্রমিকরা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে ধর্মঘট করেছে। দাবী আদায় হয়নি, কিন্তু এর মধ্য দিয়ে শ্রমিকদের একধরনের চেতনা বৃদ্ধি পেয়েছে, সাহসও বেড়েছে।

১৮৬২-র মে মাসে হাওড়া স্টেশনের কুলিরা ৮ ঘন্টা কাজের দাবীতে একদিন ধর্মঘট করে। খবরটি প্রকাশিত হয় তখনকার একটি বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকায়।[১]

১৮২৭ সালে কলকাতার পাল্কি বেহারারা ধর্মঘট করে কাজের অবস্থার উন্নতি এবং বেতন বৃদ্ধির জন্য। কলকাতায় তখন হাজারেরও বেশী পাল্কি বেহারা কাজ করত। এদের সমর্থনে গঙ্গার নৌকার মাঝিরা এবং ঘোড়ার গাড়ির চালকেরাও ধর্মঘট করে।[২] মাঝিদের নেতা তিনকড়ি ধর্মঘটীদের এক সমাবেশে বললেন, "পাল্কি বেহারাদের মজুরী আইন করে কমিয়ে দিচ্ছে, সেজন্য ধর্মঘট করেছে। আপাতত এতে আমাদের কোন ক্ষতি হবে না। কিন্তু কাল আমাদের জন্যও হয়তো এরকম আইন পাশ হবে। এজন্যই আমরা একসঙ্গে লড়াই করছি।"[৩] একসঙ্গে লড়াইয়ের চেতনা শ্রমিকদের কিন্তু নিজের থেকেই এসেছে।

১৮৫৫-৫৭ আসামের কাছাড় জেলার চা-বাগানের শ্রমিকরা নিজেরাই একটা ইউনিয়ন তৈরী করল এবং চা-কর সাহেবদের অমানুষিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে ধর্মঘট করে। শ্রমিক নেতা মধুরামকে ৭ বছরের কারাদন্ড দেওয়া হয়। ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট ক্ষেপে গিয়ে বলেছিলেন, 'আমরা তোকে আগে ফাঁসি দেব, তারপর বিচার করব।'[৪]

১৯২০ তে সর্বভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের জন্ম হল বোম্বাই-এ। কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে সর্বসম্মতভাবে নারী শ্রমিকদের দাবী সমর্থন করে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়—"এই মহা সম্মেলনের অভিমত যে প্রত্যেকটি কল-কারখানা যেখানেই নারী শ্রমিকরা কাজ করে সেখানেই বিশেষ ব্যবস্থা রাখতে হবে, যাতে কাজের সময় মেয়েরা তাদের সন্তানকে নিরাপদে রাখতে পারে"।[৫]

এর পর বহু বছর কেটে গেছে, সাধারণ ভাবে মেয়েদের এবং নারী শ্রমিকদের হয়তো উন্নতি হয়েছে, তবে কতখানি? যে কোন শিল্পেই তুলনামূলক ভাবে মেয়েদের চেয়ে পুরুষ শ্রমিকের সংখ্যা অনেক বেশী, অবশ্যই সংগঠিত শিল্পে। তাই দাবী দাওয়া, আন্দোলন, নেতৃত্ব সবই ছিল পুরুষের হাতে। মেয়ে শ্রমিকদের কথা খুব একটা ভাবা হয়নি।

উনিশ শতকের শেষ এবং বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ভারতবর্ষের সবচেয়ে শিল্পোন্নত প্রদেশগুলোর অন্যতম ছিল অবিভক্ত বাংলা এবং বোম্বাই। বাংলায় চটকল, কাপড়কল, কয়লা খনি, চা-বাগান, বন্দর, ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প ও বহু ছোট বড় কারখানা গড়ে উঠেছিল। গোড়ার দিকে অধিকাংশই ছিল বাঙালী শ্রমিক।[৬] এই সব শিল্পে নারী শ্রমিকের সংখ্যাও ছিল উল্লেখযোগ্য। শুধুমাত্র বন্দরে কোন মেয়ে কাজ করতো না। এই মেয়েরা প্রধানতঃ মুসলমান, নিম্নবর্গীয় এবং আদিবাসী সমাজ থেকেই এসেছিল।

চটকলে, কয়লা খনিতে মেয়ে মজুরের সংখ্যা ছিল মোট মজুরের ১৫ শতাংশ। চটকলে একটা বিভাগে শুধু মেয়েরাই কাজ করতো। ধানকল ও চা-বাগানে মেয়ে মজুরের সংখ্যা ৫০ শতাংশ, কোথাও তার চেয়েও বেশী।

এছাড়া জমাদার, মেথর অর্থাৎ ধাঙড়দের মধ্যে বেশ বড় অংশ মহিলা শ্রমিক, এমনকি শিশু শ্রমিকও ছিল। পটারী, রেশম শিল্প, বিড়ি তৈরী, গৃহনির্মাণ, ইটভাটায় এবং ক্ষেতে-খামারে মেয়ে শ্রমিকের সংখ্যা বেশীই ছিল। মেয়ে ও শিশু শ্রমিকের চাহিদা ছিল, কারণ কম মজুরীতে এদের খাটানো যায়। পুরুষ ও নারীর বৈষম্য সর্বত্রই করা হোত। তখন কোন শ্রমিক সংগঠন নেই — অর্থাৎ সবাই অসংগঠিত শ্রমিক। কিন্তু দাবী দাওয়া, দাবী আদায়ের জন্য লড়াই করার সব রকম চেতনাই শ্রমিকদের ছিল।

১৮৯২-তে একটি রিপোর্টে জানা যাচ্ছে "যখনই কোনও কারখানাতে কোন ডিপার্টমেন্টে মজুরী কমানোর চেষ্টা করা হয়েছে বা কোনও ফোরম্যান অথবা সর্দাররা উৎপীড়ন করেছে, তখনই সেই কারখানাতে মেয়ে পুরুষ সব শ্রমিকরাই ধর্মঘট করেছে, কখনও কয়েক ঘন্টার জন্য, কখনও কয়েকদিন ধরে। যেমন ঘুসুড়ির সুতাকলে ধর্মঘট হয়েছে ১৮৮১-তে এবং ১৮৯০-তে। ২৪-পরগণার টিটাগড়, কামারহাটি, কাঁকিনাড়া, শ্যামনগর, গার্ডেনরিচ ও বজবজের চটকলগুলিতেও শ্রমিক বিক্ষোভ ফেটে পড়েছে।"[৭]

শুধু মজুরী বৃদ্ধি, বা কাজের ঘন্টা কমানো—এতেই শ্রমিকদের প্রতিবাদ থেমে থাকেনি। ১৯০৫ সালে বঙ্গ ভঙ্গের বিরুদ্ধে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী যে স্বদেশী আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন, তখন তাদের ডাকা ধর্মঘটে বাঙালী শ্রমিকরা অংশগ্রহণ করেছিলেন।

তবে ১৯০৮ সালে তিলকের যখন সাজা হল তখন বোম্বাই-এর শ্রমিকশ্রেণীও সাধারণ ধর্মঘটে যোগ দিয়ে রাস্তায় পুলিশের বিরুদ্ধে ব্যারিকেডের লড়াই করে। তাদের মূল ধ্বনি ছিল 'তিলক মহারাজের মুক্তি চাই'। মারাঠি এবং গুজরাটি ভাষায় দুটি হ্যান্ডবিল প্রকাশিত হয়েছিল।

এই ধর্মঘটে শ্রমিকশ্রেণীর যোগদান নানান কারণে গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রথম কোন অর্থনৈতিক দাবী-দাওয়া নয়, সম্পূর্ণ রাজনৈতিক কারণে শ্রমিকরা সাধারণ ধর্মঘটে যোগ দিল। স্বদেশী আন্দোলনে বাংলার শ্রমিকদের যোগদানও একই রকম গুরুত্বপূর্ণ। এই ধর্মঘটে হিন্দু-মুসলমান, ব্রাহ্মণ, অচ্ছুৎ, মারাঠি, গুজরাতি—জাতি ধর্ম নির্বিশেষে প্রত্যেকে লড়াইয়ে যোগ দিয়েছে। এমনকি গরীব চাষিরা যাদের অনেকেই লোকের বাড়িতে কাজ করে, তারাও ধর্মঘটে সামিল হয়।[৮]

আশ্চর্যের কথা জাতীয় কংগ্রেসের নরমপন্থী কি চরমপন্থী কোন নেতাই এই ধর্মঘট সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করেননি। অথচ দূর বিদেশে নির্বাসিত লেনিন বলেছিলেন "শ্রমিকশ্রেণীর এই ধর্মঘট ভারতবর্ষে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের অবসানের সূচনা করবে।"[৯]

সাম্রাজ্যবাদেরও বুঝতে অসুবিধা হয়নি। শ্রমিকশ্রেণীর এই জাগরণকে তারা বিপজ্জনক মনে করেছিল।[১০]

আলাদা আলাদা ভাবে বেশ কিছু রাজনৈতিক নেতা শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, অন্তত শ্রমিকদের প্রতি তাদের একটা সহমর্মিতা ছিল। অথচ রাজনৈতিক আন্দোলনের আওতায় শ্রমিকশ্রেণীও আসতে পারে এ ধারণা তখন জাতীয়তাবাদী অর্থাৎ উচ্চবিত্ত বা সচ্ছল শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মনে আসেনি। তারা ধরেই নিয়েছিলেন রাজনীতি শিক্ষিত ভদ্রলোকের জন্য। শ্রমিকরা শিক্ষিতও নয়, ভদ্রলোকও নয়। তাই জাতীয় আন্দোলনের রাজনৈতিক চেতনার বাইরে রয়ে গেল দেশের শ্রমিকশ্রেণী। এমনকি বিপিনচন্দ্র পাল বাংলায় কংগ্রেসের প্রাদেশিক সম্মেলনে শ্রমিকদের সমস্যার কথা তুলতে চাইলে কংগ্রেস নেতৃত্বের অধিকাংশই আপত্তি জানালেন।

বিশিষ্ট ইতিহাসবিদদের অনেকেরই জাতীয় আন্দোলনের উপর ইতিহাস বইয়ে কৃষকরা স্থান পেলেও, শ্রমিকরা পায়নি। সুমিত সরকার স্বদেশী আন্দোলন বইটিতে শ্রমিক আন্দোলনের উপর একটি অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর অর্থনৈতিক মন্দার ফলে জিনিষ-পত্রের দাম অস্বাভাবিক ভাবে বেড়ে যায়। মুনাফা বাড়াবার জন্য কলকারখানার সংখ্যাও বাড়ল। সস্তা শ্রম আর কাঁচামাল অফুরন্ত—মুনাফার পাহাড় জমলো, ভারতের ধনিক গোষ্ঠীও এই বিপুল মুনাফার ভাগ পেয়ে ফুলে ফেঁপে উঠল। ১৯১৪-তে সমগ্র ভারতে শ্রমিক সংখ্যা ছিল ৯,৫৯,০০০, ১৯২২-এ বেড়ে হল ১৩,৬১,০০০। মুনাফা বাড়লেও শ্রমিকের মজুরী বাড়ল না। শ্রমিকরা বিক্ষুব্ধ। শ্রমিকরা ধর্মঘট করে প্রতিবাদ জানাল। এক বোম্বাইতে ১,৫০,০০০ শ্রমিক ধর্মঘট করল।[১১]

যুক্ত বাংলায় বিশের দশকে যাঁরা শ্রমিক ও ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের কাজে অগ্রণী হয়েছিলেন, সন্তোষকুমারী দেবী তাঁদেরই অন্যতমা—এই বিশিষ্ট ক্ষেত্রে এদেশের নারীদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম।

১৯৮২ সালে আমরা কয়েকজন সন্তোষকুমারী দেবীর সঙ্গে দেখা করতে যাই। নানান কথার মধ্যে আমাদের বন্ধু অধ্যাপক রণজিত দাশগুপ্ত সন্তোষকুমারী দেবীকে জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি বিশের দশকে শ্রমিক আন্দোলনে আর কোন মহিলা নেত্রীকে পেয়েছিলেন কিনা ? মনে আছে উত্তেজিত সন্তোষকুমারী বলেন "প্রফেসর সাব — মর্দানা নেহি মিলা, জেনানা কাঁহাসে মিলেগি?"

ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগের পরিচালনাধীন গোয়েন্দা বিভাগের পরিচালক স্যার ডেভিড পেট্রি সংকলিত Communism in India, 1924-27 গ্রন্থে সন্তোষ কুমারী দেবীর উল্লেখ রয়েছে।

"বাংলার যে সুপরিচিত আন্দোলনকারী শ্রমিক আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেছেন, সেই সন্তোষ কুমারী গুপ্তা ১৯২৩ সালে 'গৌরীপুর ওয়ার্কার্স এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন' নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ছিলেন তার সম্পাদিকা। কলকাতার কাছেই গৌরীপুর চটকলের শ্রমিকদের নিয়েই ঐ সংগঠনটি গড়া হয়। মুকুন্দলাল সরকারের কাছ থেকে তিনি ওয়ার্কার্স ওয়েলফেয়ার লীগ অব ইন্ডিয়ার সভাপতি কে.এম. ভাট এবং সাপুরজী শাকলাৎওয়ালার ঠিকানা যোগাড় করেন এবং মুকুন্দলাল সরকারকে লেখেন যে, চটকল কর্মীরা যেহেতু ঠিকমত সংগঠিত নন, তাই তিনি ঐ প্রতিষ্ঠানটি গড়েছেন—আর এ কারণেই তিনি শ্রীযুক্ত ভাটের সহায়তা কামনা করেন। পরে সন্তোষ কুমারী পত্রালাপ চালান দেওকিপ্রসাদ সিংয়ের সঙ্গে—যিনি ছিলেন এম. এন. রায়ের সঙ্গী এবং শিবনাথ ব্যানার্জী, মুকুন্দলাল সরকার, কুতুবদ্দীন আহমদ, কালিদাস ভট্টাচার্য ও বাংলাব অন্যান্য শ্রমিক আন্দোলনের নেতাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ।"[১২]

১৯২৪ সালের মার্চ মাসে চিত্তরঞ্জন দাশের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অল ইন্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে অভ্যর্থনা সমিতির সভানেত্রী নির্বাচিত হন সন্তোষকুমারী গুপ্তা এবং ঐ অধিবেশনে অল ইন্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের গঠনতন্ত্র রদবদল করার জন্য যে বিশেষ কমিটি গঠিত হয় তাতে নির্বাচিত হয়েছিলেন ধোন্তিরাজ থেংড়ি মুকুন্দলাল সরকার, শ্যামসুদ্দিন হাসান এবং সন্তোষকুমারী গুপ্তা।[১৩]

১৯২৫ সালে শিবনাথ ব্যানার্জী মস্কো থেকে ফিরে কালিদাস ভট্টাচার্য (প্রাক্তন রাজবন্দী), সিদ্ধেশ্বর চ্যাটার্জী (বিপ্লবী), এবং সন্তোষকুমারী গুপ্তার সহয়তায় গড়ে তোলেন বেঙ্গল জুট ওয়ার্কার্স অ্যাসোসিয়েশন।[১৪]

দমদমের ল্যান্সডাউন চটকল ধর্মঘটে সন্তোষকুমারী ধর্মঘটীদের সভায় বক্তৃতা করেন এবং ১৯২৭ সালে খড়গপুরে বি. এন. রেলওয়ে ইন্ডিয়ান লেবার ইউনিয়ন পরিচালিত ধর্মঘটের আগে ও পরে শ্রমিদের বহু সভায় বক্তৃতা করেছেন ভি. ভি. গিরি (সভাপতি), মুকুন্দলাল সরকার, আফতাব আলি এবং সন্তোষকুমারী গুপ্তা।[১৫]

এই ধর্মঘটে সাহায্যের জন্য লন্ডনের 'ওয়ার্কার্স ইন্টারন্যাশনাল রিলিফ' সংস্থা স্বরাজ্য দলের নেতা যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তর কাছে ১৩১৫ টাকা পাঠায়, তিনি ঐ অর্থ সন্তোষকুমারীর হাতে তুলে দেন।[১৬]

সন্তোষকুমারী গুপ্তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম 'আপনি কিভাবে এবং কেন শ্রমিক আন্দোলনে এলেন?' তিনি বললেন, 'আমি স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করতে এলাম।' সন্তোষকুমারী বড় হয়েছেন রেঙ্গুনে। রাজনীতিতে আসা ওখান থেকেই।

রাজনৈতিক কারণেই বর্মা থেকে পুলিস প্রহরায় তিনি কলকাতা পৌছলেন এবং পৈত্রিক বাড়ি গরিফাতে তাকে গৃহবন্দী করে রাখা হল। গৌরীপুর চটকল এখানেই। ওদের বাড়ির কাছে একটা গাছের তলায় বসে একদিন বহু জীর্ণ-শীর্ণ চেহারার মানুষ জটলা করছে। একজন বুড়ো সর্দার তাদের কি সব বলছে। তিনি ওদের সঙ্গে কথা বলে বুঝলেন এরা চটকলের শ্রমিক, ধর্মঘট করেছে বেতন বৃদ্ধি র জন্য এবং সর্দারদের জুলুম ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে। কিন্তু এরা বুঝতে পারছে না ধর্মঘট চালিয়ে যাবে, না কাজে ফিরে যাবে।

সন্তোষকুমারী তাদের অভাব অভিযোগ মিল মালিকের গোচরে আনার জন্য ধারালো ইংরেজীতে সব লিখে দিলেন, এবং শ্রমিকদের নেতৃত্ব দিতে প্রতিশ্রুত হলেন। শ্রমিকরা ভরসা পেয়ে ধর্মঘট চালিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নিলেন এবং দাবীপত্র মালিকের কাছে পেশ করলেন।

সাহেব মালিক নিজেই সন্তোষকুমারীর সঙ্গে দেখা করে বলেন, ধর্মঘট করা উচিত নয় কারণ এতে উৎপাদন বন্ধ হচ্ছে এবং শ্রমিকদের ক্ষতি হচ্ছে। সন্তোষকুমারীর বক্তব্য—শ্রমিকরা বাধ্য হয়ে ধর্মঘট করেছে, তাদের দাবী মেনে নিলে তারা ধর্মঘট তুলে নেবেন। চারদিন ধরে দীর্ঘ আলোচনার পর ঠিক হল : যাদের ধর্মঘটের জন্য গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তাদের ছেড়ে দিতে হবে; ছাঁটাই শ্রমিকদের কাজে পুনর্বহাল করতে হবে। তখনকার মতো মালিকপক্ষ এই শর্তাবলী মেনে নিলেন এবং শ্রমিকরাও কাজে ফিরে গেলেন। সন্তোষকুমারীর শ্রমিক আন্দোলনে হাতে খড়ি হল এখান থেকেই।[১৭]

এর পরই তৈরী হল 'গৌরীপুর শ্রমিক সমিতি'। শ্রমিকরা অনেকেই সমিতিতে যোগ দিল। সংগঠনের সভাপতি করল সন্তোষকুমারী দেবীকে। সহ সম্পাদক হলেন

বঙ্কিম মুখার্জী আর সম্পাদক হলেন কালিদাস ভট্টাচার্য। এরা দুজনেই শ্রমিক সংগঠন তৈরীর কাজে অসামান্য সাহায্য করেছেন।

নৈহাটী, হাজিনগর পাটের কলের প্রায় ৬ হাজার শ্রমিক গত ৮ জানুয়ারী তারিখে ধর্মঘট করে। "তাহাদের অভিযোগ বয়ন শিল্পে কাজ পাইতে হইলে সর্দার রহিমতুল্লাকে ঘুস দিতে হইত। ধর্মঘটেব পূর্বে তাহারা ম্যানেজারকে অনুরোধ করিয়াছিল ঐ সর্দারকে অপসৃত করিবার জন্য। ম্যানেজার তাহাতে কর্ণপাত করে নাই।

তাহারা তখন গৌরীপুর শ্রমিক সমিতির প্রেসিডেন্ট সন্তোষকুমারী দেবীর নেতৃত্বে এক সভায় সমবেত হয়। সভানেত্রী তাদের ধর্মঘট প্রত্যাহার করিয়া কাজে যোগদান করার অনুরোধ করিয়া বলেন, তাহারা সংঘবদ্ধ না হইলে এসব ধর্মঘটে কোন ফল হইবে না। হাজিনগরের শ্রমিকগণকে লইয়া একটি সমিতি স্থাপিত হইয়াছে।"[১৮]

শ্রমিক আন্দোলনের নেত্রী সন্তোষকুমারী দেবী শুধু মজুরদের মজুরী বৃদ্ধি ও কাজের সুযোগ-সুবিধার জন্য তাদের পাশে দাঁড়িয়ে নেতৃত্ব দেননি, তার পাশাপাশি তাদের স্বাস্থ্যকর বাসস্থান, জল এবং শৌচাগারের কথাও ভেবেছেন। শ্রমিক পরিবারের মেয়েদের (যারাও শ্রমিক) কথা আলাদা করে ভেবেছেন। বস্তিতে বস্তিতে তিনি ঘুরতেন মেয়েদের কাজে কর্মে সচেতন করার জন্য। তাদের নিয়ে সভা করতেন। তিনি মালিকের সঙ্গে লড়েছেন শ্রমিকের সন্তানদের লেখাপড়া শেখানোর জন্য স্কুলের ব্যবস্থা, মেয়েদের প্রসূতিকালীন সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করা এবং শ্রমিক ও শ্রমিক পরিবারের সু-চিকিৎসার জন্য।[১৯]

সমাজের নির্যাতিত মেয়েদের কথাও ভেবে সিরাজগঞ্জ সম্মেলনের এক অধিবেশনে শ্রীমতী সন্তোষকুমারী একটি প্রস্তাব করেন যে, "যে সকল হিন্দু স্ত্রীলোককে দুর্বৃত্তরা বলপূর্বক ধরিয়া লইয়া গিয়া তাহাদের উপর অত্যচার করে, তাহাদিগকে সমাজে গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা করা হউক।" প্রস্তাবটি সভায় গৃহীত হল।[২০] ১৯২৪-এ এজাতীয় প্রস্তাব করা এবং সভায় গৃহীত হওয়া বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তবে একটা প্রশ্ন মনে জাগে—সন্তোষকুমারী দেবী জাতি ধর্ম নির্বিশেষে, সাম্প্রদায়িকতার উর্দ্ধে উঠে সমস্ত মানুষকেই মানুষ বলে মনে করতেন। তিনি শুধুমাত্র অত্যাচারিত হিন্দু মেয়েদের কথা বললেন কেন?

সংগঠন গড়া, সংঘবদ্ধ হওয়া, বার বার একথা বিভিন্ন কারখানার শ্রমিকদের তিনি বলতেন। সংগঠিত ও সংঘবদ্ধ না হতে পারলে ধনী এবং ক্ষমতাশালী মালিক ও মহাজনদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে সফল হতে পারবে না।

বিখ্যাত বিপ্লবী ও মার্কসবাদী ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত লিখছেন, "দেশের পদদলিত লোকদের উন্নতিকল্পে তাহাদের সংঘবদ্ধ করিতে হইবে। ... তাহাদের অনুভব করাইতে হইবে যে স্বরাজ তাহাদেরই জন্য। তখন তাঁহারা স্বরাজের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করিবেন এবং মুক্তিও নিকটবর্তী হইবে।"[২১]

১৯২০-র অল ইন্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে উপস্থিত ১০৭টি ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিনিধিরা সর্বসম্মত ভাবে ঘোষণা করলেন ঃ

"Workers of India .... let unity and brotherhood of man be your watchwords. Your salvation lies in the strength of your organisation.[২২]

১৯২৩-এ জ্ঞানাঞ্জন পাল ও মুরলীধর বসুর সম্পাদনায় শ্রমিক কল্যাণের উদ্দেশ্যে 'সংহতি' নামে একটি পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করে। জিতেন্দ্রনাথ গুপ্ত ছিলেন উদ্যোক্তা। তিনি 'সংহতি'-র প্রথম সংখ্যাতে লেখেন ঃ

"বন্ধুগণ অনেকদিন থেকে আমার ইচ্ছে, আমাদের নিজেদের, অর্থাৎ যারা গরীব এবং খাটিয়া খান তাদের একখানি কাগজ হয়, ... কাগজ খানির নাম 'সংহতি'— অর্থ সকলের এক হওয়া। আমরা যাহাতে সকলে এক হইতে পারি এই কাগজ তাহার চেষ্টা করিবে।"[২৩] জিতেন্দ্রনাথ গুপ্ত ছিলেন ছাপাখানার একজন কর্মী।

পত্রিকাটির ১ম বর্ষ - ৩য় সংখ্যায় সন্তোষকুমারী দেবী বাংলাদেশের চটকল মজুরদের উপর একটি প্রবন্ধ লেখেন। তিনি লেখেন, "সমগ্র পৃথিবী জুড়ে ধনী ও শ্রমিকে একটা বিরাট সংঘর্ষ চলছে। ধনী চায় শ্রমিককে পশুরও অধম করে অথচ কোন রকমে বাঁচিয়ে রেখে দিন দিন নিজের উৎকট বাবুয়ানার বহর বাড়াতে, আর শ্রমিকরা চায় নিজের ন্যায্য অধিকার বুঝে নিয়ে ও আত্মরক্ষায় সক্ষম হয়ে সমাজে মনুষ্য বলেই গণ্য হয়ে থাকতে। কাজেই সংঘর্ষ অনিবার্য। ..... আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস ও আশা, বিপদ যখন সমগ্র সম্প্রদায়ের তখন দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত অবস্থিত চটকল সমূহের সব কর্মীরাই আমাদের আহ্বানে সাড়া দেবেন।"[২৪]

শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করতে করতে সন্তোষকুমারী দেবী শ্রমিকদের সম্বন্ধেই নানারকম খবরাখবর দিয়ে বাংলা ও হিন্দী উভয় ভাষায় একটি পত্রিকা প্রকাশ করার কথা ভাবলেন। মিল মালিকদের বুঝতে হবে যে শ্রমিক ছাড়া কারখানা অচল। শ্রমিকের পরিশ্রমেই মুনাফা বাড়ে, অতএব মুনাফায় তাদেরও অংশ আছে। এই উদ্দেশ্যে প্রকাশিত হল *শ্রমিক* পত্রিকা, ১৯২৪ সালে। পত্রিকাটি সাপ্তাহিক, দাম ১ পয়সা। পত্রিকা প্রকাশনায় সাহায্য করলেন প্রমোদ কুমার রায় এবং কালিপদ সেন।[২৫]

'*শ্রমিক*' পত্রিকার একটি মাত্র সংখ্যাই সন্তোষকুমারী দেবীর কাছে ছিল। পত্রিকার সম্পাদকীয়তে সন্তোষকুমারী লেখেন, ... "সহস্র বছরের নিপীড়িত অবনমিত শ্রেণীর উন্নতি করতে হলে বর্তমান সমাজের বহু নিয়ম কানুনের ধ্বংস সাধন করতে হবে, নতুন নিয়ম তৈরী করতে হবে, সমাজকে নতুন আদর্শ অনুযায়ী নবভাবে পুনর্গঠিত করতে হবে ...... উচ্চ শ্রেণীর বন্ধ দরজায় ঘা দিয়ে অবনমিত শ্রেণীর সঙ্গে তাদের একাসনে বসাতে হবে। শ্রমিক যে ধনিকের চেয়ে কিছুমাত্র হীন নয়, কৃষক ব্যতীত জমিদারের প্রতাপ যে অসম্ভব, সকল প্রকারে তা তাদের বুঝিয়ে দিতে হবে।"[২৬]

একই সংখ্যায় একটি খবর ছাপা হয় 'সমাজতন্ত্রের আদর্শ' শিরোনামে—বিলাতে শ্রমিক সম্প্রদায়ের একজন নেতা অসওয়াল্ড মোসলি এদেশে শ্রমিক এলাকাগুলো ঘুরে দেখে একটি সভায় বলেন, 'রাজনৈতিক স্বাধীনতাই একমাত্র লক্ষ্য নয়, অর্থনৈতিক মুক্তি তাব চেয়েও বড় কথা। ...... শ্রেণী বৈষম্যের বিষ জগৎ হতে সমাজতান্ত্রিক বা সাম্যবাদীরাই দূর করবে। আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংঘ গঠনের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকরা এমন শক্তি অর্জন করবে যে তাদের মুক্তি খর্ব করা কারো ক্ষমতায় কুলোবে না।'[২৭]

'*শ্রমিক*' পত্রিকাটি প্রকাশের ফলে শ্রমিক সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ আরও বাড়ে। শুধু চটকল নয়, এই সময় সর্বত্রই — ট্রাম, ডক, পোস্ট অ্যান্ড টেলিগ্রাফ, রেলে শ্রমিক সংগঠন গড়ে ওঠে, এবং বিভিন্ন দাবী-দাওয়ার ভিত্তিতে ধর্মঘট হয়। সন্তোষ কুমারীর সঙ্গে অনেক সময় শ্রমিকরা যোগাযোগ করে, তাকে বক্তৃতা করতে নিয়ে যেতেন।

প্রবীন বিপ্লবী পঞ্চানন চক্রবর্তী এক সাক্ষাৎকারে বলেন, 'সন্তোষকুমারী বাংলা, হিন্দী, উর্দু এবং ইংরাজী সবকটি ভাষাতেই অসাধারণ বক্তৃতা করতে পারতেন। তিনি ধর্মঘটী শ্রমিকদের কাছে যেতেন, প্রয়োজনে তাদের সাহায্য করতেন।[২৮]

১৯২৭-এর বেঙ্গল নাগপুর রেল ধর্মঘটের সঙ্গে সন্তোষকুমারী যুক্ত ছিলেন। প্রায় ৬ মাস ধর্মঘট চলল সমস্ত দমন পীড়ন ও চোখ রাঙানীকে অগ্রাহ্য করে। খড়গপুরের ধর্মঘটের সমর্থনে সারা ভারত রেল ধর্মঘটের চেষ্টা করা হয়।

স্থানীয় অধিবাসীরা, ধর্মঘটী শ্রমিক পরিবারগুলোকে বাঁচিয়ে রেখেছিল অর্থ, খাবার দিয়ে। ডাক্তাররা বিনা অর্থে চিকিৎসা করেছিলেন।

ট্রেড ইউনিয়ন নেতা ভি. ভি. গিরি এবং এন. এম. যোশী মালিকের সঙ্গে আপোষের মনোভাব নিয়ে মীমাংসা করতে গেলে, সন্তোষকুমারী রেগে বলেছিলেন, 'আমরা এখানে মনোনীত শ্রমিক সদস্যদের সঙ্গে দেখা করতে আসিনি। শ্রমিক শ্রেণীর দুর্গতি এরা বুঝবেন না।' "আমরা সরাসরি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনায় বসলাম।

কিছু কিছু দাবী বিশেষ করে ধর্মঘটের নেতাদের কোন শাস্তি না দিয়ে কাজে যোগ দিতে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে কর্তৃপক্ষ মীমাংসা করতে রাজী। আমরাও ধর্মঘট প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিলাম।"[২৯]

এই সময়ই ভারতবর্ষে আসেন বিলেতের পার্লামেন্টে ভারতীয় প্রতিনিধি সাপুরজী শাকলাতওয়ালা। তিনি কমিউনিস্ট। সন্তোষকুমারী তাঁর কাছ থেকে একটি চিঠি পান 'বহিনজী' সম্বোধনে।

তিনি ভারতে পৌঁছলে সর্বভারতীয় নেতারা তাঁকে বিপুল সম্বর্ধনা জানান, তাঁদের মধ্যে সন্তোষকুমারী উপস্থিত ছিলেন।[৩০]

বিভিন্ন কলকারখানা, কয়লাখনি অঞ্চল, জাহাজের খালাসী ও বন্দর শ্রমিকদের মধ্যে তিনি যান। সন্তোষকুমারী দেবী সর্বত্রই তাঁর সঙ্গে ছিলেন। ব্যারাকপুর, টিটাগড়, গরিফা, নৈহাটি—সব অঞ্চলের চটকল, কাগজ কল যেখানেই গেছেন দলে দলে শ্রমিকরা দেখা করতে এসেছেন। শাকলাতওয়ালার বক্তৃতা শ্রমিকদের জন্য বাংলা করে বোঝাতেন সন্তোষকুমারী দেবী।

শাকলাতওয়ালার বক্তৃতার মূল কথা ছিল সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ঐক্য, সংগঠন তৈরীর আহ্বান এবং পারস্পরিক সংহতি বিধান।

কলকাতায় বেঙ্গল ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের তরফে মৃণাল কান্তি বসু ওয়েলিংটন স্কোয়ারে শাকলাতওয়ালাকে সম্বর্ধনা জানাবার জন্য এক বিশাল সভার আয়োজন করেন। মৃণালকান্তি তাঁকে স্বাগত জানিয়ে বলেন—'কমিউনিজম সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছুই জানি না। লোকে বলে যে কমিউনিস্ট মতবাদ রাষ্ট্রদ্রোহাত্মক মনোভাব'। উত্তরে শাকলাতওয়ালা বলেন—"আমি বলি কমিউনিজমই হচ্ছে আগামী দিনের শ্রেষ্ঠ সভ্যতা। আর তাকে রাষ্ট্রদ্রোহী হতেই হবে কারণ তাকে ধ্বংস করতে হবে বর্তমানের জঘন্য অত্যাচারী নৃশংস সমাজকে।"[৩১]

শাকলাতওয়ালাকে সম্বর্ধনা জানানোর প্রশ্নে কলকাতা কর্পোরেশনে তীব্র মত পার্থক্য হয়। ইউরোপীয় সদস্যরা এবং তৎকালীন মেয়র জে. এম. সেনগুপ্ত, তিনি কমিউনিস্ট, এই কারণে আপত্তি করেছিলেন।

সন্তোষকুমারী তখন বলেন, "তিনি কমিউনিস্ট হতে পারেন, আমরা তো কমিউনিস্ট নই। আমি শুধু এইটুকু বুঝি যে লোকে তার কথা শুনতে চায়। তিনি একজন ভারতীয় যিনি ইংলন্ডে কমিউনিস্ট মতবাদ চর্চা করেছেন এবং ভারতের শ্রমিকদের পক্ষে কাজ করেন"।[৩২]

১৯২৯-র পর শ্রমিক আন্দোলনে আর সন্তোষকুমারী দেবীর উল্লেখ পেলাম না। জিজ্ঞেস করেও কোন সদুত্তর পাইনি।

আশ্চর্য লাগে এখনও কথা বলতে বলতে যখন তিনি চলে যান ১৯২১-২২ কি ১৯২৬-২৭-এর ঘটনায় তখন ওর মুখের দিকে তাকালে মনে হয় উনি আর ১৯৮৩-৮৪ তে নেই, শরীর ও মনে সম্পূর্ণ ফিরে গেছেন সেই যুগে। চোখে সেই প্রতিজ্ঞা, ঠোটে দৃঢ়তা, কথা বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়ান, একই সঙ্গে হিন্দী, উর্দু, বাংলা, ইংরেজী সব ভাষাতেই কথা বলেন। মনে হয় ওর সামনে রয়েছে অগণিত চটকল শ্রমিক, আর তাদের সামনে বক্তৃতা করছেন সন্তোষকুমারী তাদের 'মাইরাম'—শ্রমিকদের দেওয়া ভালবাসার সেই নাম।[৩৩]

সারা বিশ্বে সবচেয়ে বেশী পাট উৎপন্ন হত বাংলায়। হুগলী নদীর দুই পাড়ে ৮০ মাইল জুড়ে ছিল ৭৯টি চটকল। মিল মালিকরা এই চট এবং চটের জিনিষের ব্যবসা করে প্রচুর মুনাফা করত। অল্প মজুরীতে শ্রমিক নিয়োগ করে লাভ আরও বেশী হত। এর কোন ভাগ শ্রমিকরা পেত না, আমাদের দেশেও লভ্যাংশ খুব একটা থাকত না।

১৯২৫ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে লেবার পার্টির দুই সদস্য টমাস জনস্টন এবং জন এফ. সাইম ভারতে আসেন চটকলের অবস্থার সমীক্ষা করতে।

শ্রমিকদের বেতন সব মিলে এক রকম ছিল না, তবে সব মিলেই বেতন ছিল খুব কম, অথচ দিনে তাদের ১৩$\frac{১}{২}$ ঘন্টা খাটতে হত। মেয়েদের মজুরী ছিল অনেক কম। বহু মেয়েই যৌন নিগ্রহের শিকার হত। শিশুদের বিশেষ কোন বেতনই ছিল না। তার উপর ছিল সর্দারের জুলুম। ওরা আশ্চর্য হয়ে যান।

শ্রমিকদের বাসস্থান দেখে এরা মন্তব্য করেন - "Two thirds of the workers are housed in vile, filthy, disease — ridden hovels called Bustees. The doorway is so low that one has to go down almost on hands and knees to enter. The Bustees have neither light nor water supply, not even window...... one old man informed us that half the babies born in the Bustees died. In an annual report for 1923 declares that half the children die before they reach 10 years of age."

....."In the prosperous jute mill areas of Bengal with its fabulous dividends and fortunes, the children of the workers are unable to read or write."[৩৪]

এদের সমীক্ষাতে একটি সতর্ক বাণীও আছে, যা সর্বকালের শ্রমিক আন্দোলন এবং ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন সম্পর্কে প্রযোজ্য।

"The Union must be a trade Union for the purpose of dealing with workers grievances. Any attempt to use it as a personal aggrandisement or profitable field of operations for some climber or as a political stunt, will ruin the union and throw the workers back further into despair. The All India Trade Union Congress know the danger....."[৩৫]

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ক্ষিতীশ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ১৯৪১-এ পি.সি. মহলানবীশের অনুরোধে একটি সমীক্ষা করেন চটকল শ্রমিকদের উপর। ১৯৪৫ এ চটকল মজদুর ইউনিয়নেব অনুরোধে হাওড়ার জগদ্দল এলাকায় আর একটি সমীক্ষা করেন, সঙ্গে ছিলেন এইচ. কে. চতুর্বেদী। প্রথম সমীক্ষায় যে ৪৫০টি পরিবারের (৬৫০টি পরিবার ছিল) উপর কাজ করেছিলেন, সেইগুলির উপরই আবার অনুসন্ধান শুরু করেন।[৩৬]

১৯৪৮-৪৯-এ তিনি তৃতীয় সমীক্ষার দায়িত্ব নেন। তিনটি সমীক্ষাই হাওড়ার জগদ্দল এলাকার চটকলগুলিকে ভিত্তি করে। এই সমীক্ষার একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য যে ৮৫১টি পরিবারের সমীক্ষা ১৯৪৯ পর্যন্ত করা হয়েছিল।

শ্রমিকরা কোন কোন জায়গা থেকে এসেছে, তাদের পরিবারের লোকসংখ্যা, জাতি, ধর্ম, অর্থনৈতিক অবস্থা সব কিছুই দেখা হয়েছে।

এখানে বাঙালী শ্রমিকের হার ৭৯.৫, বিহারের ১২.৮ এবং উত্তর প্রদেশের ২.৪। কিন্তু বাঙালী শ্রমিকের হার ক্রমশ কমতে থাকে।

অধিকাংশ শ্রমিকই চটকল এলাকায় একা থাকতো। স্ত্রী ও সন্তানরা দেশের বাড়িতে থাকত। স্ত্রী ও সন্তান নিয়ে এমনকি মা বাবাকে নিয়েও কোন কোন শ্রমিক থাকত।

শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধি হলেও, জিনিষপত্রের দাম তার চেয়েও বেশী সুতরাং নিতান্ত প্রয়োজনীয় জিনিষটুকুই এরা কিনতে পারত।[৩৭]

অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় বহু বস্তিতে ঘুরে দেখে মন্তব্য করেছেন ১৫ বছর আগে জনস্টন ও সাইম যে তথ্য দিয়েছেন তার কোন পরিবর্তন হয়নি—অর্থাৎ শ্রমিকদের অবস্থার কোন উন্নতি হয়নি। ছোট ঘরে ৭-৮ জন করে লোকে ঘুমোয়, জল নেই, আলো নেই, প্রয়োজনীয় শৌচাগারও নেই।

"One thing will be clear from the different estimates. Even the most conservative estimate of lower limit of family income needed for proper living is not reached by those who are on the average the best paid semi skilled and skilled workers—the Bengal Hindus. The rest are worse off."[৩৮]

১৯৭৯ সালে হাওড়ার জগদ্দল চটকলে একটি সমীক্ষা করেন অধ্যাপক এবং ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের নেতা শিশির মিত্র।[৩৯]

বিভিন্ন পরিবার ভিত্তিক সমীক্ষায় তাদের বেতন, বাসস্থান, আয়, কাজের অবস্থা, পরিবারগুলোর অবস্থান, শিক্ষা সব প্রশ্নই উঠে এসেছে। মহিলা শ্রমিকদের কথাও আলোচিত হয়েছে। শ্রমিকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান বোঝার চেষ্টা করেছেন অধ্যাপক মিত্র।

"A sharply declining trend in the employment of women in the industry as a whole as well as in this particular mill ......

In the unions, the women cadres are far outnumbered by the male cadres and it is the latter who decide upon the modalities of union functioning where the conveniences of the women members are not always taken care of."[৪০]

সমীক্ষাটির Foreword-এ অধ্যাপক বৌধায়ণ চট্টোপাধ্যায় বলছেন (সমীক্ষার ভিত্তিতে) ঃ

Neary 70 per cent of the female worker do not think that women should accept factory employment ..... more than 90 percent of the women workers were against sending their daughters to any factory, including a Jute Mill."[৪১]

বাসস্থান, শৌচাগার, আলোবাতাস, প্রয়োজন মত খাবার, শিক্ষা, সবকিছুরই অভাব। অথচ এখনও - 'Its a miracle that Jute manufactures continue to be our main foreign exchange earner'.

১৯৮৮ সালে বরানগরে আলমবাজার চটকলের শ্রমিক এবং শ্রমিক নেত্রী দুখমত দিদির সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম—চটকলের অবস্থা বিশেষ করে মেয়েদের অবস্থা জানতে। যে বস্তিতে তিনি থাকেন, সেখানে অনেকগুলো পরিবার — একসময়ে ওরা

চটকলের শ্রমিক ছিলেন আজ বেকার। দুখমত দিদির ঘরে ঢুকতে হয় মাথা নীচু করে, অন্ধকার ঘর, জানালা নেই, হ্যারিকেনের আলোতে কিছু দেখা যায় না। বাইরে এসে একটা স্কুল ঘরে ওর সঙ্গে কথা বললাম।

১৯২৫ থেকে ১৯৭৯ — তারপর আজও চটকল শ্রমিকের অবস্থার বড় রকমের কোন হেরফের হয়নি, বিশেষ করে মেয়েদের ক্ষেত্রে। শিল্পের প্রসারের ফলে ভিনদেশ থেকে শ্রমিক আসতে লাগল বাংলায়। এদের বেশী সংখ্যক মুসলমান, আদিবাসী এবং নীচু তলার মানুষ — দারিদ্রের জন্যই প্রধানত এখানে এলো। বহু মেয়েও এই সময় আসে। এদের নিয়ে আসত সর্দাররা।

মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় 'অসমাপ্ত চটাব্দতে' লিখেছেন, 'সামুরার বউ গোদাবরী বিলাসপুরে তার বাড়ি, জগদ্দলে যখন প্রথম এসেছিল তখন তার বয়স আঠারো কি উনিশ। নিখুঁত কালো চেহারা—নিটোল স্বাস্থ্য। তার মত আরও পনেরো ষোলটি মেয়ে এসেছিল তার সঙ্গে বিলাসপুর অঞ্চল থেকে। তাদের নিয়ে এসেছিল একজন কুলী সর্দার।'

সর্দারের হাতে নিশ্চিন্ত মনে ছেড়ে দিত তাদের মা বাবারা। কারণ প্রত্যেকে পাবে ৫০টি করে টাকা এবং একটি শাড়ি। যতদিন না কাজ পাবে এই দিয়ে চলবে। কাজ পেলে তারপর সুদে আসলে সর্দারকে শোধ দেবে।

এই ভাবে মেয়েরা অকূলে ভেসে পড়ে। তারা ক্রমশই হয়ে যায় সর্দারের হাতে বাঁধা।

মোহনলাল এক সর্দারের কথা লিখেছেন, নাম তার কালু সর্দার। গ্রামে সে দেবতার মতো — 'যেন সে পরের উপকারের জন্যই জন্মেছে। কালু সর্দার যখন দেশ থেকে ফিরত সঙ্গে থাকত এক দঙ্গল মেয়ে। 'চটকলে ফিরে এসেই কালুসর্দার ধরল অন্য এক মূর্তি। মেয়েগুলোকে রাখল সারি সারি কটা ঘরে বন্দিনীর মতো। সে সারাদিন মদ খেয়ে টং হয়ে ঘুরে বেড়ায়, রাতে যখন যাকে খুশী ডেকে পাঠায় তার ঘরে।'[৪২]

কেউ আপত্তি বা প্রতিবাদ করতো না, কারণ তাহলে কাজ পাবে না, আর এখানে থেকে বাড়িও ফিরতে পারবে না। সামাজিক, নৈতিক এবং আর্থিক ভাবে নিষ্পেষিত হত এই সব শ্রমিকরা, কুলি কামিনরা। কাজ পাইয়ে দেবার জন্য সর্দারদের নিয়মিত ভাবে ঘুস দিতে হত।

শ্রমিকরা স্ত্রী ছেলে মেয়ে নিয়েও যেমন আসতো তেমনি আবার অনেকে একলাই আসতো। তারা অনেকেই কোন না কোন মেয়েকে নিয়ে থাকত। মেয়েরাও আপত্তি করতো না কারণ এর ফলে সে নিরাপদ বোধ করত। অধিকাংশ মেয়ে পুরুষ এখানে

যৌন ব্যাধিতে ভোগে। এদের এই জীবন যাত্রাকে আমরা ঘৃণা করি, কিন্তু এদের জন্য কোন সমবেদনা আমাদের মনে নেই।

কলকাতার শিল্পাঞ্চলে ১৯২৯-এর চটকল সাধারণ ধর্মঘট ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা—

"Its a landmark in the historical processes of formation of working class struggle and class consciousness in Colonial Bengal and India."[৪৩]

ভি.ভি. কার্নিক 'স্ট্রাইকস ইন ইন্ডিয়া' বইতে লিখছেন ১৯২১ সালে শুধু চটকলেই ধর্মঘট হয়েছে ৩৯ বার, ১৯২২-এ ৪০ বার — তবে এরকম সর্বাত্মক সাধারণ ধর্মঘট বাংলার ইতিহাসে এই প্রথম।[৪৪]

রয়াল কমিশন অব লেবারের কাছে বাংলা সরকার এক বিবৃতিতে বলছে এই চটকল ধর্মঘটগুলি নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। একটা হচ্ছে এর বিশালতা। বাংলাদেশের ইতিহাসে এর আগে কখনও সাধারণ ধর্মঘট হয়নি। ১ জুলাই থেকে ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে মোট ২,৯২,০০০ জন শ্রমিক ধর্মঘট করে।

বাংলার চটকল মজদুর ইউনিয়নের সভাপতি ছিলেন ডঃ প্রভাবতী দাশগুপ্ত। এই সময়ে শ্রমিক আন্দোলনে প্রধানত কমিউনিস্ট সদস্যদেরই প্রাধান্য ছিল। কিন্তু সন্তোষকুমারী দেবী বা প্রভাবতী দাশগুপ্ত নিজেরা কমিউনিস্ট রাজনীতির সমর্থক না হয়েও এদের সঙ্গে কাজ করেছেন। সম্ভবত প্রত্যেকেরই দৃষ্টি ছিল শ্রমিক আন্দোলনের দিকে।

গোড়ার দিকের এমনকি স্বাধীনতার পরেও শ্রমিক আন্দোলনের নেতৃত্বে পুরুষ ও মহিলা যারাই এসেছিলেন শ্রমিকদের সঙ্গে তাদের একটা আত্মিক যোগ ছিল।

আন্দোলনের নেতৃত্বে যারা ছিলেন তাঁরা কেউই শ্রমিক নন। তাঁরা প্রত্যেকেই মধ্যবিত্ত বা উচ্চমধ্যবিত্ত পরিবারের এবং উচ্চশিক্ষিত। কিন্তু এরা প্রত্যেকেই বিশেষ করে মহিলা নেতৃত্ব শ্রমিক বস্তিতে যেতেন, ধর্মঘটের সময় ধর্মঘটী পরিবারগুলোর খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করা, ধর্মঘটের খরচ জোগানো, ইস্তাহার ছাপানো, বিলি করা, সভা সমিতি করা—সবই এরা করেছেন। প্রভাবতী এবং সাকিনা বেগম জমাদার, মেথরদের আন্দোলনের সময় রোজই ওদের বস্তিতে যেতেন, ওদের খোঁজ নিতেন—এরা সবাই হয়ে গেছলেন শ্রমিকদের মাইরাম, মাতাজী বা বহিনজী এবং দিদি।

কংগ্রেস নেতৃত্ব তো শ্রমিক আন্দোলনকে সমর্থন করেন নি। দেশের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্বনামধন্য অনেকেই পত্র-পত্রিকায় এদের সম্বন্ধে বিদ্রূপাত্মক লেখা লিখেছেন, ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশ করেছেন, এমনকি চরিত্র সম্বন্ধে কুৎসাও রটনা করেছেন। মহিলা নেত্রীরা এর ফলে আন্দোলন থেকেও সরে যাননি, অনেক সময় 'ভদ্রলোকদের' মুখের মতো জবাবও দিয়েছেন।

শ্রমিক নেতারাও শ্রমিক বিক্ষোভের সময় বা সংগঠন গড়ার সময় দিনের পর দিন শ্রমিকদের বস্তিতেই রাত কাটিয়েছেন। নেতাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মণি সিংহ, মুজফফ্‌র আহমেদ, গোপেন চক্রবর্তী, ধরনী গোস্বামী, বঙ্কিম মুখার্জী, আবদুল মোমিন, আবদুর রেজ্জাক খাঁন, কালি সেন প্রমুখ।

শ্রমিক আন্দোলনের একজন অন্যতম নেতা গোপেন চক্রবর্তী এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, "আমি যখন চটকলে শ্রমিক ইউনিয়ন করতে যাই তখন শ্রমিকরা আমার সঙ্গে আলাপ আলোচনা করত, ইউনিয়ন অফিসে সভায় অংশগ্রহণ করত, কিন্তু একটা দূরত্ব আমার সঙ্গে রেখে চলত। আমি ওদের ইউনিয়ন বাবু। এর পর আমি ঐ চটকলেই কাজ নিই। তারপর আমি ওদের সহকর্মী হয়ে গেলাম। যে দূরত্ব আমার সঙ্গে ছিল তা মুছে গিয়ে আমি হলাম ওদের নিজেদের লোক। এই একাত্মতা তখনকার নেতা বা নেত্রীরা শ্রমিকদের সঙ্গে গড়ে তুলতে পেরেছিলেন।"[৪৬]

সেদিন শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনজন ব্রিটিশ কমিউনিস্ট শ্রমিক সংগঠক ও সাংবাদিক—ফিলিপ স্প্র্যাট, বেন ব্রাডলি ও লেস্টার হাচিনসন। ১৯২৯-এর ২০ মার্চ ৩১ জন কমিউনিস্ট ও জাতীয়তাবাদী শ্রমিক আন্দোলনের নেতাকে গ্রেপ্তার করে শুরু করে মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা। এই তিন জন ব্রিটিশ কমিউনিস্টকেও গ্রেপ্তার করা হয়। উদ্দেশ্য ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন ভেঙে দেওয়া।

১৯২৯-এর শুরুতে ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর উদ্দেশ্য ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি একটি ইস্তাহার প্রকাশ করে। তাতে বলা হয় "শ্রমিকশ্রেণী এখন যে যুগে প্রবেশ করেছে তা দুঃখকষ্টকর, প্রচন্ড বিপদের ও বিপুল সম্ভাবনার যুগ। শ্রেণী হিসাবে যদি ঐক্যবদ্ধ হয়ে দাঁড়াতে পারে, তাহলেই একমাত্র তার বহু বছরের দাসত্ব ও দুর্গতিকে এড়াতে পারবে। গত কয়েক মাস ধরে দমন পীড়নের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী যে বিরাট রাজনৈতিক ধর্মঘট ও মিছিল হয়েছে, তা প্রমাণ করেছে যে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামও এক সন্ধিক্ষণে এসে পৌঁছেছে।"[৪৭]

১৯২৯-এর জুলাই মাসে বাংলাদেশে প্রায় তিন লক্ষ চটকল শ্রমিকের ঐতিহাসিক ধর্মঘট শুরু হয় স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেঙ্গল জুট ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের নেতৃত্বে।

আনন্দবাজার পত্রিকা ধর্মঘটের বর্ণনা দিতে গিয়ে লেখে, ধর্মঘট ছড়িয়ে পড়ছে, কাঁকিনাড়া থেকে কাঁদাপাড়া পর্যন্ত প্রায় ২ লক্ষ শ্রমিক ধর্মঘট করেছে।[৪৮]

সরকারি মুখপাত্র দি স্টেটসম্যান পত্রিকা প্রথম পাতায় প্রকাশ করে '120,000 Jute workers on strike; situation serious'[৪৯] মিল কর্তৃপক্ষের উস্কানিতে গৌরীপুর জুটমিলে কাবুলিওয়ালা এবং শ্রমিকদেব মধ্যে মারামারিতে ৩জন শ্রমিক এবং ২জন কাবুলিওয়ালা মারা যায় এবং প্রায় ১০০ জন আহত হয়। ঘটনাটি ঘটে ৬ আগস্ট। তবে ধর্মঘট অব্যাহত রইল। অমৃতবাজার পত্রিকা ১৪ আগস্ট লেখে 'This was a strike of a memorable dimension'।

১৪ আগস্ট মিল কর্তৃপক্ষ ইন্ডিয়ান জুট মিল অ্যাসোসিয়েশন, রায়চৌধুরী লতাফৎ হোসেন এবং বেঙ্গল জুট ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট প্রভাবতী দাশগুপ্তর সঙ্গে ধর্মঘট মীমাংসার ব্যাপারে আলোচনা শুরু করে। ১৬ আগস্ট মালিক পক্ষের সঙ্গে একটা সমঝোতা হল। মালিক পক্ষ অধিকাংশ দাবীই মেনে নিল, এমনকি মাতৃত্বকালীন সুযোগ সুবিধা দেবার প্রতিশ্রুতি দিল। প্রভাবতী দাশগুপ্তর মতো নেত্রী কি করে মালিক পক্ষের ফাঁদে পা দিলেন তা ভাবতে আশ্চর্য লাগে।

তিনি বেঙ্গল জুট ওয়ার্কার্সি ইউনিয়নের সভাপতি। কিন্তু ইউনিয়নকে মালিকপক্ষ খবর দেবে না এটা অন্যায়, অস্বাভাবিক নয়। প্রভাবতী দাশগুপ্ত ইউনিয়নের সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা করলেন না, তাদের জানালেও না। তবে কি তার সন্তোষকুমারী দেবীর মতো সংগঠন কাজ করার অভিজ্ঞতা ছিল না? ধর্মঘটী শ্রমিকের জন্য যিনি এত পরিশ্রম করেছেন, নানা ভাবে তাদের পরিবারকে সাহায্য করেছেন, ধর্মঘট চলাকালীন এবং আগেও নিজের খরচে ইস্তাহার ছাপিয়ে বিলি করেছেন, যেখানে নেতৃত্ব একটা কথাই জোরের সঙ্গে বলতেন, 'তোমরা সংগঠিত হও, ঐক্যবদ্ধ থাকো। এটাই তোমাদের শক্তি, জয় তোমাদের অনিবার্য।'

একটা সফল ধর্মঘট, জেতা লড়াই প্রভাবতী দাশগুপ্তর রাজনৈতিক দূরদর্শীতার অভাবেই হেরে গেল। নেতৃত্ব ক্ষুব্ধ। শ্রমিকরা বিভ্রান্ত। ইউনিয়নের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে প্রভাবতী দাশগুপ্তকে সভাপতি পদ থেকে অপসারিত করলেন।

প্রভাবতী দাশগুপ্ত ঠিক কাজ করেননি, হয়তো অন্যায়ই করেছেন, কিন্তু নেতৃত্বের সংকীর্ণতাবাদের ফলে একজন শ্রমিক দরদী, প্রাজ্ঞ নেত্রী শ্রমিক আন্দোলন থেকে দূরে সরে গেলেন। বাখের আলি মির্জা এবং প্রভাবতী দাশগুপ্তর নেতৃত্বে একটা স্বতন্ত্র ইউনিয়ন গড়ে উঠল।[৫০]

আশ্চর্য কথা যে ইউনিয়ন প্রধানত কমিউনিস্ট কর্মী এবং প্রভাবতী দাশগুপ্ত দ্বারা পরিচালিত, এবং যেখানে শতকরা ১৫ ভাগ মেয়ে কাজ করে, সেখানে নেতৃত্ব ভাবেইনি যে মেয়েদের কোন আলাদা দাবী থাকতে পারে, এমনকি মাতৃত্বকালীন সুযোগ সুবিধার দাবী তাদের দাবী-দাওয়ার মধ্যে ছিল না।

তবে এই সাধারণ ধর্মঘটের একটি বড় বৈশিষ্ট হল যে ধর্মঘটী শ্রমিকদের অনেকেই লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে রূপান্তরিত হলেন সংগঠকে, পরে যোগ দিলেন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে — যেমন সুরথ পাল্লাল, বামাচরণ সানি, আবুল হোসেন প্রমুখ।[৫১]

দিল্লীর জওহরলাল নেহেরু মেমোরিয়াল লাইব্রেরীতে ডঃ প্রভাবতী দাশগুপ্তর একটি সাক্ষাৎকার রেকর্ড করা আছে। "It appears from Prabhabati Das Gupta's own account that she was not happy with the militant initiative of the workers and particularly the growing presence and influence of the leftist and communist oriented labour leaders".[৫২]

প্রভাবতী দাশগুপ্ত শ্রমিক আন্দোলন শুরু করেছিলেন ঝাড়ুদার ও মেথরদের ধর্মঘটকে কেন্দ্র করেই।

১৯২৮ সালে শ্রমিক আন্দোলনের একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হচ্ছে কলকাতা কর্পোরেশনের ঝাড়ুদার ও মেথরদের বীরত্বপূর্ণ ধর্মঘট। এই ধর্মঘটের নেতৃত্বে ছিলেন কমিউনিস্টরা এবং একজন নির্দলীয় মহিলা নেত্রী ডঃ প্রভাবতী দাশগুপ্ত, তিনি সবে বিদেশ থেকে পড়াশুনা শেষ করে দেশে ফিরেছেন। বিদেশে তার পরিচয় হয় মানবেন্দ্র নাথ রায়ের সঙ্গে। নিজের বাড়িটা ছিল স্বদেশী বাড়ি।

১৯২৮-এ কলকাতায় একটি 'দি স্ক্যাভেঞ্জারস ইউনিয়ন অব বেঙ্গল' গড়ে ওঠে, তার সভানেত্রী ছিলেন প্রভাবতী দাশগুপ্ত, সহ-সভাপতি মুজফ্ফর আহমদ ও সম্পাদক ধরণী গোস্বামী।

মুজফ্ফর আহমদ লিখছেন, "১৯২৮-এর ৪ মার্চ সকালে আমরা ক'জন ইউরোপীয়ান অ্যাসাইলাম লেনে আমাদের অফিসে বসে আছি, এমন সময় ২-৩ জন ঝাড়ুদার এসে বলল আমরা ধর্মঘট করে দিয়েছি ..... আমরা সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে ছুটলাম সবাইকে খবর দিতে হবে। ... কলকাতা কর্পোরেশন এলাকায় পরিপূর্ণ ধর্মঘট হয়েছিল।"[৫৩]

মণি সিংহ লিখেছেন, "১৯২৮ সালে ধাঙড় ধর্মঘট হয়। ধাঙড়ের সংখ্যা ছিল ১০ হাজার, ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট ছিলেন প্রভাবতী দাশগুপ্ত, এই হরতালে কমিউনিস্ট

নেতা মুজফ্‌ফর আহমদ, ফিলিপ স্প্র্যাট, ধরণী গোস্বামী, আবদুল হাসিম, মণি সিংহ সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন।"[৫৪]

ধাঙড়দের ধর্মঘট স্বতঃস্ফূর্ত এবং সর্বাত্মক। ধাঙড়রা নীচু জাতের মানুষ, কোন শিক্ষা-দীক্ষা তাদের নেই, সমাজের সবচেয়ে বঞ্চিত নিপীড়িত। এহেন ধাঙড়রা যে ধর্মঘট করতে পারে, দাবী করতে পারে, এটা দেশের শিক্ষিত মধ্যবিত্তরা ভাবতেও পারেনি।

কিন্তু এদের মধ্যে ছিল লৌহ দৃঢ় ঐক্য, কোন প্রলোভনে পা দেয়নি। নেতৃত্বের নির্দেশ পুরোপুরি মেনে চলার শৃঙ্খলাবোধও তারা দেখিয়েছে। বাড়ি বাড়ি যে সব জমাদার কাজ করত তারাও ধর্মঘট করল। ৬ দিন চলল এই ধর্মঘট, ভদ্রলোকেরা ক্ষিপ্ত, রাস্তাঘাটে নোংরার স্তূপ, জনজীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠল।

আন্দোলনের মধ্য থেকেও জঙ্গী নেতার সৃষ্টি হয়েছিল। প্রভাবতী ধাঙর বস্তিতে বস্তিতে ঘুরেছেন, তাদের অভাব অভিযোগ শুনেছেন, আন্দোলনের গুরুত্ব তাদের বুঝিয়েছেন, প্রয়োজনে অর্থসাহায্য করেছেন — এই ভাবে তিনি ধাঙড়দের অবিসংবাদী নেত্রীতে পরিণত হন, তাদের সবার তিনি 'মাতাজী'।

শেষ পর্যন্ত মেয়র যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত বহু আলাপ আলোচনার পর ১ টাকা মাইনে বাড়াতে রাজী হন এবং ধর্মঘটী ধাঙড়দের চাকরী বজায় থাকবে এই প্রতিশ্রুতি দিলেন। কিন্তু কাউন্সিল সদস্যরা মজুরী বৃদ্ধিতে রাজী হলেন না।

আমাদের দেশের শিক্ষিত ভদ্রলোকেরাও নেতৃত্বকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কাগজ 'প্রবাসী' তে সংবাদ বেরোল। 'শনিবারের চিঠি'তে প্রভাবতীর কার্টুন (ব্যঙ্গচিত্র) ছাপা হল।

মজুরী বাড়াবার কথা দিয়েও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করল না, ক্ষুব্ধ শ্রমিকরা সাড়ে তিনমাস পরে আবার ধর্মঘট করে ২৪ জুন।

প্রভাবতী দাশগুপ্ত এবং মুজফ্‌ফর আহমদকে গ্রেপ্তার করল ২৫ জুন। নেতৃত্বের যারা বাইরে ছিলেন তারা বস্তিতে বস্তিতে ঘুরে প্রচার করেছেন। ধর্মঘট হল সর্বাত্মক। ৫ জুলাই মেয়র এবং কর্পোরেশনের প্রধান কর্মকর্তা ইউনিয়নের সঙ্গে বসে আপোস মীমাংসা হল সেই ১টাকা মাইনে বৃদ্ধি এবং ধর্মঘটী শ্রমিকদের শাস্তি দেওয়া হবে না। যথা নিয়মে এবারকার দাবীও মানা হল না, তবে ঝাড়ূদার ও মেথররা ধর্মঘট প্রত্যাহৃত হবার ২৪ ঘন্টার মধ্যেই কলকাতার জমে থাকা সমস্ত আবর্জনা সাফ করে দিলো।

১৯৪০-র মার্চ মাসে কর্পোরেশনে নতুন নেতৃত্ব আসার আগে বিদায়ীরা শ্রমিক ছাড়া সবার মাইনে বাড়িয়ে দিলেন। স্বাভাবিক ভাবেই শ্রমিকরা এতে অসন্তুষ্ট। কর্পোরেশনের এই নতুন কাউন্সিলে নির্বাচিত হয়ে এলেন বেগম সাকিনা ফারুক সুলতানা মোয়াজ্জেদা। ১৯৪০-এর কর্পোরেশনের ধাঙড় ধর্মঘটের তিনি ছিলেন এক অন্যতম নেত্রী।[৫৫]

সাকিনা বেগমের বাবা পারস্যে সশস্ত্র বিপ্লবী দলের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। তিনি পারস্য থেকে বিতাড়িত হয়ে কলকাতা আসেন। সাকিনা বেগম উচ্চশিক্ষিতা এবং কলকাতা হাইকোর্টে প্রথম প্র্যাকটিসরতা মহিলা অ্যাডভোকেট।[৫৬]

সাকিনা বেগম ও কমিউনিস্ট কর্মীরা কর্পোরেশনের শ্রমিকদের অভাব অভিযোগ, বেতন বৃদ্ধি, মহার্ঘ ভাতার দাবী—এসব শুনে তাদের সংগঠিত করে আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত করেন।

১৯৪০, ২৬ মার্চ শুরু হয় ধাঙড় ধর্মঘট, ধর্মঘট চলে ২ এপ্রিলে পর্যন্ত। প্রচুর ধরপাকড় শুরু হয়, ধর্মঘট ভাঙার চেষ্টা চলতে থাকে। কিন্তু শ্রমিকরা দমন পীড়ন উপেক্ষা করে ধর্মঘট চালাতে থাকে।

কর্পোরেশনে এ ব্যাপারে তুমুল আলোচনা শুরু হয়। সাকিনা বেগম বলেন ঃ 'কর্পোরেশনের শ্রমিকরা বার বার তাদের অভাব-অভিযোগের কথা বলেছে, বেতন বৃদ্ধি ও কাজের অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার দাবী করেছে। বার বার প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও কর্পোরেশন এখন পর্যন্ত কোন প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেনি। শ্রমিকদের জীবন যাত্রা ক্রমে দুর্বিষহ হয়ে উঠছে। আজ (২৬ মার্চ) থেকে শ্রমিকরা ধর্মঘট শুরু করেছে। আমাদের অবিলম্বেই কিছু করা উচিত, বার বার এড়িয়ে গেলে চলবে না। কাউন্সিলার হিসেবে আমি মনে করি কর্পোরেশন শ্রমিকদের স্বার্থ আমাদের দেখা উচিত।'[৫৭]

৩০ মার্চের সভায় প্রশাসন ঠিক করে পুলিসের সাহায্য নিয়ে ধর্মঘট ভাঙার। সাকিনা বেগম উত্তরে বলেন — 'আমরা কোন সুস্থ সরকারের অধীনে বাস করছি না আমাদের দেশে নাৎসী রাজত্ব চলছে?'[৫৮]

শেষ পর্যন্ত ঠিক হয় শ্রমিক প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত হবে। আলোচনা হয় সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে, কিন্তু তিনি দাবী মানতে রাজী না হলে স্বামী সহজানন্দ ও আরও অনেকের দাবিতে শেষ পর্যন্ত ঠিক হয় ৩০ টাকা পর্যন্ত বেতন ভুক্তদের ১টাকা করে মহার্ঘ ভাতা দেওয়া হবে। ২ এপ্রিল চুক্তি পত্র স্বাক্ষরিত হল। ৩ এপ্রিল ধর্মঘট প্রত্যাহার করা হল।[৫৯]

ধর্মঘটের সাফল্য শ্রমিকদের উৎসাহ ও সাহসের সঞ্চার করে। কর্পোরেশনে শ্রমিক ইউনিয়ন তৈরী হয়। সভ্য সংখ্যা ১০ হাজারে পৌঁছয়। সভাপতি হন সাকিনা বেগম, সহ-সভাপতি শিবনাথ ব্যানার্জী, সম্পাদক বঙ্কিম মুখার্জী, এছাড়াও সমিতির দায়িত্বপূর্ণ পদে ছিলেন হৃষি ব্যানার্জী, দেবেন্দ্র বিজয় সেনগুপ্ত, বীরেন রায়, মহম্মদ আলি, মানিক রাম ও আরও অনেকে। বীরেন রায় বলছেন, নেতৃত্বের মধ্যে এত জনপ্রিয় তখন সাকিনা বেগমের মতো আর কেউ ছিলেন কিনা সন্দেহ। তিনিও শ্রমিকদের 'মাতাজী'তে পরিণত হলেন। তাঁর বাড়িতে শ্রমিকরা এসেছে এমনকি রাতেও থেকেছে। শ্রমিকদের বস্তিতে যখন যেতেন সঙ্গে দেড়শ দুশোজন করে জমাদার থাকত।[৬০]

আশ্চর্য। কর্পোরেশন এবারেও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করল না। ক্ষুব্ধ উত্তেজিত শ্রমিকরা আবার ধর্মঘট করে বসল ২৬ আগস্ট। তখন যুদ্ধ চলছে, ট্রেড ইউনিয়নের অনেক নেতাই তখন জেলে না হয় আত্মগোপন করে আছেন। একা বেগম সাকিনার পক্ষে এই আন্দোলন চালানো সম্ভব ছিল না।

পুলিশ দিয়ে ধর্মঘট ভাঙার চেষ্টা করল। নোটিশ দেওয়া হল ২৮-এর মধ্যে কাজে যোগ দিতে। শ্রমিকরা কাজে যোগ দিল না। ধর্মঘট ভেঙে গেল। পুলিসি অত্যাচার, লাঠি, গুলি, গ্রেপ্তার সব রকম নির্যাতন চলল।[৬১]

১২০০ গাড়োয়ানের চাকরী যায়, যাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছিল তারা মুক্তি পেল, চাকরী ফেরৎ পেল না। ইউনিয়নের সভ্য সংখ্যা দ্রুত কমতে থাকে।

সাকিনা বেগমকে গ্রেপ্তার করে, তারপর মুক্তি দিয়ে, কলকাতা থেকে বহিষ্কারের নির্দেশ দেয়, তাঁর গাড়ি ভেঙে দেয়। এর পর সাকিনা বেগম ইতিহাস থেকে হারিয়ে যান। তিনি কার্শিয়াং যান, তার পর আর কোন খবর নেই।

"যুদ্ধের ভারতবর্ষ, দুর্ভিক্ষের ভারতবর্ষ, নৃশংস মৃত্যু ও সহিংস সংগ্রামের ভারতবর্ষ। এ সংগ্রামের সঙ্গেই আকৈশোর জড়িয়ে ছিলাম। স্বপ্ন দেখেছি বিপ্লবের নতুন ভারতবর্ষ। আজও সে ভারতবর্ষের জন্ম হয়নি, কিন্তু জানি তা হবে।"[৬২]

হিজলি বন্দী শিবিরে রচনা, "মাটিতে ফসল ফলল না, খরার উত্তাপ ছিল প্রচন্ড। শাসনের দাপট ছিল অসহ্য। কিন্তু সার্থক সংগ্রামের কল্পনা করতে ইতস্ততঃ করিনি। ভারতের মাটিতে এমন ঘটনা যে ঘটা কখনো সম্ভব ব্রিটিশ সিংহ তা ভাবতে পারেনি।"[৬৩]

'আগুনের ফুলকি' এবং 'নূতন দিনের আলো' এই দুটি গ্রন্থেরই রচয়িতা বিমল প্রতিভা দেবী।

১৭-১৮ বছর বয়সে তিনি বিপ্লবী আন্দোলনের দিকে আকৃষ্ট হন। ১৯২৮-এ তিনি 'ভারত নওজোয়ান সভা'র বাংলা শাখার সভানেত্রী নির্বাচিত হন। এই সভার নিখিল ভারতের সভাপতি ছিলেন ভগৎ সিং। বাংলার বাইরে বিপ্লবীদের সঙ্গে এই সূত্রেই তার যোগাযোগ। তিনি সুভাষচন্দ্র বসুর রাজনীতির দৃঢ় সমর্থক। বিপ্লবী চট্টগ্রাম বন্দীদের মামলা পরিচালনার জন্য তিনি জালালাবাদের শহীদদের ছবি বিক্রী করে সেই অর্থ দিয়েছিলেন। মানিকতলার ডাকাতি মামলায় জড়িত সন্দেহে ১৯৩৯-এর ২ অকটোবরে তাঁকে গ্রেপ্তার করে। সিউড়ি, হিজলী ও প্রেসিডেন্সি জেলে তিনি প্রায় ৬ বছর বন্দী ছিলেন। ১৯৩৮-এ তিনি মুক্তি পান।

১৯৩১-এর ২৫ এপ্রিল শ্রদ্ধানন্দ পার্কের সভায় বক্তৃতায় তিনি বলেন, 'লক্ষ লক্ষ দীনেশ গুপ্তর জন্ম হচ্ছে এদেশে।'[৬৪]

দীনেশ গুপ্ত এবং রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের ফাঁসির হুকুম হলে ১৩মে অ্যালবার্ট হলে বিমল প্রতিভা দেবী, জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী, মোহিনী দেবী প্রমুখরা এক সভায় বিপ্লবীদের মৃত্যুদন্ড রোধ করার স্বপক্ষে বক্তৃতা করেন। বিমল প্রতিভা বলেন fire will burn in peoples' heart[৬৫] সেই আগুনে তারা সাম্রাজ্যবাদকে পুড়িয়ে ছাই করে দেবে।

গোয়েন্দা দপ্তরে দুটি ১৯৩৬-লেখা চিঠি পাওয়া গেছে , একটি প্রফুল্ল নলিনী ব্রহ্মকে লেখা বিমল প্রতিভার চিঠি, অন্যটি বিপ্লবী যতীন দাসের ভাই কিরণ দাসের লেখা বিমল প্রতিভা দেবীকে। দুটি চিঠিতেই রুশ বিপ্লব, সাম্যবাদের প্রতি আকর্ষণ, এবং লেনিন ও ট্রটস্কির রাজনৈতিক কর্ম ও চিন্তাধারায় মানুষকে আকৃষ্ট করার কথাই বলা আছে।[৬৬] এই সময়ই জেলে বিভিন্ন বই পত্র পড়ে, নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে অনেক বিপ্লবী সমাজতন্ত্রবাদকে গ্রহণ করতে উদ্যোগী হয়েছেন। এই মতবাদে বিশ্বাসীরা মিলে একটি দল 'বলশেভিক লেনিনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়া' তৈরী করেন এবং বিমল প্রতিভা দেবী তার সভানেত্রী হন।

১৯৪৫-এর ২১ নভেম্বর কলকাতার রাস্তা মিছিলের রাস্তায় পরিণত হল। জাতীয়তাবাদী ছাত্র সংস্থা ডাক দিয়েছে ধর্মঘটের, লালকেল্লায় বন্দী আজাদ হিন্দ ফৌজের নেতাদের মুক্তির দাবীতে। নানান ছাত্র সংগঠনের পতাকায় ছাত্রমিছিল দুর্বার হয়ে উঠল। গুলি চলল। গুলিবিদ্ধ হয়ে লুটিয়ে পড়ল রামেশ্বর ও আবদুস সালাম, আহত হল অনেকে। ছাত্ররা ফিরে গেল না। রাত যত বাড়ল দলে দলে ছাত্র এসে যোগ দিল। এই প্রথম গুলির সামনে ছাত্ররা ফিরে গেল না। আর ঐ ছাত্রদের সারারাত মায়ের মতো আগলে বসে রইলেন জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী, বিমল প্রতিভা দেবী এবং বীণা দাস।[৬৭]

বিপ্লবী আন্দোলন—কংগ্রেসী আন্দোলন—জাতীয়তাবাদী আন্দোলন — শ্রমিক আন্দোলন—বহু পথ পরিক্রমা করলেন বিমল প্রতিভা দেবী।

স্বাধীনতার পর তিনি চলে গেলেন আসানসোল, কয়লা খনির শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করতে। সর্বভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের তিনিও একজন অন্যতম নেত্রী। বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠন করার সময় প্রত্যক্ষ করেছি তাদের অসহনীয় অবস্থা। খনির শ্রমিক কেন্দ্রে যখনই যেতাম, খনিতে নেমেছি। একবার তিনমাস ছিলাম একটি কেন্দ্রে। সেখানকার এক খনিতে চার মাস ধরে গ্যাস উঠছে বলে মাইনিং একসপার্ট খনি বন্ধ করে দিতে বলল। মালিক শুনল না। ...... একদিন সেই দারুন গ্যাস জ্বলে উঠল। আটশ খনি শ্রমিক এবং ম্যানেজার খনির মধ্যে মরে রইল। আত্মীয়-স্বজনের হাতে বিশ পঞ্চাশ টাকা ধরিয়ে দিল। খবরে প্রকাশ হল ৫০ জন মারা গেছে। প্রত্যক্ষদর্শীর খবর সংবাদ পত্র ছাপল না—লোক হিতার্থে আছে গবর্ণমেন্ট—সে গভর্ণমেন্ট সত্য ছাপতে দেবে না।[৬৮]

রবীন সেনের পাঁচ অধ্যায়-এ — "সপ্তাহ খানেক পর বিমল প্রতিভা দেবীর সঙ্গে রাণীগঞ্জ গেলাম। ..... রাণীগঞ্জ থেকে মাইল দেড়েক হবে বল্লভপুর, বিমল প্রতিভা সেখানে নিয়ে গেলেন। ইংরেজ কোম্পানী বামার লরী, ঠিক দামোদর নদের ধারে। বিমল প্রতিভাকে দেখে বেশ কিছু শ্রমিক জড়ো হলো। রামনাথ চামার, রাখহরি বাউরি, রামখেলাওন, রামধনী, রেতই, যশোধরা, সরফুদ্দিন, লালমোহন, জ্যোতি গোপ ও আরও অনেকে। বলদেব সিং খোদাবকস্‌কে দেখিয়ে বললেন—এরা ১৯৩৮ সালে কাগজকলের শ্রমিক ছিল। শ্রমিক ধর্মঘটের পর কোম্পানী এদের বরখাস্ত করে দেয়। ১৯৩৮ সালের শ্রমিক ধর্মঘট, সুকুমার ব্যানার্জীর হত্যা এসব বিমল প্রতিভা আমাকে আগেই বলেছেন। লম্বা ঝুঁকে পড়া একজন বুড়ি এসে বললেন—মাতাজী না? বিমল প্রতিভা বললেন — হ্যাঁ। এ বুড়ি কাগজ কলে কাজ করতো, মেয়ে শ্রমিকদের নেতৃত্বে ছিল, খুব জঙ্গী, অন্য শ্রমিকদের সঙ্গে সেও ছাঁটাই হয়েছিল—বলদেবের মা। বলদেবের মা বললো — দেখো বেটা আমার ছেলের খুনের বদলা নিতে হবে। ছেলে মানে সুকুমার ব্যানার্জী। কোম্পানী ওকে কাজে নিতে চেয়েছিল, কিন্তু ও বললো না "যারা আমার ছেলেকে খুন করেছে, না খেয়ে মরলেও তাদের নোকরী আমি কখনই করবো না।'"[৬৯] রমানাথ চামার, সরফুদ্দীন, বলদেবের মা আজও আছেন, অন্য নামে।

কিন্তু বিমল প্রতিভা, প্রভাবতী দেবী, সন্তোষকুমারী, মৈত্রেয়ী বসু — এদের আমরা তো আর খোঁজ রাখি না। বিমল প্রতিভা অর্থাভাবে কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। ডঃ মৈত্রেয়ী বসু অসম্ভব কষ্টের মধ্যে মারা গেছেন। ইতিহাস কি এদের

অস্বীকার করতে পারবে? শ্রদ্ধেয় গোপাল হালদার মৃত্যুর কিছুদিন আগে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, "বিমল প্রতিভাকে ঠিক কেউ বুঝতে পারল না, ওর কথা মানুষ জানলো না, যদি পারো ওর কথা কিছু বোলো"।

আমরা কি রাজনৈতিক সংকীর্ণতার চোরাবালির মধ্যে ডুবে যাবো, না দলীয় সংকীণতার উর্ধ্বে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবো?

তখনকার কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য পদ পাওয়া আজকের মতো এত সহজ ছিল না। কমিউনিস্ট মাত্রই মনে করতেন শ্রমিকদের মধ্যে আন্দোলন করতে হবে। তখন সবচেয়ে সংগঠিত ছিল চটকলের শ্রমিকরা, তারা সংখ্যায়ও বেশী, চটকলে ইউনিয়নও তৈরী হয়েছে।

এছাড়া রয়েছে ট্রামশ্রমিক, রিকসাশ্রমিক, বিড়ি শ্রমিক এবং ডক মজদুর। এদের কোন ইউনিয়ন ছিল না।

সুধা রায় নিজেকে একজন কমিউনিস্ট হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন। তিনি কাজ করতে এলেন ডক মজদুরের মধ্যে। ডকে কোন মহিলা শ্রমিক ছিল না, এমনকি শ্রমিকরা তাদের পরিবার নিয়েও আসত না। বাঙালী শ্রমিক খুবই কম, প্রধানত উর্দুভাষী মুসলমান, হিন্দুস্থানী এবং ওড়িয়া।

সুধা রায় পড়াতেন কমলা গার্লস স্কুলে। প্রতিদিন ছুটির পরে খিদিরপুর, মেটেবুরুজ, চুনাগলি—এই অঞ্চল গুলোতে যেতেন। এমনও হয়েছে যে কাজ করতে করতে রাত হয়ে গেছে, তখন ওখানে থেকে যেতেন। ওখানে থাকতেন বেশ কয়েকজন নেতা যারা বন্দর শ্রমিকদের সংগঠিত করার কাজে যুক্ত ছিলেন। তাকে শ্রমিকরা সম্মান করতো, বিপদে আপদে তাদের 'বহিনজী'কে তারা রক্ষাও করেছে।

খিদিরপুর, মেটিয়াবুরুজ, চুনাগলি প্রভৃতি অঞ্চলের সে কালের কথা যারাই জানের তারা বুঝবেন যে বিশেষত ডক ধর্মঘটের মতো তীব্র সন্ত্রাসের সময় শত্রুপক্ষ যখন যেনতেন প্রকারে ধর্মঘট ভাঙতে সক্রিয়, তখন একজন মহিলার পক্ষে রাতে এই অঞ্চলে ঘোরা কত কঠিন কাজ ছিল।[৭০]

সুধা রায় শ্রমিকদের বস্তিতে প্রতিদিন গিয়ে তাদের বোঝাতেন রুশ বিপ্লবের কথা, ব্যাখ্যা করতেন কিভাবে 'সোভিয়ত ইউনিয়ন' অর্থাৎ শ্রমিক রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, অন্যান্য দেশে কিভাবে সাম্যবাদী আদর্শ ছড়িয়ে পড়ছে, সমাজতন্ত্র কি ইত্যাদি। সুধা রায়ই প্রথম ট্রেড ইউনিয়ন নেত্রী যিনি সচেতন ভাবে রাজনীতিকে শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে প্রসারিত করতে সচেষ্ট ছিলেন। .... সুধা রায়ের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ ছিল তার সততা, নিষ্ঠা, রাজনীতি-সচেতনতা এবং কর্মপ্রীতি।"[৭১]

বন্দর শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করতে এসেছেন লেবার পার্টির সদস্যরা — নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার, নির্মল সেনগুপ্ত, জ্যোতির্ময় নন্দী, শিশির রায়, কমল সরকার প্রমুখেরা। ডক শ্রমিকদের একজন বড় নেতা ছিলেন রজনী মুখার্জী।

শ্রমিকরা এবং নেতৃস্থানীয়রা একটা সংগঠন তৈরীর কথা ভাবতে শুরু করেন। সেলিম, শের খাঁ, আজিজ সর্দার কিছু শ্রমিককে নিয়ে পার্টি অফিসে আসে। আজিজ সর্দার হয়েও বুঝতে পারেন, আন্দোলন না করলে শ্রমিকরা কোন অধিকারই অর্জন করতে পারবে না।

১৯৩৪-এর মার্চ মাসে তৈরী হল 'পোর্ট এ্যান্ড ডক ওয়ার্কার্সি ইউনিয়ন।' আজিজ সর্দার হলেন সভাপতি সম্পাদক শিশির রায়, যুগ্ম সহ সভাপতি হলেন নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার এবং রজনী মুখার্জী। ১৯৩৪-এর ১মে এই ইউনিয়ন মে দিবস পালন করে শ্লোগান দিল 'লাল ঝান্ডা কি জয়', কমিউনিস্ট পার্টি কি জয়, 'আল্লাহো আকবর' — এরা ধর্মভীরু কিন্তু সাম্প্রদায়িক নয়।

১৯৩৪ সালের নভেম্বর মাসে শুরু হয় শ্রমিক ধর্মঘট। দাবীগুলি ছিল ঃ (১) ৮ ঘন্টা কাজের সময় (২) দৈনিক মজুরী হার বাড়ানো (৩) কাজের চাপ কমানো এবং (৪) চাকরীর স্থায়িত্ব ও নিয়ম-কানুনের প্রবর্তন করা।

২০,০০০ শ্রমিকের মধ্যে ১৪০০০ শ্রমিক ধর্মঘটে যোগ দেয়। মেটেবুরুজের জাহাজ মেরামত কোম্পানীর ৫০০০ শ্রমিকের মধ্যে ২০০০ বন্দর শ্রমিকদের সমর্থনে ধর্মঘট করে। ধর্মঘট সর্বাত্মক ও শান্তিপূর্ণ।

মালিকপক্ষ ধর্মঘট ভাঙতে চেষ্টা করে দালালদের দিয়ে। না পেরে চেষ্টা করে চীনা, অ্যাংলো ইন্ডিয়ান শ্রমিক, কয়লা খনির শ্রমিক এবং রেঙ্গুন থেকে শ্রমিক আনিয়ে পুলিশ পাহারায় জাহাজ চালাতে। শ্রমিক প্রতিরোধের সামনে পিছু হটতে বাধ্য হল, কিন্তু কোন অবস্থায়ই দাবী-দাওয়া মানতে রাজী হল না।

সুধা রায় ও আরও কয়েকজন, শিক্ষক, অধ্যাপক, উকিল, মোক্তার, ডাক্তার এবং ছাত্র যুবকদের মধ্যে ধর্মঘটের দাবী-দাওয়া ও তাৎপর্য সম্বন্ধে প্রচার করা এবং সংগ্রাম তহবিলের জন্য চাঁদা আদায় করার দায়িত্ব নিয়ে কলকাতায় এলেন। তবে খুব একটা গণসমর্থন পাওয়া গেল না।

শেষ পর্যন্ত ধর্মঘট ভেঙে গেল। সুরাবর্দী প্রত্যক্ষ ভাবে, সাম্প্রদায়িক নীতি ব্যবহার করে, পাল্টা ইউনিয়ন করে, ধর্মঘট ভেঙে দিলেন। নেতৃত্বের কেউ কেউ প্ররোচনায় পা দিয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করল — বিশেষ করে আজিজ সর্দার। শ্রমিক ঐক্যে ফাটল ধরল।[১১]

তবে এই ধর্মঘট ইতিহাসে কিছু স্থায়ী প্রভাব রেখে গেল। শ্রমিকদের রাজনৈতিক সচেতনতা এবং সাহস তাদের সংগঠন তৈরী করতে সাহায্য করল। সবচেয়ে বড় কথা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বেশ কয়েকজন শ্রমিক নেতৃত্বে উঠে এল — মহম্মদ ইউসুফ, শের আলি খাঁন, নারায়ণ রাও, এরা কমিউনিস্ট পার্টিতেও পরে যোগ দিল, আজিজ সর্দার ধর্মঘটে নেতৃত্ব দিল, আবার পরে ধর্মঘট ভাঙতেও সাহায্য করল। রহিম মালপাচার করত, ধর্মঘটে যোগ দিয়ে ওসব কাজ ছেড়ে দেয়। এই ওঠা-পড়ার মধ্য দিয়েই ইতিহাস এগোয়। নিজেদের ক্ষমতা সম্বন্ধে যেমন সচেতন থাকা দরকার, তেমনি দুর্বলতা সম্বন্ধেও সজাগ থাকা প্রয়োজন।

সুধা রায় ডক লেবার বোর্ডে প্রথম মহিলা সদস্যা হিসেবে নির্বাচিত হন। তিনি সেই সময় ছিলেন একজন প্রতিষ্ঠিত ট্রেড ইউনিয়ন নেত্রী।

এরপর সুধা রায় তার কর্মক্ষেত্র বেছে নিলেন ব্যারাকপুরের চটকল শ্রমিকদের মধ্যে। সরকারী গোপন রিপোর্টে বলা হচ্ছে, 'সুধা রায় লেবার পার্টির একজন উল্লেখ-যোগ্য কর্মী ছিলেন, তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য। তিনি ব্যারাকপুর, টিটাগড় শ্রমিক এলাকায় নিয়মিত যাতায়াত করতেন, বস্তিতে বস্তিতে ছোট ছোট গ্রুপ মিটিং করতেন। স্টাডি গ্রুপ তৈরী করে পুরুষ ও মহিলা শ্রমিকদের রাজনৈতিক চেতনা ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার বোধ জাগাবার জন্য পড়াতেন।'[৭৩] সে যুগে যে সাহসিকতার সঙ্গে সুধা রায় শ্রমিকদের মধ্যে কমিউনিজমের বার্তা পৌঁছে দিয়েছিলেন তা শিক্ষণীয়।

ডঃ মৈত্রেয়ী বোস বন্দর শ্রমিকদের আন্দোলনে একজন উল্লেখযোগ্য নেত্রী ছিলেন। রাজনীতিতে তিনি কমিউনিস্ট বিরোধী, কিন্তু শ্রমিক আন্দোলনে কমিউনিস্টদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছেন এবং একসঙ্গে কাজ করেছেন। ১৯৪৫-এ তিনি BPTUC-র সহ সভাপতি পদে এবং ১৯৪৭-এ কোষাধ্যক্ষ পদে নির্বাচিত হয়েছেন। সম্পাদক ছিলেন আবদুল মোমিন। বন্দর শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করতে করতে তিনি দার্জিলিং-এ চা-বাগানের মজুরদের মধ্যেও কাজ করেছেন। আন্তর্জাতিক শ্রম দপ্তরে ভারতীয় শ্রমিকদের পক্ষে জেনেভাতে প্রতিনিধিত্ব করেছেন।

তিনি বলেন বন্দর শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করতে তার কোন অসুবিধে হয়নি, আমাদের কাছে ধর্ম, জাতপাত কোনদিনই সমস্যা নয়, তাছাড়া শ্রমিকদের কাছে পূর্ণ সহযোগিতা পেয়েছি, ভালবাসা এবং শ্রদ্ধাও পেয়েছি। বরঞ্চ আমাদের উচ্চশিক্ষিত ভদ্রলোকেরা বিদ্রূপ করেছেন 'ছোটলোক' শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করি বলে।[৭৪]

সন্তোষকুমারী, প্রভাবতী, সাকিনা বেগম, সুধা রায়, মৈত্রেয়ী বোস—এরা প্রত্যেকেই প্রতিষ্ঠিত, গোড়ার যুগের শ্রমিক নেত্রী। অজস্র শ্রমিকের ভালবাসা এবং শ্রদ্ধায় এরা

সমৃদ্ধ হয়েছেন। জাতীয় নেতৃত্ব এদের খুব একটা পছন্দ না করলেও অগ্রাহ্য করতে পারেননি। লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে এবং নেত্রীদের সাহচর্যে সর্বত্রই শ্রমিকদের মধ্য থেকেও অনেকে নেতৃত্বে উঠে এসেছেন। কিন্তু তারা লিখতে পারেনা, তাদের কথা পত্র পত্রিকায় বা পুলিশ রিপোর্টেও থাকে না—এদের কথা জানার, এদের চেনার পথ কি? এমনকি শ্রমিক আন্দোলনের নথি-পত্রেও এদের নাম থাকে না। বিশিষ্ট কমিউনিস্ট নেতা রণেন সেন তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছিলেন টালিগঞ্জ এলাকায় 'গোলাপ' ছিল এক লড়াকু শ্রমিক নেত্রী, বহু ধর্মঘটে নেতৃত্ব দিয়েছে, মে দিবসের মিছিলে যোগ দিয়েছে।

কমলাপতি রায় সর্বভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের বাংলা শাখার সাধারণ সম্পাদক এবং ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের নেতা অধ্যাপক শিশির মিত্র বলেছেন কেশোরাম কটন মিলের 'গঙ্গা', বজবজ জুটমিলের আমিনা, জগদ্দলের ফুলমতি, বেঙ্গল পটারীর আরতি, এদের কথা। কেশোরামের ফুলকুমারী—এক অফিসার তার সঙ্গে অশালীন ব্যবহার করলে অফিসের মধ্যেই তাকে ঝাঁটা পেটা করে। এদের সংখ্যা খুব বেশী নয়, কিন্তু কেই-বা এদের মনে রাখে?

কমলাপতি রায় বলেছিলেন, 'আমরা ভুলও করেছি। আমরা শ্রেণী সংগ্রামের কথা বলেছি, কিন্তু শ্রেণীর মধ্যেও যে ছোটছোট সম্প্রদায় আছে—তাদের আলাদা দাবী আছে, তা আমরা কখনও ভাবিনি, তার জন্য লড়াই করিনি।'[৭৫]

এরকমই একজন মহিলা দুখমত দিদি, বরানগরে আলমবাজার বস্তিতে থাকেন, চটকলের মজুর ছিলেন। বস্তির প্রায় সবাই চটকলের কর্মী ছিল। আজ তারা ছাঁটাই হয়ে, বেকার।

দুখমত বিলাসপুরের ক্ষেতমজুর মেয়ে এবং বউ। অভাবের তাড়নায় স্বামী, স্ত্রী কলকাতায় আসে। নানান জায়গায় কাজ করে, শেষে বরানগর জুটমিলে চাকরী পায়।

১৯৮৮ সালে ওর সঙ্গে দেখা করতে যাই। ঘরে ঢুকতে হয় মাথা নীচু করে, ঘরে কোন আলো ঢোকে না। কথা বলতে হল একটা স্কুলে বসে। এই হচ্ছে শ্রমিকদের ঘর — ১৯২৬-১৯৪৫-৪৬-এ-১৯৭৬-এ আর ১৯৮৮-তেও কোন পরিবর্তন হল না।

দুখমত এলাকার শ্রমিকদের ভালবাসার মানুষ। তার কর্মক্ষমতা দেখে দুখমতকে পার্টি নেতৃত্ব কলকাতায় নিয়ে আসতে চেয়েছিলেন। হেসে বললেন, কলকাতা গিয়ে মনে হল এ আমার জায়গা নয়, আমার জায়গা আমার শ্রমিকদের মধ্যে। ফিরে এলাম।'[৭৬]

দুখমত দিদি বললেন, নতুন কৃৎকৌশল, প্রযুক্তির অজুহাতে শ্রমিক ছাঁটাই হচ্ছে। যাদের বয়স হয়েছে তাদের ছাঁটাই করো — অল্পবয়সী মেয়ে পুরুষকে নতুন কৃৎকৌশল

শেখাবার ব্যবস্থা করা হোক, মেয়েরা অদক্ষ একথা ঠিক নয়। মেয়েদের কিছু কিছু কাজ দেওয়া হয় না মজুরী কম দেবার জন্য। শ্রমিক নেতারা এসব কখনও ভাবেন? লড়াইয়ের পুরোভাগে থাকে মেয়েরা, যোগ্যতার সঙ্গে কাজ করে মেয়েরা, অথচ তাদের সুযোগ দেওয়া হবে না। ইউনিয়নগুলিতে মেয়েরা তো চাঁদা দেওয়া সদস্য মাত্র। কোন আলাপ-আলোচনা, সিদ্ধান্ত নেওয়া—সবই পুরুষ নেতৃত্বের হাতে। মেয়েদের যে কোন আলাদা দাবী থাকতে পারে সেকথা নেতৃত্ব কখনও ভাবেও নি। এমনকি মাতৃত্বকালীন সুযোগ-সুবিধার দাবীও, দাবী-দাওয়ার মধ্যে থাকতো না।'[৭৭]

দুখমত কারখানার মেয়েদের সঙ্গে নিয়মিত কথা বলতেন, তিনি বলতেন আমাদের চাকরী স্থায়ী নয়, মজুরী কম, সন্তান জন্মাবার সময় কোন সুযোগ, এমনকি সবেতন ছুটিও নেই। আমরা যদি ঐক্যবদ্ধ হই এবং পুরুষদের সঙ্গে সব লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করি, তবে হয়তো মেয়েদের জন্য বিশেষ বিশেষ দাবী আদায় করা যাবে। তিনি মেয়েদের নিয়ে সংগঠন করলেন, ওয়ার্কার্স কমিটিতে নির্বাচিত হলেন, ১৯৬০-এ বরানগর জুট মিলে ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হলেন। নিরক্ষর দুখমত কেবলমাত্র নিষ্ঠা এবং কর্মক্ষমতার জোরে এখানে পৌঁছলেন। রাজনৈতিক বোধ লড়াইয়ের মধ্যে দিয়েই তিনি অর্জন করেছেন।

এই বোধ থেকেই আন্দোলনের দাবী অনেকটা পাল্টে গেল। ১৯৫৩-র সেপ্টেম্বর মাসে ২০ হাজার চটকল শ্রমিক মার্চ করে কলকাতা গেল এবং ইন্ডিয়ান জুটমিল অ্যাসোসিয়েশনের হেড অফিস ঘেরাও করল। দুখমত বেশ কিছু নারী শ্রমিক সঙ্গে নিয়ে মিছিলে যোগ দিলেন। দাবীগুলো উল্লেখযোগ্য ঃ

চটকলের শ্রমিকদের ভাল হাসপাতাল চাই, সন্তান জন্মের পর মা এবং সন্তানের জন্য প্রয়োজনীয় ভাতা দিতে হবে, যারা ৩০ বছর কাজ করেছে তাদের অবসরকালীন সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে।

মাঝে মাঝেই সাম্প্রদায়িক উস্কানি দিয়ে শ্রমিক ঐক্য ভেঙে দেবার চক্রান্ত হত। দুখমত এবং অন্যান্যরা তখন শ্রমিকদের নিয়ে আলাদা আলাদা করে আলোচনা করতেন, দুখমত বলতেন, তোমরা হিন্দু কি মুসলমান, বাঙালী কি হিন্দুস্থানী বা উড়িয়া —তোমাদের মালিকরা শোষণ করবেই—এর হাত থেকে বাঁচার একটাই পথ— তোমাদের সুদৃঢ় ঐক্য—এক হও, সংগঠন তৈরী কর, লড়াই কর।'[৭৮]

সাধারণ শ্রমিক থেকে নেতৃত্বে উঠে এসেছিলেন বেঙ্গল ল্যাম্পের সুকুমারী চৌধুরী। দাঙ্গার পর দেশ ছেড়ে কলকাতা এসে জবর দখল কলোনীতে ঠাঁই হয়। সেখান থেকে নারীসেবা সংঘ, তারপর বেঙ্গল ল্যাম্প-এ কাজ পান।

তখন ১২০০ শ্রমিক ওখানে কাজ করেন, ১২ জন মাত্র নারী শ্রমিক। মাসে ৪০ টাকা মাইনে, কাজ না করলে মাইনে নেই। কাজের সময় ৭-৩০ - ৫টা। শেষ পর্যন্ত নারী শ্রমিকের সংখ্যা বেড়ে হয়েছিল ৮০ জন। সুকুমারী অল্পদিনের মধ্যেই ইউনিয়নে যোগ দিলেন।

১৯৫৫ সালে একজন কর্মচারীকে সাসপেন্ড করলে অন্যান্য কর্মচারীরা ধর্মঘট করেন। মালিক পক্ষ পুলিশ দিয়ে ধর্মঘট ভাঙ্গার চেষ্টা করলে সুকুমারী মেয়েদের জড়ো করে পুলিশকে আক্রমণ করেন।

কর্তৃপক্ষ ৬৫০ জন কর্মচারীকে বরখাস্ত করে, তার মধ্যে ৬০ জন মহিলা। সুকুমারী মেয়েদের নিয়ে পাশের কলোনী থেকে ধর্মঘটী শ্রমিকদের জন্য খাবার নিয়ে আসতেন।

শেষ পর্যন্ত ১৬ মার্চ মীমাংসা হয়। বরখাস্ত কর্মীদের পুনর্বহাল করা হবে, নারী শ্রমিকদের চাকরী স্থায়ী করা হবে, পূজোর সময় ২ মাসের বোনাস দেওয়া হবে। বেঙ্গল ল্যাম্পে লাল ঝান্ডা উড়ল।[৭৯]

১৯৯০-এ বেঙ্গল ল্যাম্প কোম্পানী অবসর গ্রহণ করতে বাধ্য করে বহু শ্রমিককে। সুকুমারী চৌধুরীও তখন অবসর নিতে বাধ্য হন। সামান্য অর্থ এদের হাতে ধরিয়ে দেওয়া হয়।

সুকুমারী চৌধুরী খুব অনুযোগের সুরেই বললেন আমি কিংবা অন্যান্য জঙ্গী মহিলা শ্রমিক কেউই দাবী-দাওয়ার ব্যাপারে, আলাপ-আলোচনায় বা ট্রেড ইউনিয়নে অন্যান্য শ্রমিকের মতো সমান স্বীকৃতি কোনটাই পাইনি। ইতিহাসবিদরাও এই সমস্ত মহিলা নেত্রীর প্রতি সুবিচার করেননি।[৮০]

সংগঠিত বা অসংগঠিত শিল্পে মহিলা নেতৃত্বের অভাব প্রগতিশীল আন্দোলনের দূর্বলতা। পরাধীন ভারতবর্ষে শাসকের অত্যাচার সত্ত্বেও সাহস করে এগিয়ে এসেছিলেন বেশ কয়েকজন উল্লেখযোগ্য মহিলা শ্রমিক নেত্রী। প্রত্যেকেই শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ থাকতে, সংগঠন তৈরী করতে, এবং শুধু মাত্র অর্থনৈতিক অধিকারের জন্য নয়, সমাজ পরিবর্তনের লড়াই করার পরামর্শ দিয়েছেন, সঙ্গে থেকে সাহায্য করেছেন।

আজ শ্রমিক এবং শ্রমিক নেতাদের মধ্যে একটা দুরত্ব তৈরী হয়েছে। আমাদের দেশের মোট শ্রমিকের ১০ থেকে ১৫ শতাংশ শ্রমিক ইউনিয়নভুক্ত।

স্বাধীনতার পর প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল তাদের নিজস্ব ট্রেড ইউনিয়ন তৈরী করেছে এবং তা পার্টির নির্দেশে পরিচালিত। এই কলকাতা বহু যুক্ত সংগ্রামের সাক্ষী, আর তাতে ছিল মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত ভূমিকা, আজ তা নষ্ট হয়ে গেছে।[৮১] ট্রেড

ইউনিয়ন একটি গণসংগঠন, কিন্তু প্রত্যেকটি ইউনিয়নই দলের স্বার্থ দেখে। অনেক সময় এতে শ্রমিক স্বার্থ ব্যাহত হয়। দলীয় সরকারের ন্যায়-নীতিকে নিঃশর্ত সমর্থন করা, সংগ্রামী জনতার বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে।[৮২]

নির্দেশিকা

১। *সোমপ্রকাশ* ঃ ৫মে ১৮৬২

২। জন বুল ঃ ৩ জুন ১৮২৭

৩। সুনীল মুন্সী, গৌতম চট্টোপাধ্যায়, মঞ্জু চট্টোপাধ্যায় ঃ *এই আমাদের বাংলা,* কলকাতা ১৯৭৩, পৃঃ ৬৬-৬৭

৪। রামকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ঃ *ইতিহাস অনুসন্ধান* - ১৯৮৬, পৃঃ ১৫৯-৬০

৫। *AITUC, 50 years Documents, Vol-1.*

৬। নির্বাণ বসু ঃ *ইতিহাস অনুসন্ধান* - ১, পৃঃ ১৭৭

৭। *Report of Royal Commission of Labour 1892.*

৮। Goutam Chattopadhyay : *Presidential Address, I.H.C.* 1986. Quoted from Times of India, Bombay, 25 July, 1908.

৯। V.I. Lenin : Inflamable Material in World Politics 5 August; 1908.

১০। Goutam Chattopadhyay, *op. cit.*

১১। V.V. Karnik : *Strikes in India*, p. 60 and 67.

১২। David Petri, *Communism in India 1924-27,* Indian Ed. Calcutta 1972, p. 256. উদ্ধৃত—চিন্মোহন স্নেহানবীশ : মুখবন্ধ, মঞ্জু চট্টোপাধ্যায় —শ্রমিক নেত্রী সন্তোষকুমারী ১৯৮৪, কলকাতা।

১৩। Balabusevich & Dyakov : *Comtemporary History of India,* Delhi, 1964. p. 51.

১৪। David Petri : *op. cit.* p. 261

১৫। *Petri, op. cit.* p. 271

১৬। *Petri, op. cit.* p. 277

১৭। Santosh Kumari Gupta : 'How I started the labour movement' (unpublished)

১৮। *আনন্দ বাজার পত্রিকা* ঃ ২০ জানুয়ারী, ১৯২৪

১৯। সন্তোষকুমারী দেবী ঃ সাক্ষাৎকার, ২৬.৫.৮৩

২০। *আনন্দবাজার পত্রিকা* ঃ ৫ জুন, ১৯২৪

২১। রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য ঃ *অনির্বাণ অগ্নিশিখা — ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, ইতিহাস বোধ ও রাষ্ট্রচিন্তা,* কলকাতা, ১৯৯৬, পৃঃ ৫৯

২২। *AITUC 50 Years Documents. Vol.* 1 p. 79.

২৩। *সংহতি* ঃ বৈশাখ, ১৩৩০ (১৯২৩), নিবেদন

২৪। *সংহতি* ঃ মে, ১৯২৩ এবং আত্মশক্তি, ৬ জুন, ১৯২৩

২৫। *শ্রমিক ঃ সাপ্তাহিক,* সম্পাদিকা সন্তোষকুমারী গুপ্তা (২২ ফেব্রুয়ারী, ১৯২৩), কলকাতা

২৬। *শ্রমিক* ঃ সম্পাদকীয়

২৭। ঐ ঃ পৃঃ ৫

২৮। পঞ্চানন চক্রবর্তী ঃ সাক্ষাৎকার, ২১.৫.৭০ কলকাতা

২৯। সন্তোষকুমারী দেবী ঃ The Bengal Nagpur Strike (unpublished)

৩০। পঞ্চানন সাহা ঃ *নাগপুরী শাকলাতওয়ালা* দিল্লী-১৯৭০

৩১। পঞ্চানন সাহা ঃ *নাগপুরী শাকলাতওয়ালা* দিল্লী-১৯৭০

৩২। সন্তোষকুমারী দেবী ঃ *সাপুরজী শাকলাতওয়ালা* (অপ্রকাশিত)

৩৩। মঞ্জু চট্টোপাধ্যায় ঃ *শ্রমিক নেত্রী সন্তোষ কুমারী, ১৯৮৪,* কলকাতা, পৃঃ ৫৯

৩৪। Thomas Johnstor : John F Sime *Exploitation in India,* 1925 p. 11-12.

৩৫। Johnston, *op. cit.* 17

৩৬। K.P. Chattopadhyay : A Socio Economic Survey of Jute Labour, 1952.

৩৭। *Ibid.*

৩৮। *Ibid.*

৩৯। Sisir Mitra : *The Jute Workers A Micro Profile,* — CRESIDA, 1981 (Unpublished).

৪০। *Ibid.* Chapter VI, p. 192

৪১। Dr. Boudhayan Chattopadhyay. *Ibid* : Foreward.

৪২। মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় ঃ *অসমাপ্ত চটাব্দ* - উদ্ধৃত ঃ অমল দাস, *ইতিহাস অনুসন্ধান* - ১, পৃঃ ১৬৯-৭০

৪৩। রণজিত দাশগুপ্ত ঃ *The Jute General Strike of 1929 : Introduction.*

৪৪। V.V. Karnik : *Strikes in India.*

৪৫। *Report of the Royal Commission of Labour,* June, 1931, also-Meerut Trial Documents. *1930.*

৪৬। গোপেন চক্রবর্তী - সাক্ষাৎকার, ফেব্রুয়ারী-মার্চ ১৯৬৯

৪৭। *কমিউনিষ্ট পার্টির ইস্তাহার,* জানুয়ারী. ১৯২৯

৪৮। *আনন্দবাজার পত্রিকা,* ৭ জুলাই ১৯২৯

৪৯। *The Statesman,* 5 August, 1929.

৫০। মঞ্জু চট্টোপাধ্যায় ঃ এ.আই.টি.ইউ.সি'র ২২ তম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্মেলন, জুন, ২০০২, পৃঃ ৩১-৩৬

৫১। গৌতম চট্টোপাধ্যায় ঃ *স্ট্রাইক! স্ট্রাইক!* কলকাতা, মার্চ ১৯৯১

৫২। রণজিত দাশগুপ্ত ঃ প্রভাবতী দাশগুপ্ত - সাক্ষাৎকার

৫৩। মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ ঃ *আমার জীবন ও কমিউনিষ্ট পার্টি,* ২ খন্ড, পৃ-২৬

৫৪। মণি সিংহ, *জীবন সংগ্রাম*

৫৫। বীরেন রায় - সাক্ষাৎকার মার্চ, ১৯৮৬

৫৬। মনসুর হাবিবুল্লাহ - সাক্ষাৎকার, ১৬ নভেম্বর ১৯৮৬

৫৭। *Minutes of the Proceedings of Calcutta Corporation*, 26.3.1940, p. 1993.

৫৮। *Proceedings* 30.3.1940, p. 3081, 3086.

৫৯। বীরেন রায় - সাক্ষাৎকার ১৭ নভেম্বর ১৯৮৬

৬০। ঐ - ডিসেম্বর ১৯৮৬

৬১। *আনন্দবাজার পত্রিকা*, ২৭ আগষ্ট, ৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৪০

৬২। বিমলপ্রতিভা দেবী : *আগুনের ফুলকি*, ১৯৪৮

৬৩। ঐ

৬৪। *Weekly Notes of Calcutta Police*, 25 April, 1931.

৬৫। *Ibid.* 16 May 1931

৬৬। *Calcutta IB Records*, File no. 136/36/7, Leters no. 20.7.36

৬৭। গৌতম চট্টোপাধ্যায় : *সমাজতন্ত্রের অগ্নিপরীক্ষা ও ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি*, ১৯৯২, পৃঃ ১৬৫-৬৬

৬৮। বিমলপ্রতিভা দেবী : *আগুনের ফুলকি*

৬৯। রবীন সেন : *পাঁচ অধ্যায়*, কলকাতা, ১৯৮৮

৭০। জ্যোতির্ময় নন্দী : "যে সুধারায়কে জানতাম", *কালান্তর (সাপ্তাহিক)*, ৪.৭.৮৭

৭১। কমল সরকার : *"কমরেড সুধা রায় : শ্রমিক আন্দোলন এবং সাক্ষাৎকার"* — ৩.৯.৮৭

৭২। মঞ্জু চট্টোপাধ্যায় : *ইতিহাস অনুসন্ধান-৩*, পৃঃ ৪১৯

৭৩। *Calcutta IB Records,F. No. 67/39*, সাক্ষাৎকার — নন্দলাল বসু, ৩.৯.৭৯

৭৪। ডঃ মৈত্রেয়ী বোস : *মুক্তির অধিকারে* এবং সাক্ষাৎকার - ৭.১১.৭৯

৭৫। কমলাপতি রায় : সাক্ষাৎকার, ২৯.৭.৯৫

৭৬। দুখমত দিদি : সাক্ষাৎকার, ২৬.৬.৮৮

৭৭। ঐ - ২৭.৬.৮৮

৭৮। মঞ্জু চট্টোপাধ্যায় *"আলমবাজারের লড়াকু শ্রমিক নেত্রী দুখমত দিদি"*, *ইতিহাস অনুসন্ধান - ১৪*

৭৯। *স্বাধীনতা* - ১৮.৩.৫৫

৮০। সুকুমারী চৌধুরী - সাক্ষাৎকার — সেপ্টেম্বর ১৯৯১

৮১। বীরেন রায় - *সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলনের সাত দশক*, ২০০২, পৃঃ ৯১-৯৫

৮২। বীরেন রায়, তদেব

৪

কলকাতা ও খিদিরপুর ডকে শ্রমিক সংগঠনের প্রথম তিন দশক ১৯০৫-১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দ

ইরা মিত্র*

বিগত শতাব্দীর সত্তরের দশক থেকে শ্রমিক কৃষক ও আদিবাসী, অর্থাৎ সমাজের অবহেলিত ও নির্যাতিত নিম্নবর্গীয় মানুষদের নিয়ে লেখালেখি আমাদের ইতিহাস চর্চার অঙ্গীভূত হয়ে উঠেছে। ঔপনিবেশিক আমলে, মূলত বিদেশী পুঁজিতে যে শিল্পায়ন হয়েছিল, তাতে ভারতের শিল্প মানচিত্রে বাংলা অবশ্যই একটি বিশেষ স্থান অধিকার করেছিল। সংস্থাভিত্তিক কর্মরত শ্রমিকের সংখ্যা হিসেবে বাংলার চটশিল্প ও কলকাতা বন্দর, প্রায় দুটি সমান্তরাল শিল্প সংস্থা ছিল। চটশিল্পে নিযুক্ত অধিকাংশ শ্রমিকদের মতই বন্দরে নিযুক্ত শ্রমিকরা ভিন্ন প্রদেশ থেকে এই প্রদেশে আসত। সম্বৎসরে তিন মাস খেতি (চাষ) করতে চট শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের মত বন্দরে নিযুক্ত শ্রমিকরাও, তাদের নিজস্ব প্রদেশে ফিরে যেত। অর্থাৎ, দুটি শিল্প সংস্থায় নিযুক্ত শ্রমিকদের ধরণ ধারণ প্রায় একই রকম ছিল, এতদ্‌সত্ত্বেও, চট শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকরা গবেষকদের যতটা নজর কেড়েছে বন্দর শ্রমিকরা কিন্তু ততটা পারেনি। কলকাতা বন্দরের পরিকাঠামো প্রস্তুতি এবং তার কর্ম সংস্কৃতি নিয়ে কিছু মূল্যবান কাজ হলেও, শ্রমিকরা কিন্তু সেখানে অনুপস্থিত থেকে গেছে। কলকাতা বন্দরের অংশ বিশেষ, কলকাতা ও খিদিরপুর ডকে নিযুক্ত শ্রমিকদের নিজস্ব সংগঠন কি ভাবে গড়ে উঠেছিল এবং পরবর্তী সময়ে এই ভিন্ প্রদেশের শ্রমিকরা কিভাবে এই প্রদেশের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের অংশীদার হয়েছিল — বর্তমান প্রবন্ধে তাই আলোচিত হবে। বর্তমান

*প্রাক্তন রীডার, ইতিহাস বিভাগ, বঙ্গবাসী কলেজ, কলকাতা।

সময়ের ইতিহাস চর্চার পদ্ধতি মেনে ডক শ্রমিকদের নিজস্ব সংগঠন গড়ে ওঠার মূলে শ্রমিকদের নিজস্ব স্বকীয়তা কতটা ছিল, সে ব্যাপারের ওপর যথেষ্ট পরিমাণ গুরুত্ব আরোপ করা হবে। সর্বশেষে বর্তমান প্রবন্ধটি লেখার জন্য তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে মনে হয়েছে, শ্রমিকদের সংগঠিত হওয়া বা করা এব্যাপারে শ্রমিক মালিক সম্পর্ক, শ্রমিকদের নিজস্ব স্বকীয়তা এবং বহিরাগতদের হস্তক্ষেপ ইত্যাদির সঙ্গে সেই বিশেষ শিল্প সংস্থার কাঠামোরও অবশ্যই ভূমিকা আছে। বর্তমান প্রবন্ধটিতে বিগত শতাব্দীর প্রথম দশক থেকে শুরু করে তৃতীয় দশকের মধ্যে আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকবে। এই তিন দশক ধরে অনেক উত্থান-পতনের পর, শেষ দশকে এসে ডক শ্রমিকরা সবে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন সংক্রান্ত শিক্ষার প্রথম পাঠ নেবার কাজ শেষ করেছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর সত্তরের দশক থেকেই ডক শ্রমিকদের সঙ্গে ঘাট সর্দারদের দাঙ্গা-হাঙ্গামা ছিল নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। এই সময়কালটা ছিল কলকাতা ও খিদিরপুর ডকের সূচনা পর্ব; পরে প্রথমটির নামকরণ হয় নেতাজী সুভাষ ডক এবং দ্বিতীয়টির কিং জর্জ ডক। কলকাতা বন্দরের কাজ কর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সরকারী প্রতিষ্ঠানের এবং কলকাতা করপোরেশনের প্রতিনিধিদের নিয়ে ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে পোর্টট্রাস্ট গঠিত হয়েছিল। সামগ্রিকভাবে কলকাতা বন্দরের প্রশাসনের দায়িত্ব ছিল পোর্টট্রাস্টের ওপরে। প্রশাসন পরিচালনার জন্য পোর্টট্রাস্টের তরফ থেকে সরাসরিভাবে শ্রমিক কর্মচারী নেওয়া হত। কিন্তু কলকাতা বন্দরের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের দেখভাল করার দায়িত্ব বেসরকারী মালিকানার ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল, কলকাতার খিদিরপুর ডক ছিল এর অন্যতম। উপরোক্ত দুটি ডকে মাল নামানো ও ওঠানোর কাজ শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে বেসরকারী মালিকরা বা কয়েকজন স্টিভেডরের ওপরে ঐ দায়িত্বভার অর্পিত হয়। পরে, ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে Stevedoring Act পাশ হয়। উপরোক্ত স্টিভেডরেরা সকলেই কলকাতার উচ্চবিত্ত ও সম্ভ্রান্ত বাঙালী ছিলেন। পরে, অর্থাৎ ১৯৩৬/৩৭ খ্রীষ্টাব্দে, এঁদের সংখ্যা ৩৬/৩৭ হয় এবং কয়েকজন মাড়োয়ারী এই দলভুক্ত হয়েছিলেন। এই স্টিভেডরদের কাজের যে ধরন ছিল তাতে স্থায়ীভাবে তাদের শ্রমিক নিয়োগের প্রয়োজন ছিল না। কয়েকজন শ্রমিক সর্দার, যাদের ঘাট সর্দার বলা হত, প্রতিদিন তাদের প্রয়োজনীয় সংখ্যক শ্রমিক জোগাড় করে দিত। এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক শ্রমিক সরবরাহে যাতে অসুবিধা না হয়, তার জন্য বিরাট সংখ্যক শ্রমিক, সর্দারদের সংগ্রহে থাকত। অর্থাৎ, ডক শ্রমিকরা ছিল দৈনিক মজুরী ভিত্তিক শ্রমিক। প্রথমেই আমরা যে শ্রমিক ও ঘাট সর্দারদের দাঙ্গা-হাঙ্গামার উল্লেখ করেছি তার সুনির্দিষ্ট কারণ ছিল মজুরী নিয়ে দর কষাকষি করা। এভাবে প্রতিটি ঘাট সর্দারের চেষ্টা থাকত কত কম লোক নিয়ে দল বা গ্যাঙ তৈরী করা যায়। আর এই পরিস্থিতি কিন্তু বহুদিন বজায় ছিল। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে, যখন ডক শ্রমিকদের সাধারণ ধর্মঘট

চলছিল, তখন সৈয়দ সুরাবর্দী, যিনি পরে প্রাদেশিক মন্ত্রীসভায় শ্রম মন্ত্রী হয়েছিলেন, তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলেছিলেন - "If the rank and file could combine to a man, the sirdar with all the evils that attached to the sirdar system would ultimately be swept away."

স্টিভেডরদের বিরুদ্ধে প্রথম ডক শ্রমিকদের ধর্মঘট হয়েছিল ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে, অর্থাৎ যখন পর্যন্ত ডকের আধুনিক পরিকাঠামো গড়ে ওঠেনি। স্টিভেডরগণ কর্তৃক লাইসেন্স ট্যাকস আদায়ের বিরুদ্ধে শ্রমিকরা ধর্মঘট করে। য়্যান্টানিও গ্রামশিকেঅনুসরণ করা বলা যায়, "স্ফতঃস্ফূর্ত হলেও, প্রাথমিক চেতনা বোধ থেকে এই ধর্মঘট হয়েছিল।" উপযুক্ত তথ্যের অভাবে ফলাফল সম্বন্ধেআমরা অবহিত নই। স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনেও প্রাথমিক চেতনাবোধ থাকলেও তা পরিচালিত হয় পুরনো কাঠামোর মধ্যে, তাকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে প্রয়োজন হয় অগ্রসর তত্ত্বের।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই খিদিরপুর অঞ্চলের একজন অত্যন্ত জনপ্রিয় ডাক্তার, শরৎ মিত্র ডকে কর্মরত শ্রমিকদের মধ্যে স্বদেশী চেতনা জাগরণের প্রয়াসে এগিয়ে আসেন। রাজনৈতিক মতাদর্শের দিক দিয়ে ডঃ শরৎ চন্দ্র মিত্র সন্ত্রাসবাদী অনুশীলন গোষ্ঠীভুক্ত ছিলেন। প্রথমদিকে তিনি একাই বেশ কিছু উৎসাহী ডক শ্রমিকদের নিয়ে পরিত্যক্ত কৈলাসের রাজবাড়িতে প্রায় প্রতিদিন রাত্রিতে সভা সমাবেশ করতেন। পরে স্বদেশী আন্দোলন শুরু হবার অল্প কিছু দিন আগে থেকে এই কাজে তাঁর সঙ্গী হন আশুতোষ ব্যানার্জী ও প্রেমতোষ বোস। স্বদেশী আন্দোলন চলাকালীন সময়ে বিভিন্ন সংস্থায় শ্রমিকদের সংঘটিত করার কাজে এঁরা উভয়ই যুক্ত ছিলেন।

স্বদেশী আন্দোলনের পর্যায়ে (১৯০৫ - ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে) এবং স্বদেশী আন্দোলনের অংশ বিশেষ হিসেবে ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা বন্দরের জেটিতে নিযুক্ত ৪০০ জন বিভাগীয় শ্রমিক প্রথম ধর্মঘট করে। এই প্রসঙ্গে বলা যায় ঔপনিবেশিক আমলে কলকাতা বন্দরে জেটিতে নিযুক্ত শ্রমিকদের একটা বড় অংশ ছিল অস্থায়ী শ্রমিক এবং এদের তত্ত্ববধানের দায়িত্বে ছিল বোর্ড কোম্পানি। এই সময় জেটিতে যে ধর্মঘট হয়, তাঁর নেতৃত্বে ছিলেন এ.সি. ব্যানার্জী ও প্রেমতোষ বোসেরা। ধর্মঘট শুরু হবার অল্প দিনের মধ্যেই, বন্দর কর্তৃপক্ষ পুলিশের সাহায্য নিয়ে ধর্মঘট ভেঙ্গে দেয়, এবং শাস্তি স্বরূপ অধিকাংশ শ্রমিককে বরখাস্ত করা হয়। বন্দর কর্তৃপক্ষের এই নির্মম ব্যবহার কিন্তু বন্দর শ্রমিকদের মধ্যে কোন হতাশাজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়নি! কিছু পরিমাণ উন্নত চেতনাবোধের সঙ্গে অস্বাভাবিক রকমের খাদ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির কারণ যে মিলে মিশে গিয়েছিল তা বোধহয় অস্বীকার করা যাবে না। জেটি শ্রমিকদের ধর্মঘটের ঠিক এক বছর পরে, অর্থাৎ ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে, কলকাতা

ও খিদিরপুর ডকের শ্রমিকরা ধর্মঘট করে। এই সময় উভয় ডকে কর্মসংস্থানের সুযোগ ছিল মোটামুটিভাবে ৭০০০ শ্রমিকের। ধর্মঘটে অংশ গ্রহণকারী মোট শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ২০০০। মজুরী বৃদ্ধি অথবা স্টিভেডরগণ কর্তৃক সস্তায় খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ করা ছিল এই ধর্মঘটের মূল দাবী। প্রধানত, বহিরাগত নেতাদের সাহায্য ছাড়াই ধর্মঘটটি সংঘটিত হয়। পরে নেতারা এসে হস্তক্ষেপ করেন। ধর্মঘট পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় তহবিল বাইরে থেকে সংগ্রহের উদ্দেশ্যে শহর কলকাতার রাজপথে বহিরাগত নেতাদের নেতৃত্বে ডক শ্রমিকদের মিছিল আমজনতাদের নিকট থেকে ধর্মঘট পরিচালনার জন্য অর্থ সংগ্রহ করত। এতে শ্রমিকদের মধ্যে তো বটেই, এমনকি আমজনতার মধ্যেও, এই ভিন প্রদেশের শ্রমিকদের সাহায্য করার ব্যাপারে যথেষ্ট উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু শ্রমিক নেতাদের মধ্যে অধিকাংশই, বিশেষ করে এ.সি. ব্যানার্জী, দ্বৈত ভূমিকা পালন করেছিলেন। প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, এই সুযোগে তিনি উৎসাহী শ্রমিকদের নিয়ে কোন সংগঠন না গড়ে, মালিকদের সঙ্গে সমঝোতা করার ওপর বেশী গুরুত্ব দিয়েছিলেন। 'ডেইলী নিউজ' পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্যানুযায়ী ধর্মঘট শুরু হবার কয়েকদিন পরেই. অর্থাৎ শ্রমিকদের উৎসাহ যখন তুঙ্গে, তখন নেতারা দলবদ্ধ ভাবে ধর্মঘটী শ্রমিকদের নিয়ে 'Master Stevedor Union'-এর প্রেসিডেন্ট আশুতোষ চৌধুরীর বালিগঞ্জ প্লেসের বাড়িতে যান। এ.সি. ব্যানার্জীর তরফ থেকে মিছিল করে আসা ডক শ্রমিকদের 'Indian Labour Union'-এর সদস্য বলে পরিচয় দেওয়া হয়। এ.সি. ব্যানার্জীর মধ্যস্থতায় স্টিভেডর ইউনিয়নের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে ধর্মঘটী শ্রমিকদের ধর্মঘটের ব্যাপারে সমঝোতা হয়। আশুতোষ চৌধুরীর তরফ থেকে শ্রমিকদের দাবী-দাওয়া মেনে নেওয়া এবং অচিরেই তা কার্যকরী করার প্রতিশ্রুতি দিলে এই পর্যায়ে ধর্মঘটের অবসান ঘটে।

দ্বিতীয় পর্যায় (১৯২০ - ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দ)

স্বদেশী আন্দোলন বা বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন শেষ হওয়া, অর্থাৎ ১৯০৫ থেকে ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দ এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু ও শেষ হওয়া (১৯১৪-১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দ) এই মধ্যবর্তী সময়ে গঙ্গায় অনেক জল বয়ে গেলেও শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে কোন নতুন সম্ভাবনা দেখা যায়নি। স্বদেশী আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে বেশ কিছু শ্রমিক সংঘ গড়ে উঠলেও, এই সময়কালের মধ্যে অধিকাংশই অবলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, পরিবর্তে বহু জায়গাতে হিন্দু ও মুসলিম শ্রমিকরা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সংক্রমণে সংক্রামিত হয়েছিল, এর থেকে কলকাতা বন্দর শ্রমিকরাও মুক্ত ছিল না। বজবজ 'কোল ওয়ারভসে' সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কারণে এত বেশী সংখ্যক শ্রমিক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার স্বীকার হয়েছিল, যে বেশ কিছু সময় বন্দরের কিছু কিছু বিভাগের প্রয়োজনীয় সংখ্যক

শ্রমিকের অভাব দেখা দেয়। ডক শ্রমিকদের মধ্যে, উত্তরপ্রদেশের বেনারস ও এলাহাবাদ থেকে আগত উচ্চবর্ণের হিন্দু, উড়িষ্যা ও অন্যান্য জায়গা থেকে উচ্চ ও নিম্নবর্ণের হিন্দু ও মুসলমান এবং কলকাতা বন্দরে মাংস ও মাংসজাত খাদ্য আমদানি রপ্তানির পরিবহণের কাজে নিযুক্ত একদল চামার গোষ্ঠী ছিল। কি হিন্দু কি মুসলমান সকলেই এই চামার গোষ্ঠীর সঙ্গে নির্দিষ্ট পরিমাণ দূরত্ব বজায় রেখে চলত। অতএব, জাতপাত বা সাম্প্রদায়িক সংঘাত ঘটার যথেষ্ট কারণ থাকলেও. এখানে এই পর্যায়ে সামান্যতম সংঘর্ষের ঘটনাও ঘটেনি।

১৯২০-২১এ, শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে জোয়ার এসেছিল। প্রাথমিক পর্বে এর একটাই কারণ, যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে বিশেষ করে ১৯২২/২৩ পর্যন্ত, শিল্প দ্রব্যের চাহিদায় ভাটা পড়েনি। ১৯১৪/১৫ থেকে ১৯২২/২৩ পর্যন্ত চট শিল্পের সুবর্ণ সময়। কলকাতা বন্দর এখন দেশের মধ্যে সব থেকে ব্যস্ততম বন্দর। যুদ্ধের সময় থেকে শুরু করে কলকাতা বন্দরে কর্মী সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৯০৫-১৯০৭ এর ডকের ৭০০০ কর্মীর স্থানে ১৯২১/২২-এ কর্মচারী ছিল ২৬,০০০/২৭,০০০। যুদ্ধ চলাকালীন এবং যুদ্ধ শেষ হবার পরেও, নতুন নতুন শিল্প সংস্থা স্থাপনে বাংলায় শিল্প শ্রমিকের সংখ্যা অসম্ভব বৃদ্ধি পায়। এর ফলে শ্রমিকদের একটি নির্দিষ্ট বাজার তৈরী হয়। এতে আগের মত বাজার বহির্ভূত ভাবে শ্রমিকদের বঞ্চনা করার সুযোগও কমে যায়। বাজারে চাহিদা থাকায় শ্রমিক আন্দোলনে জোয়ার আসে। ভারতের অন্যান্য শিল্পাঞ্চলের তুলনায় প্রথম বাংলায় ধর্মঘট পর্ব আগেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের সরকারী নথি অনুযায়ী "It is an unprecedented event in Bengal"। প্রথম পর্বে ধর্মঘট প্রায় সর্বত্রই স্বতঃস্ফূর্ত ছিল। তবে শতাব্দীর প্রথম দশকের তুলনায়. শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে. শ্রমিকদের চেতনার স্তর অবশ্যই কিছুটা উন্নত হয়েছিল। এই সময় বহিরাগত নেতাদের অনুপ্রবেশ ক্রমে ক্রমে ঘটেছিল এবং অবস্থানগত দিক দিয়ে নেতাদের মধ্যেও নানা স্তর ভেদ ছিল। এই পর্যায়েও বহিরাগত ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের একটা বড় অংশ অবশ্যই আইন ব্যবসায়ী ছিলেন, কিন্তু অন্যান্য পেশা থেকেও যারা এসেছিলেন তাদের সংখ্যা কম ছিল না। যেমন বিহার থেকে একদল সাধু, যাঁদের মধ্যে শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের একজন অধ্যাপকও ছিলেন, বাংলায় এবং বিহারের চটকল ও কোল ফিল্ডে কিন্তু তাঁরা শ্রমিক সংগঠন শুরু করেন। তাঁদের পিছনে পাটের ফাটকা বাজারের এবং কয়লা খনির মাড়োয়ারী মালিকদের যে মদৎ ছিল তারও তথ্যভিত্তিক প্রমাণ আছে। এই সময় ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের বহিরাগত নেতাদের আদর্শগত কোন পরিবর্তন ঘটেনি, কিন্তু যে নতুন সংযোজনা হয়েছিল, তা হচ্ছে যে ডজন খানেক শ্রমিক নেতা শ্রমিকদের মধ্য থেকে এসেছিলেন। যেমন কলকাতা বন্দরে ১৯২০/২১ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত 'পোর্টট্রাস্ট অ্যাসোসিয়েশন'

প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন কলকাতা পোর্টট্রাস্টের করণিক। আফতাব আলি, যিনি খিলাফত আন্দোলনের একজন কর্মী হিসেবে কলকাতা বন্দরের ম্যারিন বিভাগের শ্রমিকদের মধ্যে সংগঠনের কাজ শুরু করেছিলেন, তিনি পেশাগতভাবে ছিলেন একজন কর্মচ্যুত সি-ম্যান বা জাহাজ কর্মী। তবে এদের সব থেকে বেশি সংখ্যক ছিলেন ট্রাম শ্রমিকদের সঙ্গে। কিন্তু আশ্চর্যকর ব্যাপার খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলনের সময় (১৯২০-২২ খ্রীষ্টাব্দে) কি খিলাফত কি জাতীয়তাবাদী নেতারা প্রথম পর্যায়ে ডক শ্রমিকদের মধ্যে সংগঠনের কাজ শুরু করার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করলেও শেষপর্যন্ত তাঁরা সংশ্লিষ্ট শ্রমিকদের তেমন বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করতে পারেননি। অবশ্য গান্ধী পরিচালিত জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ঢেউ ডক শ্রমিকদের গায়েও কম লাগেনি। এরই প্রভাবে দিন মজুরীর এই ডকশ্রমিকরা কাজ বন্ধকরে বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধে বারবার প্রতিবাদ জানিয়েছে। এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৪ই ডিসেম্বর ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দ, বর্তমান সুভাষ ডকে ৫০০০ শ্রমিক গান্ধী টুপি পরে বোর্ডের ওপরে বসে জাহাজে মাল বোঝাইয়ের কাজ করছিল। ঐ কাজ পরিদর্শনরত জাহাজ কোম্পানীর জনৈক ইউরোপীয়ান অফিসার জোর করে একজন শ্রমিকের মাথা থেকে গান্ধী টুপি খুলে দেন। এর প্রতিবাদে সঙ্গে সঙ্গে ঐ ৫০০০ শ্রমিক কাজ বন্ধ করে হরতাল ঘোষণা করে। হরতাল স্ফতস্ফূর্ত হলেও বা তাৎক্ষণিক হলেও হরতালকারীরা কিন্তু এ-ব্যাপারে একেবারে অনভিজ্ঞ ছিল না। কারণ তারা হরতালের নির্দিষ্ট দাবী দাওয়া পেশ করেছিল। ঐ দাবীগুলির মধ্যে ছিল প্রথমত, চিত্তরঞ্জন দাশকে জেল থেকে মুক্তি দিতে হবে। দ্বিতীয়ত তারা গান্ধী টুপি মাথায় দিয়ে কাজ করবে এবং কাজের মাঝে মাঝে তাদের 'গান্ধী মহারাজ কি জয়' এই শ্লোগান দেবার অধিকার দিতে হবে।

এই পর্যায়ের অর্থাৎ, বিগত শতাব্দীর বিশের দশকে, শ্রমিক আন্দোলনের একটি বড় বৈশিষ্ট ছিল ধর্মঘটের মধ্যেই আন্দোলন সীমাবদ্ধ ছিল না, তার ফলশ্রুতি হিসেবে স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে অনেকগুলি শ্রমিক ইউনিয়ন স্থাপিত হয়েছিল, এবং কলকাতা পোর্টট্রাস্ট-এর নিযুক্ত করনিক গোষ্ঠী এ ব্যাপারে এগিয়ে ছিল। কিন্তু এ ব্যাপারে ব্যতিক্রম ছিল বন্দর শ্রমিকরা। এই পর্যায়ে এদের মধ্যে সংগঠন গড়ে না ওঠার সম্ভাব্য দুটি কারণ ছিল। প্রথমটি হচ্ছে, এই সময় থেকেই ডক শ্রমিকদের সঙ্গে বহিরাগত জাতীয়তাবাদী শ্রমিক নেতাদের সঙ্গে, আদর্শগত ভাবে ফারাক গড়ে উঠতে শুরু করেছিল। বহিরাগত নেতারা অনেকেই শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে ধারাবাহিকভাবে যুক্ত না থাকার জন্যে শ্রমিকদের চেতনার স্তর সম্বন্ধে তাঁরা যথেষ্ট অবহিত ছিলেন না। গান্ধী সম্বন্ধে প্রচার করতে গিয়ে গান্ধীর আদর্শের তুলনায় তাঁর সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের উপমা প্রচারের ওপর বেশী জোর দেওয়া হত। শ্রমিকদের বা কৃষকদের

চেতনার স্তর অনুযায়ী এই ধরনের প্রচারের প্রতিক্রিয়া এক এক জায়গায় এক এক রকম হত। অধ্যাপক সুমিত সরকারের বিস্তারিত অনুসন্ধান প্রমাণ করেছে এই ধরনের প্রচার আদিবাসী কৃষক এবং চটকলের নিপুণ অদর্শক শ্রমিকদের কাছে খুবই গ্রহণযোগ্য হয়েছিল। ডক শ্রমিকদের মধ্যে সংগঠন না গড়ে ওঠার অন্য বা দ্বিতীয় কারণটি স্টিভেডরদের প্রতি জাতীয় নেতাদের স্পর্শকাতরতা।

স্টিভেডরদের প্রতি স্পর্শকাতরতা কাটিয়ে উঠে স্বরাজ্য দলের ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী কিশোরীলাল ঘোষ প্রথম ডক শ্রমিকদের মধ্যে ইউনিয়ন স্থাপনের ব্যাপারে সচেষ্ট হন। এই দিকে দিয়ে হিসেব করলে তিনি অবশ্যই ব্যতিক্রমী চরিত্র; পেশায় তিনি আইন ব্যবসায়ী ছিলেন। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর বিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে নিজের পেশা ভুলে গিয়ে তিনি দিনের পর দিন ডক শ্রমিকদের বস্তিতে শ্রমিকদের মধ্যে প্রায় এককভাবে কাজ শুরু করেছিলেন। এই সময় অবশ্য সাধারণভাবে স্বরাজ্যদলের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ব্যাপারে তল্পী গোটাতে হয়েছিল। কারণ ১৯২২-২৩-এর পর শিল্পের বাজারে মন্দাবস্থা দেখা দিয়েছিল।

শিল্প দ্রব্যের চাহিদা কমায় আগের মত শ্রমিকদের আর মালিক পক্ষের সঙ্গে দর কষাকষির সুযোগ ছিল না। এর ফলে স্বরাজ্য দলের ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীদের অধিকাংশ ক্ষেত্রে ধর্মঘটী শ্রমিকদের দাবী-দাওয়া আদায়ে ব্যর্থ হতে হয়েছিল। এইভাবে শ্রমিকদের কাছে তারা বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়েছিল।

অবশ্য বন্দরের অবস্থা ছিল বিপরীতধর্মী। চট শিল্পে ভাটা পড়লেও ভারত থেকে কাঁচা পাটের রপ্তানি বহুগুণ বেড়ে গিয়েছিল, ইতিমধ্যে ইউরোপে অনেক স্থানে চটশিল্পের কারখানা স্থাপিত হয়েছিল। কলকাতা বন্দরের পশ্চাৎপট ছিল ৮০,০০০ কিঃমিঃ দীর্ঘ এবং খনিজ সম্পদ, কৃষিজ সম্পদ ও শিল্প সম্পদ সমৃদ্ধ পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্র নেপাল ও ভুটান ছিল এই পশ্চাৎপটের অন্তর্ভুক্ত। অতএব শিল্পের সুদিন না থাকলেও তুলনাগত ভাবে বন্দর ব্যস্তই বা কর্ম মুখর ছিল। এই প্রেক্ষিতে দৈনিক মজুরী ভিত্তিতে নিযুক্ত ডক শ্রমিকদের মধ্যে কিশোরীলাল ঘোষ শ্রমিক সংগঠনের কাজ শুরু করেন। ডক শ্রমিকদের মধ্যে অর্থনৈতিক বঞ্চনা জনিত ক্ষোভ তিনি লক্ষ্য করেছিলেন। দৈনিক মজুরির ভিত্তিতে নিয়োগ থেকে শুরু করে গ্যাঙ ভিত্তিকভাবে তাদের দ্বারা কাজ করানো ইত্যাদি প্রতিটি ক্ষেত্রেই ছিল নানা ধরনের শ্রমিকের বাজার বহির্ভূত অনিয়ম। ঘাট-সর্দারদের অধীন প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশী পরিমাণ শ্রমিক থাকত। যত দক্ষ শ্রমিকই হোক না কেন কাজ পেতে গেলে শ্রমিকদের ঘাট সর্দারদের দস্তুরী দিতে হত। জাহাজের মালিকরা ব্যক্তি বিশেষকে নয়, ১২ জনকে নিয়ে তৈরী লেবার গ্যাঙকে মজুরী দিত।

এই ক্ষেত্রে ঘাট সর্দাররা কম মজুরী দিয়ে তাড়াতাড়ি কাজ উঠিয়ে নেওয়ার জন্য নিয়ম বহির্ভূতভাবে বেশী সংখ্যক শ্রমিক নিয়ে গ্যাঙ তৈরী করত। ফলে শ্রমিকদের প্রাপ্য মজুরীর পরিমাণ কমে যেত। এবাদে এক একজন স্টিভেডর এক একরকম মজুরী দিতেন। আবার তাদের প্রদান করা মজুরী শ্রমিকদের দেওয়ার ব্যাপারে ঘাট সর্দাররা যে কারচুপি করত তা তারা জেনেও কোন ব্যবস্থা নিতেন না। অর্থাৎ শ্রমিকরা এইভাবে বাজার বহির্ভূতভাবে শোষিত হত। অর্থনৈতিক বঞ্চনা ছাড়াও শ্রমিকদের আরও ক্ষোভের কারণ ছিল। এখানে শ্রমিকদের একটা বড় অংশ যেহেতু দক্ষ ছিল এবং অনেকেই যেহেতু উচ্চ বর্ণ থেকে এসেছিল তাই তাদের চটকলের বা কলকাতা বন্দরের অন্যান্য বিভাগে নিযুক্ত অদক্ষ শ্রমিকদের তুলনায় মর্যাদা বোধ অনেক বেশী ছিল। বস্তির নোংরা পরিবেশ এবং মালিক পক্ষ থেকে শুরু করে ঘাট সর্দার সকলের তরফ থেকে শ্রমিকদের 'কুলি' বলে সম্বোধন তাদের নিকট অত্যন্ত অপমানজনক বলে মনে হত। স্বতঃস্ফূর্তভাবে এইসব নিয়ে তারা অনেকবার প্রতিবাদ জানিয়েছে কিন্তু বিশেষ কোন ফল হয়নি। কিশোরীলাল ঘোষের প্রাথমিক প্রয়াস ছিল শ্রমিকদের সংগঠিত করে দাবি দাওয়া আদায়ের জন্য একই সঙ্গে পোর্ট কর্তৃপক্ষ ও স্টিভেডরদের ওপর চাপ সৃষ্টি করা এবং এটা করতে হলে শ্রমিকদের যে নিজস্ব ইউনিয়ন থাকতে হবে এবং মালিক পক্ষের সঙ্গে কোনরকম সমঝোতায় না এনে, দাবি দাওয়া আদায়ের জন্য ধর্মঘট করতে হবে এটা ডক শ্রমিকদের বোঝাতে শ্রীঘোষ সক্ষম হয়েছিলেন। সেই অনুসারে ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ডক শ্রমিক ইউনিয়ন গঠিত হয়। সাংবাদিক এবং বি.পি.টি.ই.সি.-র সদস্য মৃণাল কান্তি বোস এই ইউনিয়নের প্রথম প্রেসিডেন্ট মনোনীত হন।

উপরোক্ত ইউনিয়নটি গঠিত হবার পরই ডক শ্রমিকদের ধর্মঘট শুরু করা সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই ধর্মঘটের দাবিগুলিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় সরাসরি পোর্ট কর্তৃপক্ষের কাছে কিন্তু দাবী করা হয়েছিল, যেমন কাজের পরিবেশ উন্নত করা, আর কিছু দাবি স্টিভেডরদের কাছে করা হয়েছিল যেমন কাজ পাওয়ার জন্য ঘাট সর্দারদের যে দস্তুরী দিতে হত তার অবসান, প্রভিডেন্ট ফান্ড ও স্বাস্থ্য সম্মত বাসস্থানের ব্যবস্থা ইত্যাদি। সর্বোপরি, শ্রমিকদের 'কুলি' এই অপমানজনক সম্বোধন করা চলবে না। ধর্মঘট কয়েকদিন চলার পর শুধুমাত্র প্রতিশ্রুতি আদায়ের ভিত্তিতে, এই পর্যায়ের ধর্মঘটের অবসান হয়। অবশ্য অদূর ভবিষ্যতে বন্দর কর্তৃপক্ষ যে এব্যাপারে নড়েচড়ে বসেনি তা অন্যভাবে প্রমাণিত হয়। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা ILO ডকের শ্রমিকদের জন্য নিরাপত্তামূলক আইন পাশের উদ্দেশ্যে UNO এর অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির বন্দর কর্তৃপক্ষের মতামত আহ্বান করে। অন্যান্য দেশের সঙ্গে ভারতবর্ষের বোম্বাই ও মাদ্রাজ বন্দর কর্তৃপক্ষ ইতিবাচক সাড়া দিলেও, কলকাতা বন্দর কর্তৃপক্ষের

সাড়া ছিল সম্পূর্ণ নেতিবাচক। এই সম্পর্কে বন্দর কর্তৃপক্ষের যুক্তি ছিল "এখানকার শ্রমিকরা অশিক্ষিত এবং অসংগঠিত, অতএব প্রস্তাবিত নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাকে তাদের কাছে শাস্তিমূলক মনে হবে এবং শ্রমিক অসন্তোষ বাড়বে"। (.... **For example, Indian dock labourers is without a safety sense, and on that account will incure risks, which the corresponding worker in the west would instinctively avaid".**

কিশোরীলাল ঘোষের কর্মকান্ড এবং কর্ম পদ্ধতি কোনটাই উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি এড়ায়নি। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে 'মিরাট ষড়যন্ত্র মামলা' শুরু করার জন্য কলকাতাসহ ভারতবর্ষের অন্যান্য শিল্পাঞ্চল থেকে যাদের ধরা হয় তাদের মধ্যে দুইজন অ-কমিউনিস্ট ট্রেড ইউনিয়ন নেতা ছিলেন, যথা কিশোরীলাল ঘোষ ও শিবনাথ ব্যানার্জী।

১৯২৭/২৮ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার প্রাদেশিক কংগ্রেস সংগঠনের নিজস্ব অর্ন্তদ্বন্ধ, কংগ্রেস প্রাদেশিক কমিটির ওপর কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীর অতিমাত্রায় প্রভাব বিস্তার, শিল্পে মন্দা, সব মিলিয়ে বাংলায় নৈরাশ্যজনক রাজনৈতিক পরিস্থিতি হয়েছিল। খিলাফত আন্দোলনে যোগদানকারী মোল্লা/মৌলভীদের একটি দল গ্রামে গঞ্জে ও শিল্পাঞ্চলে ভ্রাম্যমান অবস্থায় খুব সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। বিপরীত ভাবে, বড়বাজারের মাড়োয়ারী ব্যবসায়ী, অন্যন্য হিন্দু ব্যবসায়ী ও জমিদারদের সাহায্যপুষ্ট হয়ে হিন্দু মহাসভার কর্মীরাও সমপরিমাণ সক্রিয় ছিল, শিল্পাঞ্চলে হিন্দু শ্রমিকগণ কর্তৃক গোহত্যা বা কোরবাণী বন্ধ, প্রতিবাদে মসজিদের পাস দিয়ে হিন্দুদের বাজনা বাজিয়ে যাওয়ায় মুসলিম শ্রমিকদের প্রতিরোধ ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা, এই নিয়ে দাঙ্গা হাঙ্গামার অন্ত ছিল না। সমকালীন দুইজন মুসলিম সাম্প্রদায়িক নেতা, ইউসুফ আরিফ ও অধ্যাপক আবদুল্লা সুরাবর্দী সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে শ্রমিকদের সংগঠিত করতে গিয়ে প্রথম ডকে গিয়ে বাধার সম্মুখীন হলেন। ডক ওয়ার্কার্সদের বস্তি এলাকাতে আন্দোলন গড়ে তুলতে গেলে ডক শ্রমিকরা তাঁদের স্পষ্ট ভাবে জানিয়েছিল, তারা প্রথমে খাওয়া ও পরবার সংস্থান চায়।

১৯২৭-এ ডকে শ্রমিক আন্দোলনে পালা বদলের পালা। এই সময় থেকেই ডক শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করার উদ্দেশ্য নিয়ে বামপন্থীরা এগিয়ে আসেন। বেঙ্গল পেজান্টস ও ওয়ার্কার্স পার্টির এক দল কর্মী (পরে শ্রমিকদের মধ্যে কাজ বেড়ে গেলে পার্টির নাম পরিবর্তন করে বেঙ্গল ওয়ার্কার্স ও পেজান্টস পার্টি করা হয়) কলকাতা বন্দর শ্রমিকদের মধ্যে সাংগঠনিক কাজ শুরু করে, আর এর থেকে শ্রমিকরা "চেতনাবোধের পুরনো কাঠামো থেকে বেরিয়ে এসে সন্ধান পায় অগ্রসর তত্ত্বের"। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে 'ট্রেড ইউনিযন এ্যাক্ট্' পাশ হবার পর থেকে বহিরাগতদের শ্রমিক ইউনিয়নে ঢোকা

আইনসিদ্ধ হয়। এই সময় বিদেশী পুঁজিতে গড়ে ওঠা বাংলার শিল্পাঞ্চলে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন পরিচালনার জন্য ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টির কয়েকজন কর্মীকে কলকাতায় পাঠানো হয় এবং তাঁদের পছন্দমত বা অভিজ্ঞতা অনুযায়ী তারা শিল্প সংস্থায় কাজ শুরু করেন। এ ব্যাপারে ঐ গোষ্ঠীর অন্যতম সদস্য ফিলিপ স্প্রাট এর প্রথম পছন্দ ছিল কলকাতা বন্দর। এই সঙ্গে পেজান্টস ও ওয়ার্কার্স পার্টির সদস্যদের মধ্যে ছিলেন মুজাফ্ফর আহমেদ (পরে যিনি কমিউনিস্ট পার্টিতে কাকাবাবু বলে পরিচিত হন), ধরণী গোস্বামী ইত্যাদি। এই সময় বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়ন গোষ্ঠী সমস্ত রকম যানবাহন সংস্থায় নিযুক্ত স্থায়ী ও অস্থায়ী শ্রমিকদের সংগঠিত করার পরিকল্পনা করেছিল। ডকে সংগঠন ছিল এই পরিকল্পনার অংশ বিশেষ। এখানকার সাংগঠনিক কাজকর্মের কিছু বৈচিত্রও ছিল। সাধারণভাবে বন্দরগুলিতে ম্যারিন ও ডক এই দুই বিভাগের মধ্যে কোন প্রশাসনিক প্রাচীর থাকে না। কিন্তু ঔপনিবেশিক আমলে কলকাতা বন্দরে ছিল। দুটি বিভাগের শ্রমিকরাই ছিল কম বেশী পরিমাণে দক্ষ। ম্যারিন বিভাগের শ্রমিকরা ছিল স্থায়ী এবং ডকের শ্রমিকরা প্রথমত অস্থায়ী, দ্বিতীয়ত বেসরকারী মালিকানাধীন। এই বাধা অপসারণের জন্য বামপন্থীরা একই সঙ্গে শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ করার কাজ শুরু করেন। কিন্তু কাজটা সহজসাধ্য ছিল না। প্রথমত, এব্যাপারে যথেষ্ট পরিমাণে প্রশাসনিক বাধা ছিল। ম্যারিন বিভাগ সরাসরি পোর্ট কমিশনারের অধীন হওয়ায় এখানে সরকারী হস্তক্ষেপ অনেক বেশী ছিল। আপাত দৃষ্টিতে ম্যারিন বিভাগে শ্রমিকের নিয়োগ বিজ্ঞাপন-এর মাধ্যমে হলেও, প্রকৃতপক্ষে এটা বংশ পরম্পরায় একই পরিবার থেকে করা হত। এতে শ্রমিকেরা অনেক বেশী পরিমাণে মালিক পক্ষের প্রতি অনুগত থাকত। অধুনা বাংলাদেশের চট্টগ্রামের কয়েকটি নির্দিষ্ট পরিবার থেকে বংশ পরম্পরায় ম্যারিন বিভাগের শ্রমিকরা আসত। ম্যারিন বিভাগের শ্রমিক সংগঠনের ব্যাপারে দ্বিতীয় বাধা ছিল অবস্থানগত। কলকাতা বন্দর লন্ডন বন্দরের মত নদী বন্দর। সমুদ্র থেকে অর্থাৎ, স্যান্ডহেড থেকে কলকাতা বন্দরের দূরত্ব ২৩২ কিঃমিঃ। এই দূরত্বের কারণে মেরিন বিভাগের শ্রমিকদের কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা হত, এই সব জায়গায় শ্রমিকদের থাকার জন্য কোন স্থায়ী ব্যবস্থা না করে অস্থায়ী মেসের ব্যবস্থা ছিল। এইভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মেরিন বিভাগের শ্রমিকদের সংগঠন করা খুব সহজ কাজ ছিল না। তৃতীয় বা শেষ স্বল্প পরিমাণ বাধা এসেছিল আফতাব আলীর তরফ থেকে। বে-আইনী অস্ত্র ব্যবসায়ের সঙ্গে যুক্ত থাকার অপরাধে আফতাব আলী জাহাজ কোম্পানী থেকে বরখাস্ত হন; এরপর তিনি খিলাফত আন্দোলনে যোগ দেন। অসহযোগ-খিলাফত আন্দোলন অবসানের পর আফতাব আলী ম্যারিন বিভাগে শ্রমিকদের মধ্যে সংগঠনের কাজ শুরু করেন এবং ১৯২৫/২৬-এ বেঙ্গল ম্যারিনস ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি নিজেকে কমিউনিস্ট বলে পরিচয় দিতেন। কিন্তু প্রথম দিকে ট্রেড ইউনিয়ন

আন্দোলনে কমিউনিস্টদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করতে আফতাব আলী এই কারণেই ম্যারিন ও ডক ওয়ার্কার্সদের ইউনিয়নভুক্ত করার কমিউনিস্টদের যে প্রয়াস তা অনেকাংশেই ব্যাহত হয়েছিল।

১৯২৭-এর সমগ্র বছরটা ধরে বামপন্থী কর্মীরা ডক ও ডকের বস্তি এলাকায় এবং ম্যারিন বিভাগের শ্রমিকদের কর্মস্থলের বাইরে অসংখ্য সভা ও সমাবেশ করেন। শ্রমিকদের সাড়া ছিল অসম্ভব রকমের উৎসাহ ব্যঞ্জক এবং ১৯২৮-এর প্রথম দিকেই বহিরাগত কর্মীদের সাহায্যে "পোর্টট্রাস্ট ও ম্যারিনারস্ ইউনিয়ন" গঠিত হয়। বন্দর চত্বরে তো বটেই এমনকি বন্দরের বাইরেও বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দলের বিভিন্ন সভা সমাবেশে নব গঠিত ইউনিয়নের সদস্যরা অংশ গ্রহণ করত। যেমন ১৯২৮-এর মে ডে-এর সমাবেশে তারা অংশগ্রহণ করে। বলা বাহুল্য ঐ সমাবেশে আফতাব আলী পরিচালিত ম্যারিনারস্ ইউনিয়ন উপস্থিত ছিল। একই বছরের ডিসেম্বর মাসে কলকাতাতে কংগ্রেসের বার্ষিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ঐ সমাবেশে শ্রমিকদের তরফ থেকে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি পেশের জন্য ৫০,০০০ শ্রমিকের একটি মিছিল বঙ্গীয় কৃষক প্রজাদল সংগঠিত করেছিল। ঐ ৫০,০০০ শ্রমিকের মধ্যে চটকল বা অন্যান্য সংস্থার শ্রমিকের সঙ্গে ম্যারিন ও ডকের শ্রমিকরাও কিছু সংখ্যক ছিল।

প্রকৃতপক্ষে অনুসন্ধান করে দেখা গেছে শ্রেণী সংগ্রামের তত্ত্ব চটকলের শ্রমিক এবং এমনকি কলকাতা বন্দরের অন্যান্য বিভাগে নিযুক্ত শ্রমিকদের তুলনায় ডক ও ম্যারিন শ্রমিকদের কাছে অনেক বেশী পরিমাণ গ্রহণযোগ্য হয়েছিল। সেই কারণে স্বল্প সময়ের মধ্যে এখানে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা সৃষ্টি হয়েছিল। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রায় সমস্ত প্রধান শ্রমিক নেতার গ্রেপ্তার এবং তার অব্যবহিত পরে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা যে কোন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কাছে বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ ছিল। কমিউনিস্ট কর্মীদের সহযোগিতায় নবগঠিত শিশু ইউনিয়নের পক্ষে এত বড় ধরনের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করা সহজসাধ্য ছিল না। আর মোকাবিলা না করতে পেরে নবগঠিত ইউনিয়নটিকে পুরোপুরি জিইয়ে রাখা সম্ভব হয়নি। এ ব্যাপারে যেটি খুব বড় ধরনের ব্যর্থতার তা ছিল ম্যারিন ও ডক ওয়ার্কার্সদের এক ইউনিয়নভুক্ত করে কলকাতা বন্দরে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের শক্ত ভিত গড়ে তোলার যে ব্যতিক্রমী প্রয়াস নেওয়া হয়েছিল বলা যায় তা প্রায় বিনষ্ট হয়েছিল।

তৃতীয় বা শেষ পর্যায় (১৯৩০ - ৩৪ খ্রীষ্টাব্দ)

১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে শুরু হওয়া, বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দার প্রভাব, ভারতবর্ষে প্রায় ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত অনুভূত হয়েছিলে। অস্বাভাবিক ভাবে সব ধরনের কৃষিপণ্যের

দাম পড়ে যাওয়া এবং একই সঙ্গে অসম্ভব ভাবে শিল্প দ্রব্যের চাহিদা নিম্নমুখী হওয়া — দুইয়ে মিলে খেটে খাওয়া মানুষের দুর্দশার কোন সীমা পরিসীমা ছিল না। সওদাগরি অফিস, বন্দর, কলকারখানা সর্বত্রই, মালিকপক্ষ ব্যাপক ছাঁটাই করে এবং একই সঙ্গে যারা কর্মরত ছিল তাদেরও বেতন কমিয়ে এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করেছিল। এর ফলে দীর্ঘদিন ধরে ট্রেড ইউনিয়ন অফিস গুলির ঝাঁপ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। অবস্থার গুরুত্ব বোঝানোর জন্য তৎকালীন প্রাদেশিক সরকারের Home Secretary W.A. Prentice-এর বক্তব্য উদ্ধৃত করা গেল —

" There are potentialities of trouble but unemployment is so widespread that there is little chance that, those who are at present in employment, would go on strike and give their employers the little chance of replacing them".

অন্য আর একটি সরকারী নথি থেকে জানা যায়, চটকলের শ্রমিকদের আইন অমান্য আন্দোলনে সামিল করার উদ্দেশ্য নিয়ে ১৯৩০ এর শুরু থেকেই, সুভাষচন্দ্র বসু হাওড়া জেলার চটকল অধ্যুষিত অঞ্চলে, শ্রমিকদের মধ্যে সক্রিয় হয়ে ওঠেন। কিন্তু শ্রমিকদের তরফ থেকে কোন প্রকার আগ্রহ প্রদর্শন না করায় তাঁর সব উদ্যোগ শেষ পর্যন্ত বিফলে যায়।

এই সবের প্রেক্ষীতে কলকাতা ও খিদিরপুর ডকে শ্রমিক সংগঠনের কাজ নিয়ে আমরা এবার পর্যালোচনা করব। অর্থনৈতিক মন্দার প্রভাবে ব্যস্ততম কলকাতা বন্দরেও ভাটার টান পড়েছিল! ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত রয়্যাল কমিশন অফ্ লেবার বা হুইটলে কমিশনের প্রতিনিধিরা কলকাতা বন্দর অঞ্চল পরিদর্শনে গিয়ে বিভিন্ন ঘাট সর্দারদের অধীন কাজ পাবার আশায় অতিরিক্ত সংখ্যক ডক শ্রমিকদের সমাবেশ দেখে বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলেন এবং যখন তাঁরা জানতে পেরেছিলেন যে এই অপেক্ষারত শ্রমিকদের কোন রকম ভাল দেওয়া হয় না তখন তাঁরা সত্য সত্যই স্তম্ভিত হয়ে যান। ডকে কর্মরত শ্রমিকদের এই চরম দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থার মধ্যেই, বিগত শতাব্দীর ত্রিশের দশকের শুরুতেই একদল বামপন্থী যুবক ডকে শ্রমিক সংগঠন করার প্রয়াস নেন। এঁদের মধ্যে বীরেশ চন্দ্র গুহ, কিরণ চন্দ্র বসাক ও নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার উচ্চ শিক্ষা সম্পন্ন করে তখন সদ্য বিদেশ থেকে ফিরেছিলেন। বিদেশে শিক্ষা গ্রহণ কালে এঁরা ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টি ও ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্কিত হন। এঁরা ছাড়া আর যারা ছিলেন তাঁরা হলেন প্রমোদ সেনগুপ্ত, শিশির রায়, কমল সরকার এবং শ্রমিক নেতা বিশ্বনাথ দুবে, এঁরাও কিশোরীলাল ঘোষের মত দিনরাত ডক শ্রমিকদের সঙ্গে তাদের বস্তিতে থাকতেন! তবে কিশোরীলাল ঘোষের সঙ্গে তাঁদের যে বড় ধরনের তফাৎ ছিল তা

হচ্ছে, তাঁরা নিয়মিতভাবে খিদিরপুর অঞ্চলে ডক শ্রমিকদের মধ্যে মার্ক্সিস্ট দর্শন বিষয়ক পাঠচক্র গড়ে তুলেছিলেন। এখানে বলে রাখা ভাল যে তখন এই যুবকরা কোন বিশেষ দলের সদস্যপদ গ্রহণ করেন নি।

ঐ মার্ক্সীয় দর্শন প্রচার সংক্রান্ত স্টাডি সার্কেলে কোন ধরনের শ্রমিকরা আসত তা বুঝতে হলে ডক শ্রমিকদের গঠন সম্পর্কে অবহিত হতে হবে। ডকের কাজের ধরন অনুযায়ী সামগ্রিক ভাবে ডকের শ্রমিকরা কিছুটা নিপুণ হলেও নিপুণ ও অ-নিপুণ এই দুই ভাগে ডক শ্রমিকদের ভাগ করা যায়। জাহাজের বোর্ডে বসে যে শ্রমিকরা জাহাজে মাল সাজানো এবং মাল খালাস করে এবং বস্তা বা প্যাকিং করা মাল যারা পিঠে করে বয়ে (heading coolie) মাল রাখার সেডে পৌঁছে দেয় — তারা নিপুণ বা skilled এর পর্যায়ে পড়ে। যেহেতু এই কাজে খুব নিপুণতার প্রয়োজন হত, সেই কারণে কলকাতা বাদে পৃথিবীর সবদেশের বন্দরে ডক শ্রমিকদের জন্য ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা থাকত। বলাই বাহুল্য, ঔপনিবেশিক আমলে কলকাতা বন্দরে এই ধরনের কোন ব্যবস্থা ছিল না। এরা বাদে অন্যান্য শ্রমিক এবং মাংস ও মাংসজাত দ্রব্য বহনের জন্য চামার গোষ্ঠী সবই তুলনাগত ভাবে কম নিপুণ ছিল। প্রথমেই নিপুণ শ্রমিকদের মধ্য থেকে এসেছিল মহম্মদ হুসেন এবং মহম্মদ ইউসুফ। ক্রমান্বয়ে ছাত্র সংখ্যা আরও বাড়তে থাকে। মাদার খান, রোদিয়া এবং চিনিং থেকে জম্বু ও বাসুদেব নামে দুজন উড়িয়া শ্রমিক আলোচনা চক্রে এসে যোগ দেয়। পরে যারা এসেছিলেন তাদের মধ্যে সবথেকে বেশী উল্লেখযোগ্য পেশোয়ার বা আবদুর রহমান খান। এদের অনেকেই শেষপর্যন্ত ডক ইউনিয়নের সর্বক্ষণের কর্মীতে রূপান্তরিত হয়েছিল। শ্রেণী সংগ্রামের তত্ত্ব ছাড়াও শ্রমিকদের মন্দাজনিত পরিস্থিতিতে যে সব সমস্যার উদ্ভব হয়েছিল এবং বাসস্থানগত সমস্যা নিয়েও ডক শ্রমিকরা খিদিরপুর অঞ্চলে যে সমস্ত বস্তিতে বাস করত সেখানে প্রচার চালানো হত। হুইটলে কমিশন এর তরফ থেকে ডক শ্রমিকদের জন্য আর্থিক ও বাসস্থানগত উন্নতির জন্য বেশ কিছু কথা বলা হয়েছিল। কাজ পাবার জন্য অপেক্ষারত বেকার শ্রমিকদের ডোল দেবার কথাও বলা হয়। বন্দর কর্তৃপক্ষ এবং স্টিভেডরদের ওপর উপরোক্ত সুবিধাগুলি প্রদানের জন্য চাপ সৃষ্টির জন্য বস্তিতে বস্তিতে ব্যাপক প্রচার শুরু হয়। শ্রমিকদের তরফ থেকে বিপুল সাড়া মেলে। তারই ফলশ্রুতি হিসেবে ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে খিদিরপুরের বাবুবাজারে ৪/১ কৈলাস রোডে ডক শ্রমিকদের ডক মজদুর ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা হয়। প্রথম প্রেসিডেন্ট হন নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার, বহিরাগতদের সঙ্গে মহম্মদ ইউসুফ এবং মহম্মদ হুসেন ইউনিয়নের সদস্য হন। এবং পাশাপাশি প্রধানত উপরোক্ত ইউনিয়নটিকে মূলধন করে লেবার পার্টিরও জন্ম হয়। ডক শ্রমিক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত বহিরাখণ্ড কর্মীরা এবং তাদের সঙ্গে যুক্ত শ্রমিকরা প্রথম উপরোক্ত দলের সদস্যভুক্ত হন। আর এই সব এত

দ্রুত হওয়ার জন্য সংগঠকদের নিরলস প্রয়াস ছাড়াও সামগ্রিকভাবে পরিবেশও অনুকূলে ছিল।

১৯৩৩-এর মাঝামাঝি সময় থেকে মন্দাবস্থা ক্রমান্বয়ে কেটে যাওয়ায় বন্দরের কর্মব্যস্ততা বাড়ছিল। ফলে স্বাভাবিকভাবে ডক শ্রমিকদের কর্মসংস্থানও বাড়ছিল। কিন্তু মন্দাবস্থা চলাকালীন জাহাজ কোম্পানীগুলি এবং স্টিভেডররা যে মজুরী হ্রাস করেছিলেন তাতে পরিবর্তন আনার কোন লক্ষণ দেখা যায় নি। সাধারণভাবে জাহাজ কোম্পানীগুলি ১০০ টন মাল তোলা বা খালাস করার জন্য স্টিভেডরদের ৪০ টাকা দিত। স্টিভেডরদের তরফ থেকে ঘাট সর্দারদের গ্যাঙ পিছু ১২ টাকা দেওয়া হত। মন্দাবস্থা চলাকালীন সময়ে কলকাতা বন্দরে শ্রমিকদের শতকরা ১০ভাগ মজুরী কমেছিল। অনুমান করা যায় তার প্রভাব অবশ্যই ডকে পড়েছিল। এই কারণে শ্রমিকদের মধ্যে প্রবল ক্ষোভ এবং দাবি-দাওয়া আদায়ের প্রয়োজনে ইউনিয়ন গড়ে তোলার জন্য আগ্রহ স্বাভাবিক ছিল। আর এইসব কারণের জন্যই বোধহয় ইউনিয়ন স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে ডক শ্রমিকদের সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়। সরকারী নথিতে বলা হয়েছে "Present trouble (Strike of 1934) dates from registration of 'Port and Dockworkers Union' on March, 1934." ধর্মঘটের দাবি-দাওয়া অর্থনৈতিক বিষয়ের মধ্যে প্রায় সীমাবদ্ধ হলেও তার মধ্যে সময় অনুযায়ী যথেষ্ট বৈচিত্র ছিল। যেমন দৈনিক মজুরী বৃদ্ধিই শুধু দাবি ছিল না, দিনের শিফ্‌টের তুলনায় রাতের শিফ্‌টের জন্য, বেশী পরিমাণ মজুরীর কথা বলা হয়েছিল। মজুরী বৃদ্ধির দাবির সঙ্গে কাজের পদ্ধতিগত কিছু পরিবর্তন চাওয়া হয়েছিল। বিরামহীন কাজের বদলে এক ঘন্টা টিফিন সহ আট ঘন্টা কাজের দাবি করা হয়। এই সঙ্গে আগের নিয়মে প্রতিটি ক্রনের জন্য ১২ জনের একটি গ্যাঙ নিয়োগ করার যে ব্যবস্থা ছিল, সেই ব্যবস্থা পরিবর্তন করে দুটি গ্যাঙ নিয়োগের দাবি করা হয়। কিন্তু ধর্মঘটের প্রস্তুতি চলাকালীন সময়ে প্রাদেশিক সরকারের তরফ থেকে ইউনিয়নের প্রতি একটি বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেওয়া হয়। সরকার হঠাৎ করে ১৯৩৪-এর সেপ্টেম্বর মাসে কমিউনিস্ট পার্টি এবং তার সবরকম গণসংগঠন গুলিকে বে-আইনী ঘোষণা করে। লেবার পার্টিকে বে-আইনী ঘোষণা না করলেও সেই পার্টি পরিচালিত উপরোক্ত ইউনিয়নটিকে বে-আইনী ঘোষণা করে। এতে ডকের সাধারণ ধর্মঘট আটকানো না গেলেও ধর্মঘট চালানোর ব্যাপারে ইউনিয়নের অনুপস্থিতি অবশ্যই একটি বড় ধরনের ধাক্কা ছিল।

১৯৩৪-এর ২৬-এ নভেম্বর লেবার পার্টির তরফ থেকে কলকাতা ও খিদিরপুর ডকে একটি সর্বাত্মক ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়।

ধর্মঘটের অবসান ঘটে ১৭ই ডিসেম্বর ১৯৩৪এ, অর্থাৎ দীর্ঘ ২১ দিন ধরে কলকাতা ও খিদিরপুর ডকে সাধারণ ধর্মঘট চলেছিল। মন্দা-পরবর্তী পরিস্থিতিতে এটা অবশ্যই ছিল একটি ব্যতিক্রমী ঘটনা। বন্দর কর্তৃপক্ষ নিজেই স্বীকার করেছিল - "The first day of strike loading and unloading ceased completely throughout the port".

"ডকে ধর্মঘট শুরু হবার পরে দেশের রাজনৈতিক মহল, সংবাদপত্র এবং আমজনতার তরফ থেকে ধর্মঘটী শ্রমিকদের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন এবং ধর্মঘট তহবিলে অর্থ যোগান দিয়েছিল। ৩০এ নভেম্বর 'The Times of India' ধর্মঘট ডাকার জন্য কমিউনিস্টদের সমালোচনা করলেও, লিখেছিল "Workers' demands were just and primarily economic in origin."

বন্দর কর্তৃপক্ষ স্টিভেডর এবং জাহাজ কোম্পানীর মালিকরা বিভিন্নভাবে ধর্মঘটের মোকাবিলা করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। বাইরে থেকে আমদানী করা বা স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত শ্রমিকদের সাহায্যে ডকের কাজ চালু রাখার প্রয়াস নেওয়া হয়। Master Stevelor Union এবং বিভিন্ন জাহাজ কোম্পানীর প্রতিনিধিদের তরফ থেকে বার বার ঘোষণা করা হয় ধর্মঘটের অবসান ঘটিয়ে কাজে যোগ দিলে শ্রমিকদের দাবি দাওয়া মেনে নেওয়া হবে। মালিক পক্ষের এই সব প্ররোচনা ধর্মঘট ভাঙ্গার পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। শ্রমিক ঐক্য ভাঙার জন্য শেষ পর্যন্ত সাম্প্রদায়িকতার আশ্রয় নেওয়া হয়। মালিক পক্ষের মদতপুষ্ট হয়ে সৈয়দ সুরাবর্দী, যিনি পেশায় ছিলেন একজন প্রখ্যাত আইনজীবী এবং আগেই উল্লেখ করা হয়েছে ১৯৩৭ এ বাংলায় ফজলুল হক্ মন্ত্রীসভার শ্রমবিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী, 'ক্যালকাটা ডকার্স ইউনিয়ন' নামে একটি সাম্প্রদায়িক ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথম দিকে ইউনিয়নটি প্রকৃত অর্থেই কাগজে ইউনিয়ন ছিল।

১৩ই ডিসেম্বর কলকাতা ময়দানে জনসমাবেশে শ্রমিকদের তরফ থেকে ধর্মঘটের মীমাংসার জন্য একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ Arbitration Board গঠনের জন্য সরকারের কাছে আবেদন জানানো হয়। শ্রমিকদের তরফ থেকে প্রস্তাবিত Board-এর সদস্য হিসেবে যাঁদের নাম করা হয়েছিল, তাঁদের মধ্যে ছিলেন যথাক্রমে, বিজ্ঞান আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ডঃ নিবেসচন্দ্র সেনগুপ্ত, এন.কে.বোস, পি. ব্যানার্জী, ডঃ আর আহমেদ, মৌলভী ফজলুল হক্ এবং মহম্মদ ফজলুল্লা। কিন্তু মালিক পক্ষের তরফ থেকে ঐ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হয়।

শেষ পর্যন্ত প্রাদেশিক সরকার নিজে উপযাজক হয়ে একটি Arbitration Committee গঠন করে। এই কমিটিতে একদিকে ছিল স্টিভেডর ও জাহাজ কোম্পানী

গুলির প্রতিনিধি এবং অন্যদিকে ছিল বে-আইনী বলে ঘোষিত ইউনিয়ন-এর প্রতিদ্বন্দ্বী Calcutta Dockers Union-এর প্রতিনিধি। এটাই ঔপনিবেশিক আমলে শ্রমিক ধর্মঘট মীমাংসায় প্রথম সরকারী হস্তক্ষেপ। এবং এখন থেকে এটাই রেওয়াজ হয়ে দাঁড়ায়। যে সব দাবি-দাওয়া পূরণের ভিত্তিতে ধর্মঘটের অবসান হয়েছিল তা ছিল যথাক্রমে - (১) দৈনিক মজুরী ১টাকা থেকে ১ টাকা ১২ আনা করা হয় (২) প্রতিদিন কাজের মধ্যে আধ-ঘন্টা বিরতির আশ্বাস (৩) ঘাট সর্দারদের অধীন স্থায়ী শ্রমিকদের দল থেকে ধর্মঘটের কারণে যে সমস্ত জঙ্গী শ্রমিকদের দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল তাদের পুনর্বহাল করা এবং (৪) অ-নিয়মিত কাজের ঘন্টাকে নিয়মিত করার প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়েছিল।

ধর্মঘটের দাবিপত্র এবং ধর্মঘট অবসান সংক্রান্ত মালিক পক্ষের প্রতিশ্রুতিপত্র যদি প্রথমটির সঙ্গে দ্বিতীয়টির তুলনা করা যায় তাহলে দেখা যায় মালিক পক্ষের তরফ থেকে শ্রমিকদের কোন দাবিই কিন্তু পুরোপুরি মানা হয় নি। আর শ্রমিকদের অর্থনৈতিক দাবি-দাওয়া যথার্থ ভাবে আদায় না করেই ধর্মঘটের পরিসমাপ্তি হওয়ায় শ্রমিক বিক্ষোভের পরিসমাপ্তি হয় নি। এত অবশ্যই লাভবান হয়েছিল মালিকপক্ষের মদতপুষ্ট বিরোধী ইউনিয়নটি। বাজার বহির্ভূতভাবে শ্রমিকদের আর্থিক সুযোগ-সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে শ্রমিকদের এই সাম্প্রদায়িক ইউনিয়নের সদস্যভুক্ত করা এবং ক্রমান্বয়ে সংখ্যা বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছিল। আর এই ধরনের ইউনিয়নগুলির উপস্থিতিতেই ১৯৩৭-এ শ্রমমন্ত্রী হবার পর সুরাবর্দীর পক্ষে BPTUC-এর প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে এই প্রদেশে সাম্প্রদায়িক ইউনিয়নগুলির কেন্দ্রীয় কমিটি NFTUC স্থাপন করা সম্ভব হয়েছিল।

১৯৩৪ এর কলকাতা বন্দরের ডক শ্রমিকদের সাধারণ ধর্মঘটের অবশ্যই ইতিবাচক দিকও ছিল। ঐ রকম একটি প্রতিকূল অবস্থায়, অর্থাৎ মন্দার পরে সবে যখন ডকের ব্যস্ততা বাড়তে শুরু করেছে, তখন দীর্ঘ ২১ দিন ধরে সাধারণ ধর্মঘট চলা কিন্তু খুব সহজ ব্যাপার ছিল না; এই সঙ্গে শ্রমিকদের ব্যক্তিগতভাবে ধর্মঘটে অংশ গ্রহণ ছিল আর একটা উজ্জ্বল দিক। ভিন্ প্রদেশ থেকে আসা এই প্রদেশের অন্যান্য শিল্প ও বন্দর শ্রমিকরা দল বেধে প্রতিবছরেই মার্চ থেকে মে মাস পর্যন্ত দেশে 'খেতি করতে' অর্থাৎ চাষ করতে যে চলে যেত তা আগেই বলা হয়েছে। ট্রাম শ্রমিকদের সম্পর্কে গবেষণা প্রসঙ্গে দেখা গেছে স্থায়ী বিভাগীয় শ্রমিক মাসিক মাহিনা থেকে কাটা বা পদোন্নতি রোধ ইত্যাদি, দেশে যাওয়ার ব্যাপারে কোন কিছুই তোয়াক্কা করত না। স্বাধীনতাপূর্ব চটকলে অনুষ্ঠিত বড় বড় ধর্মঘটের ধারাবাহিক হিসেবে দেখা গেছে অধিকাংশ ধর্মঘটই উপরোক্ত মাসগুলিতেই অর্থাৎ, মার্চ থেকে মে, সংঘটিত হত। আর এর থেকেই শ্রমিক ইউনিয়নের বহিরাগত নেতাদের তরফে ধর্মঘট চলাকালীন

সময়ে মিলের গেট পাহারা দেবার একটা রেওয়াজ গড়ে উঠেছিল। এই ধরনের ব্যবস্থা যে শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে শ্রেণীচেতনা সৃষ্টিতে বাধা ছিল তা বলাই বাহুল্য। ডকে ধর্মঘটের আরও একটি ইতিবাচক দিক, বহিষ্কৃত জঙ্গী শ্রমিকদের স্থায়ী গ্যাঙে পুনঃস্থাপন এবং অচিরেই ঐ সব জঙ্গী শ্রমিকদের অনেকেই জঙ্গী ইউনিয়ন-এর পরিচালক সমিতিতে উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিল। ঔপনিবেশিক সরকার ভারতীয় কমিউনিস্ট দলকে ১৯৩৪ এ বে-আইনী বলে ঘোষণা করেছিল। দীর্ঘদিন পর, ১৯৪২-এ অর্থাৎ ভারতীয় কমিউনিস্ট দল ছয় মাস ধরে অনেক বাক্ বিতণ্ডার পর যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে জন বলে স্বীকৃতি দিয়েছিল, তখন সরকার তাদের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়। এই দীর্ঘ সময় কমিউনিস্টরা লেবার পার্টি এবং অবশ্যই জাতীয় কংগ্রেসকে তাদের রাজনৈতিক মঞ্চ হিসাবে ব্যবহার করতে বাধ্য ছিল। সুতরাং ১৯৩৪ এর বন্দর শ্রমিকদের সাধারণ ধর্মঘট যে বেঙ্গল লেবার পার্টিকে বাংলা তথা ভারতীয় রাজনীতিতে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিল তা বলাই বাহুল্য। ধর্মঘটের ফলাফলের আরও একটি ইতিবাচক দিক হিসেবে বলা যায় যে, ডকের গণ্ডি ছাড়িয়ে বন্দরের অন্যান্য বিভাগীয় কর্মীদের ওপরও প্রভাব ফেলেছিল।

প্রথম দিকে কলকাতা বন্দরের করণিকদের সংগঠিত করার জন্য একজন খৃষ্টান মিশনারী এগিয়ে এলেও পরে করণিকদের নিজেদের প্রয়াসে ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে তাদের একটি নিজস্ব সংগঠন স্থাপিত হয়েছিল। একথা অবশ্য আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। ১৯৩৪-এর আগে পর্যন্ত এটা নিছক ভাবে করণিকদের ইউনিয়ন ছিল। ঔপিনিবেশিক আমলে কমারশিয়াল হাউসগুলিতে করণিকের নিয়োগের ব্যাপারে ইউরোপীয়ান মালিক পক্ষের অনেক ছুৎমার্গ ছিল, উচ্চ বর্ণের হিন্দু সম্ভ্রান্ত পরিবার থেকে করণিকদের নিয়োগ করা হত। এরাও কর্ম ক্ষেত্রে পারিবারিক আভিজাত্যের কারণে শ্রমিকদের সঙ্গে যথেস্ট পরিমাণ দূরত্ব বজায় রাখতেন। ডক শ্রমিকদের ধর্মঘট চলাকালীন সময়ে বিশেষ করে মালিক পক্ষের মদতপুষ্ট হয়ে সুরাবর্দী যখন সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে এখানে একটি কাগুজে ইউনিয়ন গড়ে তুললেন, করণিক ইউনিয়নের পরিচালক সমিতি তখন নিজেদের ইউনিয়নের সাংগঠনিক কাঠামো সম্পর্কে পুনরায় চিন্তা ভাবনা করার প্রয়োজন বোধ করলেন। এরই পরিণতি হিসেবে পোর্ট-এর নিজস্ব রেলের গ্যাঙ ম্যান ও ম্যারিন বিভাগের শ্রমিকদের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য উপরোক্ত ইউনিয়নের একটি পৃথক সেল গঠন করা হয়।অর্থাৎ ডক শ্রমিকদের সংগঠন সামগ্রিক ভাবে কলকাতা বন্দরে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সহায়ক হয়েছিল। ঠিক একই কথা প্রাদেশিক শ্রমিক আন্দোলন সম্পর্কেও বলা যায়। জঙ্গী ইউনিয়ন হিসেবে ট্রামওয়ে ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের পরেই ছিল ডক ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের স্থান।

নির্দেশিকা

Mukherjee Nilmani, *The Port of Calcutta*. Published 1968 (official publication), Sahai Baldeo, *The Ports of India* published, June, 1980. Publication Department Government of India.

The Lt Governor of Bengal advised the Government of India to constitute a trust for the port and city of Calcutta of the strand and river bank between The dock of the Circular Canal and Tolly Nallah. The Act V of 1870 received the assent of the Governor General in Council on August 12, 1870 and came into effect on October 17, 1870. — Sahai Baldeo, op.cit., ch. III, p. 51.

Calcutta Port Trust (C.P.T) Official Record - File No. 2881/ 1205/10. General Bengal Act III of 1890; By Law 44 - Grant of Sevedoring licence.

The Hindusthan Standard, April 26, 1961.

Government of India, Fortnightly Report - Bengal. File No. 18/ 6/38 Pol. Report for the first half of 1938.

S.N. Gourlay, "Origin, Forms and Context of Trade Unionism in Bengal upto the late Nineteenth Century', *Seminar Paper in Seventh European Conference On Modern South Asian Studues*; London, 7 - 11th July, 1981.

Antanio Gramsci A. *Selections From the Prison Note Books*, New Yourk, 1971. PP 196 - 200

Sumit Sarkar, *The Swadeshi Movement in Bengal, 1903-1908* Peoples Publishing House, New Delhi. November 1973 Chapter-V.

Industrial Unrest in India. GOI. Home Political B. Print. Proceedings. December, 1920.

Dipesh Chakraborty, *Rethinking Working Class History of Bengal 1890 - 1940.* Oxford University Press 1996, Chapter 2, P33. *The Capital* 3 April 1924, looked at the profit figures for the industry for 1913 to 1923 and remarked with unconcealed glee, "What a wonderful decade it has been".

I.B. (Special Branch) File No. 130/1920. Lord Sinha Road.

Calcutta Port Trust (C.P.T) Official Records. File No. 6460 ..... 1932. Note dated 21st April, by the Chairman.

Sumit Sarkar, "The Conditions and Nature of Subaltern

Millitancy; Bengal from Swadeshi to Non-Co-Operation 1905-22" Subaltern Studies III. Edit by Ranajit Guha.

কিশোরীলাল ঘোষের অপ্রকাশিত ডাইরি

C.P.T. Record File No. 6641/1/1 subject - International Labour Conference Protection Against Accidents of Workers Engaged in Loading and Unloading Ships. The Secretary to the Government of Bengal Marine Depart. Letter No. 5425.

The Mussalman, 1/12/1925

Meerut Conspiracy Case Document N.A.I. Delhi Serial No. 2684

GOB Home Poll Confidential, File No. 161 (29-67) 1934, Part - II. N.A.I.

R.C.L.I. Vol-V Pt-II Oral Evidence

Home Political (Confidential) File No. 12/1/43) - Poll (1)

GOI Home Political File No 12/5/34 Poll, 1934

মনোরঞ্জন রায়, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রাম ও শ্রমিক আন্দোলন, পৃ. ২৮-৩০।

The Amrita Bazar Patrika, December 14, 1934

Bengal Legislative Assembly Proceedings vol 52 Nos - 1 - 4 1938. pp 26-28. Statement of Aftab Ali

The Amrita Bazar Patrika, December 14, 1934

Fortnightly Report. File No. 18/1/35 Poll 1st of January 1935.

IRA Mitra, *The Bengal Politics, 1937-1947* (An unpublished Ph.D Thesis) C.U., 1992. Chapter V.

বর্তমান প্রবন্ধ লেখিকার সঙ্গে নেপাল ভট্টাচার্যের ১৯৮৬ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে দীর্ঘ সাক্ষাৎকার।

বাংলার শ্রমশক্তি—
ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাদের ভূমিকা

ডঃ অমল দাস*

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে উঁচুতলার মানুষদের কীর্তিকাহিনী নিয়ে ইতিহাসবিদরা যতটা পাতার পর পাতা লিখেছেন তার তুলনায় সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে দুর্বল ও অনগ্রসর নীচুতলার মানুষদেব কথা অনেক কম বলা হয়েছে। আজ থেকে তিন দশক পূর্বেও ভারতের ইতিহাস ছিল 'এলিটিস্ট' ঘেঁষা। 'তলা থেকে ইতিহাস' রচনার সম্ভাবনাগুলি একেবারেই খতিয়ে দেখা হত না।[১] সাম্প্রতিক নানা রচনায় অবশ্য এই ধারার পরিবর্তন লক্ষণীয়। ইতিহাসবিদরা এখন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে নিম্নবর্গের ভূমিকা ও অবদান নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অনেক ঐতিহাসিক বা ঐতিহাসিক গোষ্ঠীর ইতিহাসচর্চায় ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে শ্রমিকদের ভূমিকাকে যথাযথ মূল্য ও মর্যাদা দেওয়া হয় নি।[২] অনেক ইতিহাসচর্চায় তা প্রায় উপেক্ষিতই থেকে গেছে; আবার অনেকেই তাদের ভূমিকাকে লঘু করে দেখাবার চেষ্টা করেছেন। এর ফলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা আন্দোলন চলাকালীন সময়ে বাংলা তথা সারা ভারতবর্ষের লড়াকু শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামী ভূমিকার কথা বা তার ব্যাপ্তি সম্পর্কে আমাদের অনেকেরই ধারণা অস্পষ্ট এবং অসম্পূর্ণ। আলোচ্য প্রবন্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার শ্রমশক্তির ভূমিকা ও অবদান বিশেষভাবে তুলে ধরবার চেষ্টা করব। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের শতবর্ষ অতিক্রান্তের পর এবং ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহের দেড়শ বছরেব পদার্পণে এই সব উপেক্ষিত শ্রেণীর স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রকৃত ভূমিকা নিয়ে নতুন করে চর্চা ও মূল্যায়নের প্রয়োজন আছে বলে মনে করি।

*অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

সূচনাপর্বে শ্রমিকশ্রেণীর নানা সমস্যা

দারিদ্র্যপীড়িত কৃষক সমাজের মধ্য থেকেই বাংলার নতুন শ্রমিকশ্রেণীর উদ্ভব ঘটেছিল। এই নতুন শ্রেণী সম্পর্কে একথা প্রচলিত যে, এরা হল 'অর্ধ-কৃষক' ও 'অর্ধ শ্রমিক।' শহরে এসে বিভিন্ন চটকল ও শিল্প প্রতিষ্ঠানে কাজ করলেও গ্রামের আকর্ষণ তাদের টানত। আবার কাজ হারাবার ভয়ে শহরেও ফিরে আসতে হত। এই দোলাচলেব মধ্য দিয়েই শ্রমিকশ্রেণীর নতুন যাত্রা শুরু হয়েছিল। আধুনিক ভারতবর্ষের সামাজিক মানচিত্রে জায়গা করে নিল একটি সদ্যোজাত নতুন শ্রেণী যার নাম শ্রমিক শ্রেণী। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, ইংলন্ডে শিল্প বিপ্লবের পর যে শ্রমিকশ্রেণীর উদ্ভব ও বিকাশ হয়েছিল তার সাথে প্রায় একশ বছর পরে উনিশ শতকের মাঝামাঝি গড়ে ওঠা বাংলার শ্রমিকশ্রেণীর চারিত্রিক পার্থক্য সুস্পষ্ট। ইংলন্ডের শ্রমিকশ্রেণী প্রধানতঃ দক্ষ কারিগর শ্রেণীর (artisans and craftsmen) মধ্য থেকে উদ্ভূত হয়েছিল এবং এরা দক্ষ শ্রমিকরূপেই বিভিন্ন কলকারখানায় কাজ শুরু করেছিল। অন্যদিকে আমাদের দেশের শ্রমিকদের চিত্রটা সম্পূর্ণ বিপরীত। এরা ছিল সুদীর্ঘকাল ধরে গ্রাম্য কৃষক, হস্ত ও কুটির শিল্পী। শহরের কলকারখানায় কাজ করা সম্পর্কে তাদের কোন পূর্বধারণা বা অভিজ্ঞতা ছিল না। এরা প্রায় সকলেই কাজে যোগ দিয়েছিল অদক্ষ শ্রমিক হিসেবে। আরও একটি কথা বিশেষভাবে বলা দরকার। বাংলা তথা ভারতবর্ষের শ্রমিকশ্রেণীর জন্ম হয়েছিল বিদেশী শাসনাধীনে। ঔপনিবেশিক শাসনের অভিশাপ, অত্যাচার, শোষণ ও অবমাননা মাথায় নিয়েই তাদের কাজ করতে হয়েছে। প্রথম থেকেই তাদের বর্ণ বৈষম্যের শিকার হতে হয়েছে। বিদেশী শাসক ও তাদের পোষ্য ব্রিটিশ পুঁজিপতিশ্রেণীর মুনাফাকে স্ফীত করার জন্য দিবা-রাত্রি পরিশ্রম করতে হয়েছে। একটা সুসংহত শ্রেণী হিসেবে গড়ে উঠার প্রচেষ্টায় তারা নানা প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়েছে। সমস্যাটা বৃদ্ধি পেয়েছে আরও নানা কারণে। বাংলার শ্রমশক্তি প্রধানতঃ গড়ে উঠেছে ভারতবর্ষের নানা প্রদেশের, নানা অঞ্চলের মানুষ-জন নিয়ে। বাংলার প্রধানতম শিল্প চটকল এবং অন্যান্য কলকারখানায় একেবারে শুরুতে স্থানীয় বাঙালী শ্রমিক কাজ করলেও মোটামুটিভাবে ছবিটা পাল্টে যায় উনিশ শতকেব শেষ দশক থেকে। এ সময়ে বিহার, উত্তরপ্রদেশ ও উড়িস্যার প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল থেকে কাজেব সন্ধানে গরীব মানুষ দলে দলে চলে আসে কলকাতা ও হুগলী নদীর উভয় তীরে গড়ে উঠা চটকল ও অন্যান্য শিল্পপ্রতিষ্ঠানে। আগত এই বিশাল 'অবাঙালী' শ্রমিকদের নিয়ে বেশ কিছু সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল। এরা তাদের গ্রাম্যসমাজের নিজস্ব সংস্কৃতি, বৈশিষ্ট্য, দোষ-ত্রুটি, কুসংস্কার, নানা পিছুটানগুলি সঙ্গে নিয়ে এসেছিল। ভাষা, জাতপাত, ধর্ম, সংস্কৃতি, অভ্যাস, প্রথা, সামাজিক আচার-আচরণ ইত্যাদির দিক দিয়ে বাংলার এই শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে এতই বিভাজন ছিল যে এদেব সুসংগঠিত ও সচেতন শ্রমিকশ্রেণীতে রূপান্তরিত করতে বেশ

খানিকটা সময় লেগেছিল। প্রথম থেকেই শ্রমিকদের প্রধানতঃ দুটি বিপরীত শক্তির সঙ্গে লড়াই করতে হয়েছিল—একদিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ, অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদের মদতপুষ্ট পুঁজিপতিদের শোষণ। ভারতবর্ষে আবার দু ধরণের পুঁজিবাদী শোষণ চলেছিল—বিদেশী ও দেশী। বাংলার চটশিল্পে বিদেশী পুঁজির কর্তৃত্ব ও আধিপত্য স্থাপিত হলেও বোম্বাই ও আমেদাবাদের বস্ত্র কলগুলিতে দেশীয় পুঁজির একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

প্রাথমিক পর্বে শ্রমিকশ্রেণী নানা সমস্যার জন্য পিছিয়ে পড়লেও ধীরে ধীরে তারা সুসংহত শ্রেণী হিসেবে গড়ে উঠতে থাকে। এই পর্বে শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত বুর্জোয়া শ্রেণী তাদের সামাজিক গন্ডি অতিক্রম করে দরিদ্র, অসহায়, ছিন্নবসন পরিহিত, অশিক্ষিত, নোংরা চেহারার শ্রমিকশ্রেণীকে কাছে টেনে নিতে পারেনি; বরং তাদের ঘৃণা ও সন্দেহের চোখে দেখতেন। তারা তাদের রাজনৈতিক সংগঠনের মাধ্যমে নিজেদের দাবী-দাওয়া ও আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণেই সচেষ্ট ছিলেন। ভারতের বুর্জোয়া শ্রেণীর সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক সংগঠন জাতীয় কংগ্রেসও অন্ততঃ প্রথম কুড়ি-পঁচিশ বছর কৃষক-শ্রমিকদের দাবী-দাওয়া নিয়ে মাথা ঘামায় নি। একটি বুর্জোয়া রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবেই জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের পথে তারা অগ্রসর হচ্ছিল। অন্যদিকে নিজস্ব রাজনৈতিক সংগঠনেব অভাবে শ্রমিকশ্রেণীকে নিজস্ব উদ্যোগেই জমায়েতের ব্যবস্থা এবং আন্দোলনের পন্থা বেছে নিতে হয়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে তারা তাদের নিজস্ব রাজনৈতিক সংগঠন খুঁজে পেল। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের আবির্ভাবের সূত্র ধরেই তারা জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে একটা সদর্থক ভূমিকা পালনের সুযোগলাভ করল।

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন ও বাংলার সাধারণ শ্রমিকশ্রেণীর ভূমিকা

উনিশ শতকের শেষার্ধে বাংলার প্রথম সারির নেতৃবৃন্দ শ্রমিকদের অসহনীয় অবস্থা, দুর্দশা, অর্থনৈতিক দাবী-দাওয়া, শোষণ ও প্রতিবাদী আন্দোলনেব প্রতি উদাসীনতার পরিচয় দিয়েছিলেন। সমসাময়িক জাতীয় সংবাদপত্রগুলিও শ্রমিকদের শোচনীয় অবস্থার কঠোর সমালোচনা বা নিন্দা করে নি। বিপানচন্দ্রের মতে, ভারতের জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ ব্রিটিশ পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে শ্রমিক দরদী ও ভারতীয় পুঁজিপতিদের ক্ষেত্রে শ্রমিক বিরোধী এই পরস্পর বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেন।[২] প্রথম পর্যায়ে (১৮৮০-১৯০৫) বাংলার চটকলগুলিতে এবং আরও কিছু কলকারখানায় শ্রমিকরা নানা ধরনের প্রতিবাদী আন্দোলন গড়ে তুললেও জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দের কোন সমর্থন বা অংশগ্রহণ দেখা যায় নি। এর ফলে এ যুগে শ্রমিক আন্দোলন দানা বেঁধে উঠতে পারে নি। সাম্রাজ্যবাদী ইংবেজ সরকারের সাহায্য নিয়ে অনেক ক্ষেত্রেই তাদের মদতপুষ্ট ম্যানেজাররা পুলিশী জুলুমের মাধ্যমে শ্রমিকদের মারধোর করে তাদের আন্দোলন বানচাল করে দিত। অতএব প্রাক-স্বদেশীযুগে শ্রমিকরা প্রতিবাদ ও ধর্মঘট করলেও

সংগঠন, পরিকল্পনা ও নেতৃত্বের অভাবে তা ব্যর্থ হয়েছিল বলা চলে। এই পর্বে শ্রমিকদের কল্যাণে যাঁরা এগিয়ে এসেছিলেন তারা ছিলেন প্রগতিশীল সমাজসেবী বা মানবতাবাদী ব্যক্তি। এঁদের মধ্যে বাংলায় উল্লেখযোগ্য ছিলেন ব্রাহ্মসমাজের নেতা ও প্রচারকগণ যেমন শিবনাথ শাস্ত্রী, শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে শশীপদ বরানগরে 'ভারত শ্রমজীবী সংঙ্ঘ' (working men's club) নামে একটি সংস্থা গঠন করেন যার উদ্দেশ্য ছিল শ্রমজীবীদের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধন। শশীপদ শ্রমিকদের জন্য নৈশ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তাদের চারিত্রিক উন্নতির জন্য প্রচার চালান ও পত্রপত্রিকাও প্রকাশ করেন।[৪] কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, বিশ শতকের সূচনা পর্বে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশী আন্দোলনের সময় শশীপদের শ্রমিক সংগঠন তাদের উন্নতিকল্পে কি ধরণের ভূমিকা পালন করেছিল এ সম্পর্কে আমাদের কিছুই জানা নেই।

তবে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশীযুগে বাংলায় যে উত্তাল শ্রমিক বিক্ষোভ হয়েছে তার সবটাই ঘটেছে বিদেশী মালিকানাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিতে এবং চটকলে। কেরানি শ্রমিক-কর্মচারী থেকে (white-collar employees) শুরু করে সর্বহারা চটকল শ্রমিক সকলেই আন্দোলনে অংশ নিয়েছিল। এই সময়েই প্রথম শ্রমিকরা সংগঠিত ও পরিকল্পিত আন্দোলন শুরু করে। আন্দোলনে তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, সাংগঠনিক শক্তিও মজবুত হয়। অর্থনৈতিক কারণ ছাড়াও রাজনৈতিক কারণ এর পশ্চাতে বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল। একদিকে স্বদেশী আন্দোলনের অপরিসীম প্রভাব, আর অন্যদিকে ইংরেজদের বর্ণ বৈষম্য ও ভেদাভেদ নীতি এবং সর্বোপরি সাম্রাজ্যবাদের চক্রান্তের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর ঘৃণা ও বিদ্বেষ স্বদেশী যুগের শ্রমিক আন্দোলনকে এক পরিবর্তিত ও জঙ্গী আন্দোলনের রূপ দিয়েছিল। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর বঙ্গভঙ্গের সরকারী ঘোষণার দিনে হাওড়াব বার্ণ কোম্পানীর কর্মচারীরা স্বদেশী আন্দোলনের ভাবধারায় প্রভাবিত হয়ে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। এর ফলে তাদের আন্দোলন রাজনৈতিক সংগ্রামে পরিণত হয়েছিল।[৫] এই পথ ধরেই সরকারী ছাপাখানার দু-হাজার শ্রমিক একমাস ব্যাপী ধর্মঘট করেছিল যা সরকারী অভিমত অনুযায়ী স্বদেশী ও জাতীয়তাবাদী প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে রাজনৈতিক আন্দোলনের রূপ গ্রহণ করেছিল।[৬] স্বদেশীযুগে রেল শ্রমিকরা অভূতপূর্ব আন্দোলন ও ব্যাপক ধর্মঘটের মাধ্যমে এক নজির সৃষ্টি করেছিল। তাদের আন্দোলন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ছিল এক বিরাট লড়াই। তা প্রমাণিত হয়েছিল 'দ্য টাইমস্,' লন্ডন পত্রিকার এক মন্তব্যে। 'এই ধর্মঘট ছিল সরাসরি ও প্রকৃতই তৎকালীন রাজনৈতিক বিক্ষোভের ফলশ্রুতি।' অবজ্ঞাসূচক 'নেটিভ' শব্দের প্রয়োগ, বর্ণবিদ্বেষ ইত্যাদি কারণই রেলশ্রমিকদের ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনে টেনে নিযে গিয়েছিল। এই আন্দোলনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল এই যে, আসানসোল, রাণীগঞ্জ ও জামালপুরে রেল কুলিরাও

অবশেষে আন্দোলনে যোগদান করেছিল। এর ফলে এই রাজনৈতিক আন্দোলন শুধু 'ভদ্রলোক' করণিক শ্রেণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, ধীরে ধীরে তা 'সর্বহারা' শ্রমিকদের আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়েছিল। রেল শ্রমিকদের বিরাট রাজনৈতিক ধর্মঘট ইংরেজ শাসকদের মনে 'লাল আতঙ্ক' ছড়িয়ে দিয়েছিল। তারা কল্পনা করেছিল রুশ নৈরাজ্যবাদীদের প্রভাব এসে পড়েছে রেল শ্রমিকদের উপর এবং এর ফলে তারা ধর্মঘটের রাস্তায় এগোতে চাইছে।[৭]

শুধু তাই নয়, ইংরেজ শাসকবর্গ এসব ধর্মঘটে কলকাতার জাতীয়তাবাদী নেতাদের সক্রিয় অংশগ্রহণের কথা জেনে অত্যন্ত বিচলিত বোধ করছিল। এর সমর্থন ও প্রমাণ পাওয়া যায় তদানীন্তন কালের সরকারী গোয়েন্দা দপ্তরের বিভিন্ন গোপন প্রতিবেদনগুলি থেকে।[৮]

তবে স্বদেশীযুগে শুধু 'ভদ্রলোক বাবু'রা (কেরানিরা) আন্দোলন করেন নি। সর্বহারা চটকল শ্রমিকশ্রেণীও স্বদেশী আন্দোলনের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম করেছিল। বাংলার ৩৭টি চটকলের মধ্যে ১৮টি চটকল কম-বেশি হলেও শ্রমিক ধর্মঘটের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।[৯] এ সময়কার সবচেয়ে বড় এবং চটকল শ্রমিকদের প্রথম রাজনৈতিক সংগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়েছিল হাওড়া জেলার বাউড়িয়া নামক স্থানের ফোর্ট গ্লস্টার মিলটিতে। বজবজ চটকলেও শ্রমিকরা বড় ধরণের আন্দোলন করেছিল।

ফোর্ট গ্লস্টার চটকলটি প্রধানত বাঙালী শ্রমিকদের নিয়ে গড়ে উঠেছিল। এখানে প্রায় নয় হাজার শ্রমিক কাজ করত, এদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল বাঙালী মুসলমান। এরা চটকলের নিকটবর্তী গ্রামগুলিতে বসবাস করত। ১৯০৫-০৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে এখানে সাড়া জাগানো দুটি ধর্মঘট হয়েছিল। এর পশ্চাতে অবশ্য রাজনৈতিক কারণই মুখ্য ছিল। এই আন্দোলনগুলির মধ্যে স্বদেশী যুগের মূল স্রোতের জাতীয়তাবাদী রাজনীতির অনেক লক্ষণই স্পষ্টতঃ ধরা পড়েছিল। প্রথম ধর্মঘটটি হয়েছিল ঐতিহাসিক ১৬ই অক্টোবর, ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে। ঐ দিনই লর্ড কার্জন সদর্পে বঙ্গভঙ্গ কার্যকর করেছিলেন। সেদিন অফিস কাছারিতে কোন কাজ হয় নি। সংবাদপত্রের প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, ৭০টি কলকারাখানায় শ্রমিক শ্রেণীর ধর্মঘটের ফলে কাজ বন্ধ ছিল। এগারো হাজার গাড়োয়ান সেদিন গরু ও মোষের গাড়ি বের করে নি। ফোর্ট গ্লস্টার চটকলে ধর্মঘটের কারণ ছিল শ্রমিকদের স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে 'রাখী বন্ধন' উৎসব পালন। গোলমাল দেখা দেয় যখন চটকলের হিন্দু কেরানিবাবুরা বাঙালী মুসলমান শ্রমিকদের হাতে মিলনের চিহ্ন হিসেবে রাখী পরাতে যায় এবং একইসঙ্গে চটকলের ভিতরেই সোচ্চারে 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি দেন। এতে চটকল কর্তৃপক্ষ বাধা দিতে এগিয়ে এলে উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ দেখা দেয়। শ্রমিকরা

কর্তৃপক্ষের অন্যায় জুলুমের বিরুদ্ধে জোরালো প্রতিবাদ জানিয়ে কাজ বন্ধ করে দেয়। এই পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে শ্রমিকদের আর্থিক দাবী-দাওয়াও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দেয়। এই ধর্মঘট সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে অমৃতবাজার পত্রিকা লিখল, "এই ধর্মঘট ছিল চটকলে কেরানি ও সাধারণ শ্রমিকদের এক মিলিত প্রয়াসের ফলশ্রুতি।" নয় হাজার শ্রমিকের ১৫ দিনের ঐতিহাসিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংগ্রাম অবশেষে জয়লাভ করল। মালিকপক্ষ শ্রমিকদের সব দাবী-দাওয়া মেনে নিল। এই চটকলের দ্বিতীয় ধর্মঘটটিও হয়েছিল বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনের প্রভাবে। এই ধর্মঘট হয়েছিল ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ৭ ডিসেম্বর। চটকলটির ম্যানেজার ফরেস্টার উর্ধ্বতন পুলিশ কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ জানাল যে, প্রথম ধর্মঘটটির অবসানের পরও শ্রমিকরা নানা অছিলায় গণ্ডগোল সৃষ্টির চেষ্টা করে চলেছে। তারা ম্যানেজারকে নানা দাবী জানিয়ে উত্তপ্ত করছিল। এমনকি অত্যন্ত উচ্চস্বরে 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি দিয়ে সবার অলক্ষ্যে দ্রুত লুকিয়ে পড়ছিল। ফরেস্টার একদিন দুজন শ্রমিককে 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি দেওয়ার সময় তাড়া করে হাতেনাতে ধরে ফেলেন এবং পুলিশের হাতে তুলে দেন। এর প্রতিবাদে এই চটকলের প্রায় ৯০০০ শ্রমিক দলবদ্ধভাবে ধর্মঘট করে বসে। কারারুদ্ধ দুজন শ্রমিকের হয়ে মামলা লড়লেন কলকাতার ব্যারিস্টার অশ্বিনীকুমার ব্যানার্জী। অবশেষে তাঁর হস্তক্ষেপে এই ধর্মঘটের মীমাংসা হল।[১০]

স্বদেশীযুগে শ্রমিক বিক্ষোভের রাজনৈতিক গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রামী মনোভাব, প্রতিবাদের ভাষা, তাদের জমায়েতের কৌশল, সুপরিকল্পিত আন্দোলন বিশ শতকের গোড়ায় বাস্তবিকই ছিল এক অভূতপূর্ব ও অভাবনীয় ব্যাপার। চটকলের 'সর্বহারা' শ্রমিকের দল তাদের আন্দোলনে যে উদ্যোগ, সংহতির পরিচয় দিয়েছিল তা সত্যিই প্রশংসার দাবী রাখে। যখন তাদের দুই সহকর্মীকে কারারুদ্ধ করা হয়েছিল তখন এক বিরাট ঐক্য ও সহমর্মিতার সুর তাদের কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে এসেছিল। "We all brothers in the mill, all brothers in Bengal, that in arresting the two men they had all been insulted". এখানে 'brother' এবং 'insult' শব্দ দুটি বিশেষ ইঙ্গিত বহন করে। 'Brother' শব্দটির মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় তাদের ভ্রাতৃত্ববোধ এবং সংহতি। 'Insult' শব্দটি তাদের 'মান-অপমান' সম্পর্কে ধারণার পরিচয় দেয়। এর কারণ হল, স্বদেশী যুগের বাংলার ধর্মঘটগুলি বাঙালী শ্রমিকদের দ্বারাই অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এর মধ্যে ভাষাগত, জাতিগত, অঞ্চলগত, সংস্কৃতিগত ঐক্যটি ধরা পড়েছিল। আর এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল স্বদেশী আন্দোলনের বিরাট গণ-জাগরণের প্রভাব।[১১] তবে বাঙালী শ্রমিক প্রভাবিত এই রাজনৈতিক আন্দোলনের সীমাবদ্ধতার কথা প্রসঙ্গে বলতে হয়, এতে চটকলের বিরাট সংখ্যক অবাঙালী শ্রমিকদের যুক্ত করার কোন রাজনৈতিক প্রয়াস ছিল না। বাগিচা ও

খনি এই দুটি বাংলার বড় শিল্পের শ্রমিকদের স্বদেশী আন্দোলনে টেনে আনার কোন প্রচেষ্টা হয় নি। বোম্বাই-এ ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে তিলকের ছ বছরের কারাদণ্ডের প্রতিবাদে বোম্বাই-এর প্রায় সমস্ত শ্রমিক যে ছ দিনের 'হরতাল' পালন করেছিল সে ধরণের কোন রাজনৈতিক সংগ্রাম বাংলার প্রথম সারির জাতীয় নেতৃবৃন্দ যেমন বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ, চিত্তরঞ্জন দাস, লিয়াকত হোসেন, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর মতো নেতারা শ্রমিক বিক্ষোভের সময় গড়ে তুলতে পারেন নি। এর ফলে বিপিনচন্দ্র পাল বা অরবিন্দ ঘোষের কারাদণ্ডের সময়ে বোম্বাই-এর ন্যায় ঘটনা বাংলায় ঘটল না। এমন কি শ্রমিক বিক্ষোভে যে সব নেতা এগিয়ে এসেছিলেন তাঁরা কেহই জাতীয় আন্দোলনের প্রথম সারির নেতা ছিলেন না। এঁরা সকলেই ছিলেন কলকাতার ব্যারিষ্টার এবং শ্রমিকদরদী ব্যক্তি। আবার অশ্বিনীকুমার ব্যানার্জী, অপূর্বকুমার ঘোষ, প্রভাতকুসুম রায়চৌধুরীর মত ব্যারিস্টাররা শ্রমিকদের মধ্যে কোন স্থায়ী সংগঠনও গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। ১৯০৫-০৮ খ্রীষ্টাব্দে অশ্বিনীকুমার ব্যানার্জীর উদ্যোগে চটকল শ্রমিকদের যে সংগঠন তৈরি হয়েছিল তা ছিল নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী এবং ভঙ্গুর। শ্রমিকদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা ও সংগ্রামী মনোভাব থাকা সত্ত্বেও বাংলার জাতীয়তাবাদী নেতারা তা কাজে লাগাতে পারলেন না। জাতীয়তাবাদের মূল স্রোতের সঙ্গে শ্রমিক আন্দোলনকে যুক্ত করার প্রয়াস চালালে হয়তো বা বাংলার শ্রমিক বিক্ষোভ এবং এইসঙ্গে স্বদেশী আন্দোলন দপ করে জ্বলে উঠে নিভে যেত না।"[১] ঐ সময়কার জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ এর দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারেন না।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর পর্বে বাংলার শ্রমিকশ্রেণীর ভূমিকা

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগে অস্বাভাবিক দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি, শ্রমিকদের ক্ষেত্রে পুঁজিপতিশ্রেণীর ব্যয়সংকোচন নীতি, মজুরি হ্রাস, শ্রমিক ছাঁটাই ইত্যাদির ফলে চটকলসহ বিভিন্ন শিল্প কলকারাখানায় ব্যাপক শ্রমিক অশান্তি শুরু হয়েছিল। এই যুগে সমগ্র ভারতবর্ষে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে স্বাধীনতা সংগ্রামের যে নতুন পর্যায় শুরু হয়েছিল তাতে বাংলার শ্রমিকশ্রেণী অধিক সংখ্যায় যোগদান করেছিল। শ্রমিক ছাঁটাই-এর ফলে বহু শ্রমিক বেকার হয়ে পড়েছিল। রুশ বিপ্লবের প্রভাবে লেনিন ও তাঁর বলশেভিকদল এশিয়া তথা ভারতের রাজনৈতিক ও শ্রমিক আন্দোলনের প্রতি খুবই সহানুভূতিশীল ছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এরপর সশস্ত্র বিপ্লবের আগমন শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। ১৯১৮ থেকে ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বাংলার বিভিন্ন শিল্পাঞ্চলে শ্রমিক আন্দোলনের ঢেউ বয়ে যায়। এ সময় সরকারী নানা প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল যে 'বালায় ধর্মঘটের জ্বর দেখা দিয়েছে।"[১৩] রেলওয়ে ওয়ার্কশপ, বন্দর, ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প এবং বিশেষ করে চটকলগুলিতে একের পর এক ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয়েছিল। বাংলার চটকলগুলিতে ধর্মঘট স্থায়িত্ব লাভ করেছিল।

শ্রমিক আন্দোলনের প্রসারে ও ব্যাপকতায় কংগ্রেস নড়েচড়ে বসল। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের নাগপুর কংগ্রেস অধিবেশনে প্রস্তাব গৃহীত হল যে, জাতীয় কংগ্রেস শ্রমিকদের ন্যায্য দাবী অর্জনের জন্য এবং তাদের ঐক্যবদ্ধ করবার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে পাঞ্জাবে সরকারী দমন প্রথার বিরুদ্ধে এবং গান্ধীজির গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে কলকাতা সহ বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যাপক ও জঙ্গী শ্রমিক আন্দোলন গড়ে ওঠে। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে গড়ে ওঠে শ্রমিকদের সর্বভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন যা 'অল ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস' (AITUC) নামে পরিচিত। সাম্রাজ্যবাদ ও ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে শক্তিশালী প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য লালা লাজপত রায় এ সময়ে শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি আহ্বান জানান।

১৯২০-২১ খ্রীষ্টাব্দে গান্ধীজির নেতৃত্বে অসহযোগ খিলাফত আন্দোলনের সূচনা হলে এর প্রভাবে চটকলসহ বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠানে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখা দেয়। অসহযোগ ও খিলাফত আন্দোলনের ফলে চটকল শ্রমিকদের সাংগঠনিক কার্যকলাপের মাত্রা দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৯২০ থেকে ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বহু চটকল ইউনিয়নও গড়ে উঠেছিল, কিন্তু এই সময়ে মহাত্মা গান্ধী বা জাতীয় কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ সারা ভারতবর্ষ জুড়ে শ্রমিক আন্দোলনের প্রতি আশাব্যঞ্জক সাড়া দেন নি। তাঁরা শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনকে মূল আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করতে অনীহা প্রকাশ করেন। বরং খিলাফত নেতারা বাংলায় চটকল শ্রমিক ও অন্যান্য শিল্পপ্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের সংগঠিত করার কাজে মনোনিবেশ করেছিলেন। মহম্মদ ওসমান ও অন্যান্য খিলাফত আন্দোলনকারীদের কাজকর্মে সরকার অত্যন্ত চিন্তিত ছিল। এইসব আন্দোলনকারীরা সর্দারদের সাহায্য নিয়ে ধর্মীয় দিক দিয়ে মিলশ্রমিক ও খিলাফত স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী অসন্তোষ ছড়াবার চেষ্টা করছিলেন। খিলাফত কর্মীরা ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে কাঁকিনাড়া লেবার ইউনিয়ন গড়ে তুলেছিল। লতাফৎ হোসেন নামে এক কর্মচ্যুত সাধারণ শ্রমিক এর সম্পাদক এবং আবদুল মজিদ, যিনি স্থানীয় কার্ল মার্কস নামে সমধিক পরিচিত, এর সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন।[৪] খিলাফত কর্মীরা শুধু উত্তর চব্বিশ পরগণার কাঁকিনাড়া-জগদ্দল এলাকায়ই সংগ্রামের মন্ত্র ছড়িয়ে দেয় নি, এইসঙ্গে বরানগর, বজবজ, গার্ডেনরীচেও মুসলিম শ্রমিকদের মধ্যে সংগঠন গড়ে তোলার কাজে লিপ্ত ছিল। বরং তুলনায় বাংলার কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ এবং স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী অনেক পরিমাণে নিষ্ক্রিয় ছিল বলা চলে। একমাত্র গান্ধীপন্থী পণ্ডিত কৃষ্ণকুমার শাস্ত্রী ১৯১৮ থেকে ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ব্যারাকপুর সাবডিভিশনের শ্রমিক অঞ্চলগুলিতে বক্তৃতা এবং অসহযোগ আন্দোলনের সময় হিন্দু-মুসলমান ঐক্য, মদ্যপান বর্জন এবং সরকারী আদালত এবং বিদেশী দ্রব্য বর্জনের জন্য প্রচার চালান। কিন্তু তাঁর কার্যকলাপ অসহযোগ ও খিলাফত আন্দোলনের অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হয়ে

যায় বলা চলে। তার পর থেকে তার কার্যকলাপ সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না।[১৫]

জাতীয় রাজনীতি ও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম এক নতুন দিকে মোড় নেয় কমিউনিস্ট বা বামপন্থীদের আগমনের পর থেকে। বিদেশী আধিপত্য থেকে মুক্ত, পরিপূর্ণ, জাতীয় স্বাধীনতা অর্জনই ছিল তাদের লক্ষ্য। বারদৌলিতে কংগ্রেসের আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত এবং ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বরে আমেদাবাদের অধিবেশনে কংগ্রেসের দুর্বল নীতি, সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সংগ্রামে কংগ্রেস কর্তৃক বিরোধিতার নীতি পরিহার করে সমঝোতার নীতির দিকে ঝোঁক ইত্যাদি রাজনৈতিক ঘটনা কংগ্রেসের জনপ্রিয়তা হ্রাস করল। এর পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করলেন কমিউনিস্টরা। তারা শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে কাজ শুরু করলেন এবং শ্রমিকশ্রেণীও কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে স্বাধীনতা সংগ্রামের ময়দানে নেমে পড়ল। উভয়ের মেলবন্ধন শ্রমিক আন্দোলন ও ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে এক নতুন দিকে টেনে নিয়ে গেল। এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে বাংলা সহ ভারতবর্ষের সর্বত্র শ্রমিকদের ধর্মঘট ও জঙ্গী বিক্ষোভের মধ্য দিয়ে। এই সময়ে গান্ধীজির নেতৃত্বে উপরতলার কংগ্রেস নেতারা যখন একটা সমঝোতা ও সংযমী মনোভাব গ্রহণ করেছিলেন তখন শ্রমিকরা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এক আপোসহীন সংগ্রামে লিপ্ত হল। সাইমন কমিশনের নিয়োগ বাংলায় শ্রমিক বিক্ষোভকে তুঙ্গে তুলল। সর্বত্র আগুন জ্বলে উঠল। নীচুতলায় গণ-অসন্তোষ দেখা দিল। সাইমন কমিশনকে সম্পূর্ণভাবে বয়কটের আহ্বান জানাল শ্রমিকশ্রেণীর সর্বভারতীয় সংগঠন এ. আই. টি. ইউ. সি। ওয়ার্কার্স এন্ড পেজেন্টস্ পার্টি তাদের ইস্তাহারে কমিশনকে সক্রিয়ভাবে উপেক্ষা করার কথা বলল এবং জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সাফল্য সংগঠিত শ্রমিক-কৃষক সংগ্রামের মধ্য দিয়েই একমাত্র সম্ভব বলে ঘোষণা করল।[১৬] সাইমন কমিশনে কোন ভারতীয় নিযুক্ত না হওয়ায় অসন্তোষ প্রকাশ করা হল! জাতীয় কংগ্রেস ভারতের ভবিষ্যত সংবিধানের ভিত তৈরী করবার জন্য একটা গোল টেবিল বৈঠকের দাবী জানাল। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার এই সমস্ত দাবী অগ্রাহ্য করলে কংগ্রেস ৩রা ফেব্রুয়ারী, ১৯২৮ এ ধর্মঘট পালনের জন্য জনসাধারণের কাছে আবেদন জানাল। কারণ ঐ দিনটিতে সাইমন কমিশনের ভারতে আসার কথা ছিল। ৩রা ফেব্রুয়ারী কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কমিউনিস্ট পার্টি এবং ওয়ার্কার্স এণ্ড পেজেন্টস পার্টিও শ্রমিকশ্রেণীকে সাইমন কমিশন বিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলনে সামিল হবার আহ্বান জানাল। শ্রমিকরা 'দুনিয়ার মজদুর এক হও' ধ্বনি তুলে তাদের আন্তর্জাতিক শ্রেণী সংহতির পরিচয় দিল। এই ধর্মঘটে শ্রমিকশ্রেণীর শ্লোগান ছিল : 'সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক', 'পূর্ণ-স্বাধীনতা চাই'।[১৭] ৩রা ফেব্রুয়ারী ১৯২৮ এর ধর্মঘটে যোগদানের জন্য কলকাতা ও হাওড়ার শ্রমিক অধ্যুষিত এলাকায় ব্যাপক প্রস্তুতি শুরু হয়েছিল! ১৯২৮ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী 'ফরোয়ার্ড' পত্রিকা এ সম্পর্কে লিখল :

'খড়দহ থেকে কাঁচরাপাড়া বিভিন্ন অঞ্চলে বুধবার যে শ্রমিক সমাবেশ হয়েছিল তাতে হরতালের আহ্বান বেশ সাড়া জাগায়। স্বামী বিশ্বানন্দ, মৃণালকান্তি ঘোষ, কিশোরী লাল ঘোষ, হাকিম সর্দার রহমান, শিবনাথ ব্যানার্জী এবং বঙ্কিমচন্দ্র মুখার্জী প্রমুখরা বহু শ্রমিক সভা সম্বোধন করেন এবং দোকানদারদের দোকান বন্ধ করার জন্য আহ্বান জানান ও শ্রমিকদের আহ্বান দেন হরতালের দিন কাজ থেকে বিরত হবার জন্য।'[১৮]

পত্রিকাটি আরও লিখল : 'বজবজ থেকে কাশীপুর পর্যন্ত সমস্ত ট্রাফিক স্টাফ ধর্মঘটে সামিল হয় ... ৩রা চিৎপুরের চটকলগুলি বন্ধ থাকবে।'[১৯] কলকাতা ট্রামওয়ে কোম্পানীর কর্মচারীরা সমস্ত রকমের ভয়, সন্ত্রাস ও কর্মচ্যুতির সম্ভাবনাকে উপেক্ষা করে এবং কর্তৃপক্ষের হুঁশিয়ারিকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে ৩রা ফেব্রুয়ারী ধর্মঘটে যোগদান করেছিল। এর জন্য তাদেরকে নানা দমন-পীড়ন সহ্য করতে হয়েছিল এবং বহু শ্রমিককে কাজ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল।

শ্রমিকশ্রেণীর এই সাইমন-বিরোধী ব্যাপক আন্দোলন যখন গণআন্দোলনে পরিণত হয়েছিল ঠিক সেইসময় ভারতের জাতীয় কংগ্রেস তাদের কার্যক্রম ও নীতি নির্ধারণের প্রশ্নে অনেকটাই দ্বিধাগ্রস্ত ছিল। বাংলায় কমিউনিস্টরা সাইমন বিরোধী আন্দোলনে শ্রমিকদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন এবং সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। এমন কি ব্রিটেনের কমিউনিস্টরাও ভারতীয়দের দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। এইভাবেই বাংলা তথা ভারতের প্রধান প্রধান শিল্পকেন্দ্রগুলির শ্রমিকদের গরিষ্ঠ অংশ সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের বিরুদ্ধে দৃঢ় ও অনমনীয় প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল।

ডোমিনিয়ন মর্যাদা না পূর্ণ স্বরাজ এই প্রশ্নে যখন ১৯২৭-২৮ খ্রীষ্টাব্দে জাতীয় কংগ্রেসের ভিতর ও বাইরে ব্যাপক বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল তখন বাংলার শ্রমিকশ্রেণী সমস্ত রকম সংকীর্ণ রাজনৈতিক ঊর্ধ্বে উঠে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবীতে সোচ্চার হয়েছিল। এইভাবে রাজনৈতিক সচেতনতার পরিচয় দিয়ে শ্রমিকশ্রেণী অর্থনৈতিক দাবী-দাওয়ার পাশাপাশি রাজনৈতিক স্বাধীনতার দাবীও উত্থাপন করল এবং এই দাবীতে সংগ্রামের পথ বেছে নেওয়ার জন্য কংগ্রেসের উপর চাপ সৃষ্টি করল। কমিউনিস্টদের সক্রিয় ভূমিকা, বাম মতাদর্শের সংহতি, পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতি, আন্দোলনের নানা নতুন নতুন কৌশল, গণ-উচ্ছ্বাসের জোয়ার ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী শ্রমিকশ্রেণীকে জোরালো সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী রাজনৈতিক সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করল।

কলকাতা ও তার আশপাশের শ্রমিকশ্রেণী ১৯২৮ সালের ডিসেম্বরে কলকাতা কংগ্রেসের অধিবেশন চলাকালীন পূর্ণ স্বরাজের দাবীতে যে নজিরবিহীন জমায়েত ঘটিয়েছিল তা আজ ভাবলে অবাক হতে হয়। কংগ্রেস এই বার্ষিক অধিবেশনে পূর্ণ

স্বরাজের প্রস্তাব গ্রহণ করুক এই দাবী জানিয়ে ৩০ হাজার শ্রমিকের এক বিশাল মিছিল মুজফ্ফর আহমেদ, বঙ্কিম মুখার্জী, শিবনাথ ব্যানার্জী প্রমুখ কমিউনিস্ট ও বামপন্থীদের নেতৃত্বে কলকাতা, হাওড়া এবং নিকটবর্তী শিল্পাঞ্চল থেকে এসেছিল। এই বিশাল মিছিল 'দুনিয়ার মজদুর এক হও', 'ভারতের স্বাধীন রিপাবলিক দীর্ঘজীবী হোক,' 'শৃঙ্খল ছাড়া আমাদের হারাবার আর কিছু নেই' ইত্যাদি বৈপ্লবিক শ্লোগানে কলকাতার আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তুলেছিল। এই বিশাল জঙ্গী মিছিল কলকাতার বিভিন্ন রাস্তা পরিভ্রমণ করে অবশেষে কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকদের সমস্ত রকমের বাধা ঠেলে কংগ্রেস অধিবেশন মণ্ডপে প্রবেশ করল এবং সেখানে নেতৃবর্গ পূর্ণ স্বরাজের দাবী জানিয়ে এক সভা সংগঠিত করলেন। শ্রমিকদের এই দাবীতে অনমনীয় মনোভাব লক্ষ্য করে জওহরলাল নেহরুর সভাপতিত্বে উপরি উক্ত সভা নিম্নলিখিত প্রস্তাব গ্রহণ করল ঃ

'সমস্ত শিল্পের শ্রমিক ও কৃষকদের এই সভা ঘোষণা করছে যে আমরা শ্রমিক ও কৃষকরা পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন এবং পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের সমস্ত শোষণের অবসান না হওয়া পর্যন্ত ক্ষান্ত হব না... জাতীয় কংগ্রেসের নিকট আমরা আহ্বান জানাই এই লক্ষ্য সাধনের জন্য জাতীয় শক্তিসমূহকে সংগঠিত করা হোক।'[২০]

উদ্ভূত রাজনৈতিক জটিল পরিস্থিতিতে সাম্রাজ্যবাদী শাসকবর্গ কংগ্রেসের সমঝোতার নীতিতে কিছুটা স্বস্তি পেলেও প্রমাদ গুণলেন ক্রমবর্ধমান কমিউনিস্ট প্রভাবে প্রভাবিত শ্রমিকদেব জঙ্গী মনোভাব ও আন্দোলনের ব্যাপকতায়। অন্যদিকে জাতীয় কংগ্রেসও তার ভিতর ও বাইরের চাপে এবং ভারতীয় জনগণের ক্রমবর্ধমান ব্রিটিশ বিরোধিতায় আপোসের পথ পরিত্যাগ করে ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের লাহোর অধিবেশনে পূর্ণ স্বরাজের লক্ষ্য ঘোষণা করল। জাতীয় কংগ্রেসের এই ঘোষণা জনমানসে উৎসাহের সঞ্চার করল এবং গণ অভ্যুত্থানের পথ সূচিত করল। আন্তর্জাতিক স্তরেও উপনিবেশগুলিতে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কার্যকলাপ চালানোর জন্য আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠিত হল। ১৯২৭-এ ব্রুসেলস-এ 'ঔপনিবেশিক নিপীড়ন এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিশ্ব কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হল। এই কংগ্রেসেই 'দি লীগ এগেন্স্ট ইম্পিরিয়ালিজম্ এ্যাণ্ড কলোনিয়াল অপ্রেশান অ্যাণ্ড ফর ন্যাশনাল ইন্ডিপেন্ডেন্স' নামে একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠন করা হয়েছিল। প্রধানত, বৃহৎ উপনিবেশ এবং আধা-উপনিবেশগুলিতে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কাজকর্ম চালানোর সংগঠন হিসেবে 'ওয়ার্ল্ড অ্যান্টি ইম্পিরিয়ালিস্ট লীগ' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বলকান উপদ্বীপ থেকে চীন এবং ভারত, লাতিন আমেরিকা, সিরিয়া, মরক্কো, ইজিপ্ট, আফগানিস্তান, ইরান এবং অন্যান্য দেশে বিভিন্ন জনগণের এক সম্মিলিত ফ্রন্ট হিসাবে এর বিস্তৃতি ঘটেছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এই বলিষ্ঠ সংগ্রাম ভারতের শ্রমিকশ্রেণীকে যথেষ্ট সাহস এনে

দিল। কারণ বিশ শতকের তৃতীয় দশকে ভারতে শ্রমিকশ্রেণীর জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির প্রভাবমুক্ত ছিল না।[২১]

১৯২৭-২৯ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা, বোম্বাই, মাদ্রাজের বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠানে শ্রমিকশ্রেণীর একের পর এক অশান্তি ও ধর্মঘট সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ সরকারকে ভয় পাইয়ে দিল। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য শ্রমিক ধর্মঘটগুলি ছিল খড়গপুরে বেঙ্গল-নাগপুর রেলশ্রমিকদের ধর্মঘট, লিলুয়ার রেলশ্রমিকদের দীর্ঘ ধর্মঘট, বোম্বাই-এ বস্ত্রকল শ্রমিকদের ১৯২৮ এবং ১৯২৯ পরপর দুবছর দুটি সাধারণ ধর্মঘট, ১৯২৮-এ ছয়মাসব্যাপী হাওড়ার ফোর্ট গ্লস্টার চটকল শ্রমিকদের ধর্মঘট এবং ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের বাংলার চটকল শ্রমিকদের প্রথম সাধারণ ধর্মঘট ইত্যাদি। এর প্রতিক্রিয়া হিসাবে শ্রমিকশ্রেণী ও তাদের নেতৃত্বের উপর নেমে এল প্রতি আক্রমণ। বিনা বিচারে বহু শ্রমিককে কারারুদ্ধ করা হল, ছাঁটাই হল বহু শ্রমিক। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ শাসকবর্গ শ্রমিকশ্রেণীর উপর ক্রমবর্ধমান কমিউনিস্ট প্রভাব বৃদ্ধিতে আতঙ্কিত হয়ে পড়লেন। তাই তারা তাদের উপর প্রতি আক্রমণের পথ বেছে নিলেন। এই সময় সাম্রাজ্যবাদী ধূর্ত ইংরেজ সরকার একদিকে কংগ্রেসের সঙ্গে সমঝোতা এবং অন্যদিকে কমিউনিস্ট ও শ্রমিকশ্রেণী থেকে উদ্ভূত বিপদের মোকাবিলার জন্য বিরোধের পথ বেছে নিল। এর প্রমাণ মেলে ১৯২৮ সালের ৭ই আগষ্ট বোম্বাই-এর পুলিশ কমিশনার কর্তৃক বোম্বাই সরকারের সচিবের কাছে লেখা চিঠি থেকে " ...আমার মতে, জন নিরাপত্তা এবং এমন কি সরকারের কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে বারদৌলির তুলনায় কমিউনিস্টরা অনেক বেশী বিপজ্জনক।" এই 'বৃহত্তর বিপদ' রোখার জন্য পুলিশ কমিশনার পরামর্শ দেন, 'আমার মতে কমিউনিস্টদের দমন করার কেবল একটাই ফলপ্রসূ উপায় আছে এবং তা হল যে সরকার ইচ্ছা করলেই সমস্ত কমিউনিস্ট নেতাদের গ্রেপ্তার ও বন্দী করতে পারে। আমার মনে হয় সরকার কর্তৃক এই ধরণের ব্যবস্থাবলী জনগণের সমর্থন পাবে।'[২২] ব্রিটিশ সরকার অবশেষে মিথ্যা অজুহাতে একের পর এক নেতাকে গ্রেপ্তার করে তাদের বিরুদ্ধে মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা রুজু করল।

কিন্তু এতে গণউচ্ছ্বাস বা শ্রমিক আন্দোলনে কোন ভাটা পড়ল না। গান্ধীজি গণ-উচ্ছ্বাসকে উপেক্ষা করতে পারলেন না। শেষ পর্যন্ত, পূর্ণ স্বরাজের লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য তাকে ইংরেজ বিরোধী সংগ্রামের পথে অগ্রসর হতে হল। শুরু হল অহিংস আইন অমান্য আন্দোলন। এরই সূত্র ধরে গান্ধী ডান্ডি অভিযান শুরু করলেন। সরকার ভয় পেয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করল। এর প্রতিবাদে যে গণ-বিক্ষোভ সারা ভারতবর্ষ জুড়ে হল তাতে ভারতবর্ষের শ্রমিকশ্রেণী অগ্রগণ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। যদিও মূল ঘটনাটি ঘটিয়েছিল শোলাপুরের শ্রমিকশ্রেণী তথাপি ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চল এবং কলকাতা পিছিয়ে ছিল না গান্ধীর গ্রেপ্তারের সংবাদে জঙ্গী আন্দোলন শুরু করার ক্ষেত্রে। ১৯৩০

সালের ৮ই মে 'দি টাইমস্ অফ্ ইণ্ডিয়া' 'ভারতে দাঙ্গা-হাঙ্গামা'—এই শিরোনাম দিয়ে লিখল :

'দিল্লী এবং কলকাতায় হাঙ্গামা—পুলিশ আক্রান্ত এবং হিংস্র জনতার দ্বারা ঘেরাও—১৪৪ ধারা জারী। অবস্থাটা সরকারের পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে গিয়েছিল। হাওড়া স্টেশনে ফ্রন্টিয়ার রেজিমেন্টের ৯০ জন জওয়ানকে প্রস্তুত রাখা হয়েছিল। স্টেশনের সমস্ত কুলিরা কাজ বন্ধ করে দিয়েছিল। বালি জুটমিলের শ্রমিকরা কাজে যোগ দেয় নি। ... বোম্বাই এর থেকে কিছু পৃথক ছিল না।"[২৩]

সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে শ্রমিক বিক্ষোভের এই চিত্র কিন্তু সাম্রাজ্যবাদীর সমর্থক পত্রিকা 'টাইমস্ অফ্ ইণ্ডিয়া'তে ছাপা হয়েছিল। এর থেকেই জনবিক্ষোভের বা শ্রমিকবিক্ষোভের ভয়াবহ রূপটি স্পষ্ট বোঝা যায়। শোলাপুরে ভয়াবহ শ্রমিক আন্দোলন এবং কলকাতাসহ ভারতবর্ষের অন্যত্র শ্রমিকদেব বিক্ষোভ, তাদের আত্মাহুতি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামকে এগিয়ে যেতে অনেকটাই সাহায্য করেছিল।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্তিম পর্যায়ে শ্রমিক আন্দোলনের ভয়াবহতা আরও বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই সময়ে তাদের আন্দোলনের অগ্রগতি ও সাফল্য বেশি করে নজরে পড়ে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেব অবসানে এবং ফ্যাসীবাদের চূড়ান্ত পরাজয়ের পরবর্তীকালে ভারতের শ্রমিকশ্রেণী অত্যন্ত সুসংগঠিত ও সচেতন শ্রেণী হিসেবে নিজেদের তুলে ধরতে সফল হয়। এ সময়ে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তাদের জঙ্গী ও আপোসহীন সংগ্রাম ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় পর্যায় বলা যেতে পারে। বোম্বাইয়ে ভারতীয় রাজকীয় নৌবাহিনীর ভারতীয় সৈনিকরা যখন দীর্ঘকালের নানা বঞ্চনা ও অবহেলার প্রতিবাদে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সরাসরি বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল তখন কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দ দোদুল্যমানতার পরিচয় দিলেও বোম্বাই-এর কমিউনিস্ট দলের নেতৃত্বে শ্রমিকশ্রেণী পুলিশের লাঠি, গুলি উপেক্ষা করে ১৯৪৬ সালে নৌবাহিনীর নাবিকদের ধর্মঘটের সমর্থনে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। এই বিক্ষোভ অন্যত্রও শ্রমিকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। কলকাতাসহ অন্যান্য শহরে ব্যাপক গণবিক্ষোভ দেখা দেয়। শুধুমাত্র বোম্বাই শহরেই ২৫০ জন দেশপ্রেমিক শ্রমিক পুলিশের গুলিতে মারা যায়।[২৪]

১৯৪৫ থেকে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দ এই সময়কালে শ্রমিক আন্দোলন আরও উত্তাল হয়ে ওঠে। বাংলায় শ্রমিক আন্দোলন এ সময়কালে বহু শিল্পপ্রতিষ্ঠানেই দেখা দেয়। চা-বাগিচা শিল্প, ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পপ্রতিষ্ঠান এবং চটকলে শ্রমিক আন্দোলন মারাত্মক রূপ গ্রহণ করে। উত্তরবঙ্গের কৃষকদের বিরাট তেভাগা আন্দোলনের প্রভাব ঐ জেলার চা-বাগিচা শ্রমিকদের উপর এসে পড়ে।

১৯৪৬-এ সাম্প্রদায়িকতার ষড়যন্ত্র উপেক্ষা করে সমগ্র শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্য ও সংহতি, রাজনৈতিক গণসংগ্রামে তাদের উৎসাহব্যঞ্জক অংশগ্রহণ এবং এই সঙ্গে কৃষক, ছাত্র ও মধ্যবিত্তের আপোসহীন দৃঢ়তা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামকে এক দুর্দান্ত রূপ দিয়েছিল। এইভাবেই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে কখনও উচ্চবর্গের পাশে আবার কখনও স্বতন্ত্র শ্রমিক শ্রেণী ও অন্যান্য মেহনতি জনগণ পথে উচ্চবর্গের ও নেতৃত্বের দোদুল্যমানতার তোয়াক্কা না করে পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের জন্য লড়াই করে গেছে। এটা সত্যি, শ্রমিকরা তাদের রাজনৈতিক পন্থা বা পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে সবসময়ে যে সঠিক, সুষ্ঠু ও পরিকল্পনা মাফিক নীতি গ্রহণ করেছে তা নয়। কিন্তু তাদের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী লড়াইয়ে তারা যে সাহস ও বীরত্বের পরিচয় রেখেছে তা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকা উচিত। এর জন্য হাজার হাজার শ্রমিক প্রাণ বিসর্জনও দিয়েছে। তাদের এই আত্মত্যাগ ভুলবার নয়। তাই আজ মহাবিদ্রোহের (১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ) দেড়শ বছর পূর্তিবর্ষে আত্মত্যাগী শ্রমিকশ্রেণীকে জানাই আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধা।

নির্দেশিকা

১। সুমিত সরকার, *আধুনিক ভারত ১৮৮৫-১৯৪৭* (কলকাতা, ১৯৯৩) পৃষ্ঠা ৪৩-৪৪।

২। R.C. Majumdar, *History of the Freedom Movement in India*, Vol. II (1962) p. 59. স্বদেশী যুগের বা পরবর্তীকালের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাদের ভূমিকা সম্পর্কে প্রায় কিছুই বলা নেই এই গ্রন্থে।

Haridas & Uma Mukherjee, *India's Fight for Freedom* এইগ্রন্থে শ্রমিক ভূমিকা নিয়ে কিছুই প্রায় বলা নেই। এছাড়া আরও অনেক জাতীয়তাবাদী ইতিহাস চর্চায় এদের ভূমিকার প্রায় কোন উল্লেখ নেই বললেই চলে।

৩। Bipan Chandra, *The Rise and Growth of Economic Nationalism in India* (New Delhi, 1966) p. 378

৪। Dipesh Chakraborty, 'Sasipada Banerjee : A Study in the Nature of the First Contact of the Bengali Bhadralok with the working classes of Bengal' in *Indian Historical Review*, January 1976, pp. 339-64.

৫। Sumit Sarkar, *The Swadeshi Movement in Bengal 1903-1908* (New Delhi, 1973) chapter five. pp. 199-203

৬। তদেব, পৃষ্ঠা ২০৬-২১৫

৭। তদেব, পৃষ্ঠা ২১৫-২২৭

৮। তদেব, পৃষ্ঠা ১৯৯-২২৭

৯। তদেব, পৃষ্ঠা ২২৭

১০। Amal Das, *Urban Politics in an Industrial Area - Aspects of Municipal and Labour Politics in Howrah - West Bengal 1850-1928* (Calcutta, 1994) pp. 179-185.

১১। *Op. cit.* pp. 184-186

১২। Sarker, *Op. cit.* pp. 242-251.

১৩। *Report of the Committee on Industrial Unrest in Bengal 1921,* Amal Das, *Op. cit.* Chapter V.

১৪। Nirban Basu, 'Outside Leadership, Political Rivalries and Labour Mobilization - The Jute Belt of Bengal, 1919-1939' in A. De Haan & Samita Sen (ed.) *A Case for Labour History.* (Calcutta, 1999) pp. 116-117.

১৫। *Ibid.* pp. 117-118

১৬। সুকোমল সেন, *ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস* ১৮৩০-১৯৯০ (কলকাতা, ১৯৯৫) পৃষ্ঠা ২২৫-২৩০

১৭। *ফরোয়ার্ড,* ২,৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯২৮

১৮। তদেব, ২ ফেব্রুয়ারি, ১৯২৮

১৯। তদেব

২০। *অমৃতবাজার পত্রিকা,* ডিসেম্বর ৩১, ১৯২৮

২১। সেন, পৃষ্ঠা ১৯৫-১৯৮

২২। *দি টাইমস্ অফ ইন্ডিয়া,* ৮ মে, ১৯৩০

২৩। তদেব

২৪। সেন, পৃষ্ঠা ৩৭৭-৩৭৮

বাংলার শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস চর্চা

নির্বাণ বসু*

১

একটি নতুন আর্থ সামাজিক শ্রেণী হিসাব শিল্পে নিযুক্ত বেতনভোগী শ্রেণীর উদ্ভব ভারতবর্ষে অপেক্ষাকৃত অল্পদিনের ঘটনা। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে নতুন নতুন কলকারখানা, পাট ও সূতাকল, কয়লাখনি, বাগিচা, রেল ও ট্রামের মত আধুনিক পবিবহন ব্যবস্থা চালু হবার পর এই শিল্প শ্রমিকশ্রেণীর ভারতে উদ্ভব ও বিকাশ। পূর্বতন কারিগর শ্রেণী বা অন্যান্য শ্রমজীবি মানুষের সংগে এই আধুনিক শিল্পের বেতনভোগী শ্রমিকের পার্থক্য পরিষ্কার। প্রধানতঃ বিদেশী পুঁজির লগ্নী দ্বারাই ভারতে শিল্পাযনের সূত্রপাত, যদিও কিছু পরেই সীমাবদ্ধ পরিধিতে হলেও দেশীয় পুঁজিপতিদেরও আবির্ভাব ঘটে। এই শিল্পায়ন প্রক্রিয়ায় ব্রিটিশ ভারতের মধ্যে বাংলার একটি অগ্রণী ভূমিকা ছিল। পাটশিল্প, ইঞ্জিনীয়ারিং কারখানা, কয়লাখনি, চা বাগান—প্রায় সব বৃহৎ শিল্পই ছিল বাংলায় এবং তার অধিকাংশই ছিল ব্রিটিশ পুঁজির মালিকানাধীন। শুধু কিছু ছোট বস্ত্রশিল্প ছিল দেশীয় মালিকানাধীন। স্বদেশী আন্দোলন ও অসহযোগ আন্দোলনের যুগে বাঙালী ভূস্বামী ও আইনজীবি প্রমুখ শিক্ষিত বৃত্তিজীবিদের উদ্যোগে রাসায়নিক, দেশলাই ও ঔষধ প্রভৃতির কারখানা স্থাপিত হয়, যদিও তার মধ্যে খুব কম সংখ্যক প্রতিষ্ঠানই দীর্ঘস্থায়ী হয়। তুলনায়, পশ্চিমভারতে বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে বোম্বাই, আমেদাবাদ প্রভৃতি অঞ্চলে বস্ত্রশিল্প উল্লেখযোগ্যভাবে গড়ে ওঠে মূলতঃ দেশীয়

*অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

শিল্পপতিদের উদ্যোগে। বাংলাদেশে শিল্পোদ্যোগীর মধ্যে বাঙালীর সংখ্যা যেমন কম ছিল, ঠিক তেমনি বাংলায় শিল্প যতই বৃদ্ধি পেয়েছে, ততই স্থানীয় বাঙালী শ্রমিকের পরিবর্তে অবাঙালী বিশেষতঃ উত্তরপ্রদেশে ও বিহারের হিন্দী ও উর্দুভাষী বহিরাগত শ্রমিকের অভিবাসন ঘটতে থাকে। সর্বোপরি, শিল্পায়ন সত্ত্বেও সারা ভারতের মতই অবিভক্ত বাংলাও মূলতঃ কৃষিপ্রধান দেশই থেকে যায়। শিল্প শ্রমিকরা বহিরাগত গোষ্ঠীর (exotic group) বেশী কিছু হয়ে উঠতে পারেনি।

এইসব নানাকারণে শ্রমিকশ্রেণী ও বাংলাদেশে তাদের আন্দোলন অনেকদিন পর্যন্ত ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি। এমনকি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সৌজন্যে প্রকাশিত পত্রিকায় ১৯৯৩ সালের এক সমীক্ষায় বলা হয় যে বাংলার শ্রমিক ইতিহাসে সবেমাত্র "serious academic attention" পেতে শুরু করেছে, এবং মাত্র ১৯৭৬ সাল থেকে এই বিষয়ে প্রথম চর্চা শুরু হয়।[১] অবশ্য এই মত পুরোপুরি গ্রহণযোগ্য নয়। বিশিষ্ট শ্রমিক ইতিহাসবিদ অধ্যাপক রণজিৎ দাশগুপ্ত ১৯৯৪ সালে লিখিত এক অভিভাষণে বলেন যে[২] ঔপনিবেশিক ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর ইতিহাস নিয়ে আগ্রহ অনুসন্ধান ও চর্চা কোনো সাম্প্রতিক ব্যাপার নয়। বস্তুতঃ পক্ষে শ্রমিকশ্রেণী ও শ্রমজীবি মানুষের জীবনের কোন কোন দিক নিয়ে উনিশ শতকে রচিত দ্বারকানাথ গাঙ্গুলীর Slavery in British Dominion কিংবা রজনীকান্ত দাসের বিংশ শতাব্দীর কুড়ির দশকে প্রকাশিত Factory Labour in India বা Labour Movement in India গ্রন্থগুলি উল্লেখযোগ্য। এগুলির মধ্যে বিশেষ করে বাংলার শ্রমিকের কথা অনেকটাই উঠে এসেছে। কিন্তু অধ্যাপক দাশগুপ্তও স্বীকার করেছেন যে সত্তরের দশকের আগে পর্যন্ত যা কিছু লেখা হয়েছে তা মুখ্যতঃ দু'টি দিকের উপরে — একটি হল প্রধানতঃ শ্রমিক সংঘ বা ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু করে বিবর্তনের কালানুক্রমিক বিবরণ আর একটি হল শ্রমিক আন্দোলন ও ধর্মঘটের ইতিবৃত্ত। অধিকাংশ লেখাই বিবরণধর্মী এবং বিশ্লেষণের অভাব সুস্পষ্ট।

তাছাড়া একথাও মনে রাখা দরকার যে যুগে দেশের মানুষ বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে, সেই সময়েই শ্রমিককে লড়তে হয়েছে যুগপৎ বিদেশী সরকার ও দেশী বিদেশী পুঁজিপতির বিরুদ্ধে। কাজেই জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে শ্রমিকের ভূমিকা এবং বিপরীতক্রমে শ্রমিক আন্দোলনে জাতীয়তাবাদীদের ভূমিকা ঐতিহাসিকের কাছে একটি বড় প্রশ্ন হয়ে ওঠা উচিত ছিল। কিন্তু ভারতীয় জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকরা কিংবা সাম্রাজ্যবাদী ও তথাকথিত "নয়া সাম্রাজ্যবাদী" কেমব্রিজ স্কুলের ঐতিহাসিকেরা কেউই সাধারণভাবে শ্রমিক ও তাদের আন্দোলনের ব্যাপারে কোনো গুরুত্বই দেন নি।[৩] বস্তুত পক্ষে শ্রমিক তাঁদের আলোচনায় প্রায় অনুপস্থিত।

২

ইতিহাসের মূল ধারার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত না হলেও সর্বভারতীয় ভিত্তিতে শ্রমিকদের একটি আলাদা অর্থনৈতিক শ্রেণী হিসাবে গণ্য করে মূলতঃ তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা, কাজের পরিবেশ, খাদ্য, বাসস্থান ও অন্যান্য সমস্যা নিয়ে আলোচনা শুরু হয় ১৯২০-র দশক থেকে। আর যেহেতু বাংলা ছিল শিল্পোন্নত অঞ্চলগুলির প্রায় প্রথম সারিতে, তাই সর্বভারতীয় আলোচনাগুলিতেও বাংলার শ্রমিকের কথা বারবার উঠে এসেছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য রচনার মধ্যে বলা যেতে পারে রজনীকান্ত দাস (১৯২৩); জে. এম. ব্রাউটন (১৯২৪), দেওয়ান চমনলাল (১৯৩২), বি. শিবা রাও (১৯৩৯) প্রভৃতির নাম।[৪] স্বাধীনতা উত্তরকালে এই একই ধারার উপর কাজ করেছেন রাধাকমল মুখার্জী (১৯৫১), রঘুরাজ সিং (১৯৫৫) এবং এস. পালেকার (১৯৬২)[৫]। শুধুমাত্র কয়লা শ্রমিকদের অবস্থা নিয়ে বি. আর. শেঠ (১৯৪০) এবং বি. পি. গুহ (১৯৭৩) ও চটকল শ্রমিকের উপর কে. পি. চট্টোপাধ্যায় (১৯৫২) এবং কে. এম. মুখার্জি (১৯৬০) এর কাজ গুরুত্বপূর্ণ।[৬] যেহেতু কয়লা ছিল প্রধানতঃ বাংলা ও বিহারে এবং পাটশিল্প কেবলমাত্র বাংলা কেন্দ্রিক, এই দুই শিল্পের শ্রমিকদের উপর গবেষণাগ্রন্থ থেকে বাংলার দুই প্রধান শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের সম্বন্ধে সবিশেষ তথ্য পাওয়া যায়।

প্রায় একই সময় থেকেই শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস নিয়েও ভারতে চর্চা শুরু হয়। যদিও স্বাধীনতা উত্তরকালেই ব্যাপকভাবে উল্লেখযোগ্য গবেষণা প্রকাশিত হয়। এই ক্ষেত্রেও প্রথাগত ঐতিহাসিকদেব তুলনায় অর্থনীতিবিদ, সমাজতাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষকরাই অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেন। এই প্রসংগে রজনীকান্ত দাস (১৯২৩), মুখতার আহমেদ (১৯৩৫), এস. ডি. পুনেকার (১৯৪৯) এ. এস. ও জি. এস. মাথুর (১৯৫৭), গৌতম শর্মা (১৯৬৩), ভি বি. কার্নিক (১৯৬৬, ১৯৬৭), শিবচন্দ্র ঝা (১৯৭৬) এবং চমনলাল রেভরীর (১৯৭২) নাম উল্লেখযোগ্য।[৭] প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে শ্রমিক আন্দোলনের এই যে ইতিহাস চর্চা হয়েছে, তার ধারাগুলি মোটামুটি এই রকম ঃ সর্বভারতীয় ভিত্তিতে কালানুক্রমিক ধারায় প্রধান প্রধান ধর্মঘটের কথা ও আনুষ্ঠানিক ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন ও কার্যকলাপের কথা লিপিবদ্ধ করা। যেহেতু বাংলা ছিল শুধু শিল্পায়নেব নয়, শ্রমিক আন্দোলনেরও পীঠস্থান, তাই এই সবকটি গ্রন্থেই বাংলার শ্রমিক আন্দোলনের কথা বিশেষ গুরুত্ব সহকারে স্থান পেয়েছে। কিন্তু সর্বভারতীয় ভিত্তিতে লেখা হবার ফলে এই বিশাল দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের শ্রমিকশ্রেণীর ও তাদের আন্দোলনের তৃণমূল বৈশিষ্ট্যগুলি এই সব আলোচনায় আদৌ ধরা পড়ে নি। তাছাড়া এই লেখকরা প্রায় সকলেই শ্রমিক আন্দোলনের বিবৃতিমূলক বর্ণনা দিয়েছেন। জাতীয় আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে তাকে বিশ্লেষণ করার তেমন কোনো প্রচেষ্টা করেন নি।

বাংলার শ্রমিক আন্দোলনের পৃথক বর্ণনা প্রথম পাওয়া যায় অতুলচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত Studies in Bengal Renaissance (প্রকাশকাল ১৯৫৮) গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত সনৎ বসু রচিত একটি সংক্ষিপ্ত অথচ তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধে।[৮] এই প্রবন্ধেই সর্বপ্রথম বাংলার শ্রমিক সমাজ, তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা ও প্রতিবাদী আন্দোলনের একটি প্রাথমিক চালচিত্র তুলে ধরা হয় যদিও আলোচনার পরিধি ১৮৫০ সাল থেকে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত সময়সীমা মাত্র। আরো লক্ষ্যণীয় যে বাংলার রেনেসাঁস সংক্রান্ত বহুবিধ প্রবন্ধের মধ্যে শ্রমিক সংক্রান্ত এই নিবন্ধটি স্থান পেয়েছে। অর্থাৎ বাংলার ইতিহাসের মূলস্রোতের মধ্যে শ্রমিকচর্চার এই প্রথম স্থান লাভ। এর ঠিক কুড়ি বছর বাদে প্রকাশিত হয় পঞ্চানন সাহার History of the Working Class Movement in Bengal (নয়া দিল্লী, ১৯৭৮)।[৯] বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের প্রথম সামগ্রিক ইতিহাস। শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি সহানুভূতিশীল অথচ নিরপেক্ষ ও তথ্যনিষ্ঠভাবে রচিত, তবে এই গ্রন্থটিও প্রধানতঃ বর্ণনাত্মক ও বিশ্লেষণ কম।

ভারতে শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনের রাজনৈতিক ভূমিকাকে গুরুত্ব দিয়ে সে সম্বন্ধে আলোচনার সূত্রপাত করেন মার্কসবাদী ঐতিহাসিকেরাই। এই ধারার পথিকৃৎ নিঃসন্দেহে রজনীপাম দত্ত (India Today, লণ্ডন, ১৯৪০)। এই গ্রন্থটি শ্রমিক আন্দোলনের বর্ণনামূলক ইতিহাস নয় কিন্তু মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ থেকে সমকালীন ভারতীয় রাজনীতি ও সমাজকে বিশ্লেষণ করার সূত্রে তিনি শ্রমিক আন্দোলনের ভূমিকা বিশ্লেষণ করেছেন।[১০] এই ধারায় পরবর্তীকালে লিখেছেন[১১] গোপাল ঘোষ, সুখবীর চৌধুরী (১৯৭১) সব্যসাচী ভট্টাচার্য (১৯৮২), ধরণী গোস্বামী (১৯৮৬), গৌতম চট্টোপাধ্যায় (১৯৮৬) এবং কপিলকুমার (সম্পাদিত, ১৯৮৮)। তবে বিশিষ্ট ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠক সুকোমল সেন (১৯৭৭) প্রথম মার্কসবাদী লেখক যিনি মার্ক্সীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের আনুপূর্বিক ভূমিকা লিপিবদ্ধ করেছেন। এই ধারার সর্বশেষ সংযোজন সুনীল সেন (১৯৯৪)। মার্ক্সবাদে বিশ্বাসী এই ঐতিহাসিক অবশ্য ডগম্যাটিক সংকীর্ণতার গণ্ডী ছাড়িয়ে প্রাক-স্বাধীনতা ও স্বাধীনতা উত্তরকালের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস একত্রে লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা করেছেন। সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটের পাশাপাশি আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যগুলিও তিনি স্থানে স্থানে তুলে ধরার প্রয়াস নিয়েছেন। বিশিষ্ট মার্কসবাদী তাত্ত্বিক নরহরি কবিরাজ তাঁর স্বাধীনতার সংগ্রামে বাংলা (১৯৫৪) গ্রন্থে[১২] বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের মার্কসীয় বিশ্লেষণ করতে গিয়ে শ্রমিক ও কৃষকশ্রেণীর ভূমিকা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন। তবে মনে রাখতে হবে যে সত্তরের দশকের আগে পর্যন্ত বাংলা শ্রমিক আন্দোলন সম্বন্ধে অনুপুঙ্খ গবেষণা না হবার ফলে তখনও তথ্য ছিল অসম্পূর্ণ।

উনিশশো সত্তরের দশকের থেকে শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসচর্চায় একের পর এক নতুন ধারা আসতে থাকে। তার মধ্যে একটি প্রধান ধারা হল এক সংগে সারা ভারতের কথা না বলে নির্দিষ্ট অঞ্চলের নির্দিষ্ট শিল্পের শ্রমিকদের নিয়ে গবেষণা যেমন বোম্বাই, আমেদাবাদ, কানপুর বা কোয়াম্বাটুর সূতাকল বা জামশেদপুরের ইস্পাত কারখানার শ্রমিক। ভারতের অন্যতম প্রাচীনতম শিল্পাঞ্চল হিসাবে বাংলাকে নিয়েও এই ধারা পিছিয়ে রইল না। শুধু প্রদেশভিত্তিক ইতিহাসই নয়, বিশেষীকরণ আরো এগিয়ে চলল যখন গবেষকরা এক একটি সংক্ষিপ্ত পর্বের (phase) উপর তাঁদের দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত করতে শুরু করলেন।

পুরোদস্তুর বৃহৎ শিল্প গড়ে ওঠার আগে ব্রিটিশদের আগমনের পরে যে মধ্যবর্তীকালীন স্তর ছিল যখন শ্রমজীবি মানুষদের পুরনো বৃত্তি পরিবর্তিত হচ্ছে অথচ তখনও নতুন যুগের প্রলেটারিয়েট সৃষ্টি হয় নি, তার কথা আলোচনা করেছেন পি. জে. মার্শাল (১৯৮২), বাসুদেব মোশেল (১৯৮৫), দীপিকা বসু (১৯৯৩)।[১৩] এরপর উনিশ শতকের শেষ তিন দশকের অর্থাৎ আধুনিক শিল্প শ্রমিকের প্রথম প্রজন্মের মধ্যে মানবতাবাদীদের কাজ নিয়ে লিখেছেন কানাই চট্টোপাধ্যায় সত্তরের দশকে প্রকাশিত বেশ কয়েকটি প্রবন্ধে এবং দীপেশ চক্রবর্তী।[১৪] একই সময়ের শ্রমিকদের স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনের কথা এসেছে দীপেশ চক্রবর্তী, রণজিৎ দাশগুপ্ত ও দীপিকা বসুর রচনায়।[১৫] এই প্রসঙ্গে শ্রমিকের সম্প্রদায় চেতনা বনাম শ্রেণীচেতনার প্রশ্নে দীপেশ চক্রবর্তী - রণজিৎ দাশগুপ্ত বিতর্কটি বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে।[১৬] এরপর স্বদেশী যুগের শ্রমিক আন্দোলনের প্রতি প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করেন সুমিত সরকার (১৯৭৩)। স্বদেশী আন্দোলনের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে স্বদেশী আন্দোলন ও শ্রমিক নিয়ে বেশ কয়েকটি তথ্য সমৃদ্ধ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।[১৭] দীপিকা বসু তাঁর কাহিনী টেনেছেন প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হবার আগে পর্যন্ত। এরপর প্রথম মহাযুদ্ধ-উত্তর ও অসহযোগ আন্দোলনের উত্তাল পর্ব (১৯১৮-১৯২৩) নিয়ে সবচেয়ে প্রথমে ও এখনও পর্যন্ত সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য পরিমাণ কাজ করেছেন সনৎ বসু।[১৮] এই একই সময়ের উপর এস. এন. গৌরলে (১৯৮৮), পার্থ দত্ত (১৯৯৩) এবং রজতকান্ত রায়ের (১৯৭৯)[১৯] লেখাও উল্লেখের দাবী রাখে। অসহযোগ আন্দোলন শেষ হবার পর থেকে ত্রিশের দশকের মধ্যভাগ পর্যন্ত মোটামুটিভাবে ১৯২৩ থেকে ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত সময়কাল নিয়ে আলোচনা পাওয়া যায় ডেভিড লাউসে (১৯৭৫), গীতশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৮৫), রাখহরি চট্টোপাধ্যায় (১৯৮৪), তনিকা সরকার (১৯৮৭) ও বিদ্যুৎ চক্রবর্তীর (১৯৯২) লেখায়।[২০] এছাড়া এই সময়ের উপর বহু স্মৃতিকথা ও জীবনীমূলক রচনা পাওয়া যায়। তাহলেও এই পর্যায় নিয়ে সুসংবদ্ধ একটি বৃহৎ কাজের এখনও সম্ভাবনা ও প্রয়োজন রয়ে গেছে বলে মনে হয়। ১৯৩৭ থেকে ১৯৪৭, প্রাক্-স্বাধীনতা যুগের

শেষ দশকের গুরুত্বপূর্ণ সময়ের উপর নির্বাণ বসু (১৯৯২) ও ইরা মিত্রের (১৯৯২) গবেষণা উল্লেখনীয়।[২১] এছাড়া পৃথকভাবে ভারত ছাড়ো আন্দোলনের যুগের উপর অমিতাভ চন্দ্র এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর উত্তাল গণআন্দোলন পর্বের উপর গৌতম চট্টোপাধ্যায় (১৯৭৬), অমলেন্দু সেনগুপ্ত (১৯৮৯) ও কেকা দত্ত রায়ের (১৯৯২) রচনাগুলি অবশ্য উল্লেখ্য।[২২]

সময়ের পর্বভিত্তিক গবেষণা ছাড়াও একটিমাত্র নির্দিষ্ট শিল্প বা তৃণমূলস্তরের একটি মাত্র অঞ্চলের (জেলা বা মহকুমা বা থানা) শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিক ঐতিহাসিকের লক্ষ্যবস্তু হয়ে উঠল। সবচেয়ে বেশী কাজ হয়েছে বাংলা দেশের চটকল শ্রমিকদেব উপর। এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হল ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত (১৯৫৩), দীপেশ চক্রবর্তী (১৯৮৯), ওঁকার গোস্বামী (১৯৯১), নির্বাণ বসু (১৯৯৪) অমল দাশ (১৯৯৪), ইরা মিত্র (১৯৯২), অর্জন দি হান (১৯৯৬), শুভ বসু (১৯৯৪) ও পরিমল ঘোষের (২০০০) রচনাগুলি।[২৩] চা বাগিচা শ্রমিকের আন্দোলন নিয়ে লিখেছেন[২৪] সনৎ বসু (১৯৫৪) ও নির্বাণ বসু (২০০২)। বিশেষভাবে দার্জিলিংয়ের বাগান শ্রমিক নিয়ে সত্যেন মজুমদাব (১৯৮৩), চট্টগ্রামের বাগান শ্রমিক নিয়ে কল্পতরু সেনগুপ্ত (১৯৮৮), আর সবচেয়ে বেশী আলোচিত ডুয়ার্সের বাগান শ্রমিকদের নিয়ে সরিৎ ভৌমিক (১৯৮১), রণজিৎ দাশগুপ্তের (১৯৯২) গ্রন্থ ও চিন্ময় ঘোষের প্রবন্ধগুলি স্মরণীয়। পাট আর চা-এর শ্রমিকের পরেই ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি সবচেয়ে বেশী আকর্ষণ করেছে কলকাতার ট্রাম শ্রমিকরা। সংখ্যায় না হলেও রাজনৈতিকভাবে অগ্রগামী ট্রাম শ্রমিকরা অনেক ক্ষেত্রেই বাংলার শ্রমিক আন্দোলনে নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করেছিল। এঁদের উপর শ্রমসাধ্য গবেষণা করেছেন শিশির মিত্র, সিদ্ধার্থ গুহরায় ও ইরা মিত্র।[২৫] বন্দর শ্রমিকদের নিয়ে লিখেছেন নীলমণি মুখার্জি (১৯৬৯), বোগায়ের্ট (১৯৭০) ও ইরা মিত্র।[২৬] বাংলার সূতাকল, কয়লাখনি ও লৌহ-ইস্পাত শিল্পের শ্রমিকদের উপর প্রথম কাজ করেন নির্বাণ বসু (২০০২)[২৭] সংগঠিত শিল্প শ্রমিকদের মধ্যে ইতিহাসে সবচেয়ে অবহেলিত রেল শ্রমিকেরা। পঞ্চানন সাহা ছাড়া আরো কারো গ্রন্থে রেল শ্রমিকদের কথা বিশেষ পাওয়া যায় না। তৃণমূলস্তরে অবশ্য রেল শ্রমিকদের উপর শ্যামাপদ ভৌমিকের গবেষণার কথা আলাদা করে বলতেই হয়।[২৮] চা ও পাট ছাড়া বাকী বৃহৎশিল্পের সবগুলি ক্ষেত্রেই ব্যাপকতর গবেষণার বিরাট জায়গা পড়ে রয়েছে।

সংগঠিত বৃহৎ শিল্পের পাশাপাশি অন্যান্য ধরণের শ্রমিকদের নিয়েও কিছু গবেষণার কথা বলা উচিত। কারখানার উৎপাদনশীল কাজে নিযুক্ত নয় অথচ কায়িক শ্রম করে এমন শ্রমিকদের নিয়ে বেশ কয়েকটি আলোচনা হয়েছে। যেমন[২৯] গাড়োয়ানদের নিয়ে আব্দুল মোমিন (১৯৮০), বিড়ি শ্রমিকদের নিয়ে জুলফিকার আলি (১৯৯৩), অসংগঠিত

শ্রমিক নিয়ে অমিয় বাগচী (১৯৯০) ও রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৯৩); মুটেদের নিয়ে নির্বাণ বসু (১৯৮৯), কাগজ কুড়ুনেদের নিয়ে রত্না সেন (১৯৮৭) এবং মেথর-ধাঙরদের নিয়ে পুলকেশ রায় (১৯৮৫), মঞ্জু চট্টোপাধ্যায় (১৯৮৭) ও নির্বাণ বসু (১৯৯১)।

কায়িক শ্রমের পাশাপাশি তথাকথিত White Collar অর্থাৎ মধ্যবিত্ত "বাবু শ্রেণীর" কর্মচারীদের অবস্থা ও আন্দোলন[৩০] নিয়ে কিছু কিছু আলোচনা করেছেন সুমিত সরকার (১৯৭৩) ও সুকোমল সেন (১৯৭৭) তাঁদের গ্রন্থের অধ্যায় হিসাবে। যতীন ভট্টাচার্য (১৯৬৮) ও দীপেন্দু চক্রবর্তীর (১৯৮৯) প্রবন্ধগুলি সংক্ষিপ্ত হলেও তাৎপর্যপূর্ণ। সরকারী আধা সরকারী ও সওদাগরী প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের সংগঠন ও আন্দোলন নিয়ে কাজ করেছেন অনুরাধা কয়াল। শুধুমাত্র ব্যাংক কর্মচারীদের নিয়ে গবেষণা করেছেন রাজীব চক্রবর্তী (১৯৯২)। পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি (WBCUTA) এবং নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি (ABPTA) কলকাতার নেতাজী ইনস্টিটিউট অফ এশিয়ান স্টাডিজের সহযোগিতায় তাঁদের সংগঠন ও আন্দোলনের নথিপত্রের সংকলন (documentation) সাম্প্রতিককালে প্রকাশ করেছেন। শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে এই ধরণের উদ্যোগ দিশারীর কাজ করতে পারে। তবে এসব সত্ত্বেও ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিক, অসংগঠিত ক্ষেত্রে শ্রমিক এবং বাবু-কর্মচারীদের ক্ষেত্রে ব্যাপক গবেষণার ক্ষেত্র এখনও অপূর্ণ রয়ে গেছে।

তৃণমূল স্তরে অঞ্চল ভিত্তিক গবেষণার কথা বলতে গেলে প্রথমেই বলা যায় "হাওড়া" অঞ্চলের চটকল ও অন্যান্য শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের নিয়ে অমল দাশের গবেষণাগ্রন্থ ও অজস্র মূল্যবান প্রবন্ধ। এইরকম আঞ্চলিক গবেষণায় সর্বাধিক খ্যাতি পেয়েছে জলপাইগুড়ি জেলা ও তার চা শিল্পের শ্রমিকদের নিয়ে রণজিৎ দাশগুপ্তের গ্রন্থ (১৯৯২)। এছাড়া বজবজ নিয়ে কর্মকার ও ঘোষ, হুগলী জিলার উপর নির্বাণ বসু, টিটাগড় অঞ্চল নিয়ে অর্জন দ্য হান, শহর কলকাতার শ্রমজীবি মানুষ নিয়ে দীপিকা বসু ও নির্বাণ বসুর প্রবন্ধগুলিকে এই শ্রেণীতে ফেলা যায়।[৩১] এই ধরণের তৃণমূল গবেষণার অগাধ সম্ভাবনা রয়েছে যা সম্পূর্ণ হলে শ্রমিক আন্দোলন সম্বন্ধে কতকগুলি প্রচলিত ধারণার পুনর্নির্মাণ সম্ভব হতে পারে।

নারী শ্রমিকদের নিয়ে আলাদাভাবে অনুসন্ধান চলছে।[৩২] মহিলা শ্রমিক নেত্রীদের ভূমিকা এবং বিশিষ্ট কয়েকজন প্রথম শ্রেণীর নেত্রী যেমন সন্তোষকুমারী গুপ্তা, প্রভাবতী দাশগুপ্তা, সাকিনা বেগম, সুধা রায়, ডাঃ মৈত্রেয়ী বসু ও দুখমৎ দিদির উপর বিস্তারিত গবেষণা করেছেন মঞ্জু চট্টোপাধ্যায়। বিপরীত মেরুতে একেবারে সাধারণ নারী শ্রমিকের জীবন ও দাবী-দাওয়া নানা দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করেছেন সুনীল সেন (১৯৮৫),

নির্মলা ব্যানার্জী (১৯৮৯), এংগেলস দাগমার (১৯৮৭)। কয়লাখনির মেয়ে শ্রমিকদের নিয়ে রাখী রায়চৌধুরী (১৯৯৬), চটকলের মেয়ে শ্রমিকদের নিয়ে শমিতা সেন (১৯৯২) ও লীলা ফার্ণাণ্ডেজ (১৯৯৪) এবং চা বাগানের মেয়ে শ্রমিক নিয়ে মিত্রা ভদ্র (১৩৯৪) ও সুপর্ণা চ্যাটার্জির (২০০৫) কাজ চোখে পড়াব মত। এছাড়া, নির্বাণ বসুর একটি প্রবন্ধে (১৯৮৫) শ্রমিক নেত্রী, মধ্যবর্তী সংগঠক ও সাধারণ নারী শ্রমিকের পারস্পরিক সম্পর্ক ও ভূমিকার কথা তুলে ধরার চেষ্টা হয়েছে।

ঔপনিবেশিক আমল থেকেই শ্রমিকদের একদিকে নিয়ন্ত্রণ অন্যদিকে তথাকথিত অধিকার প্রদান ও কল্যাণের জন্য অনেক আইনকানুন হয়েছে। সেগুলির পিছনে সমাজহিতৈষী চিন্তা কতটা কাজ করেছে আর বিভিন্ন গোষ্ঠীর স্বার্থ চিন্তাই বা কতটা কাজ করেছে তা নিয়ে প্রায় গোড়া থেকেই আলোচনা শুরু হয়েছে এবং এখনও তা অব্যাহত।[৩৩] সর্বভারতীয় ভিত্তিতে আর. কে. দাস (১৯৩১) ও মুখতার (১৯৩৫) বহুদিন আগে এই জাতীয় গবেষণা করেছিলেন। নব্বই এর দশকে বিশেষ করে বাংলাদেশে প্রচলিত আইন নিয়ে দীপিকা বসু (১৯৯৩) ও জাহানারা বেগম (১৯৯৪) বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। কেবলমাত্র বাগিচা শ্রমিকদের জন্য করা আইন নিয়ে বিস্তৃত গবেষণা করে রামকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় (১৯৮৯) বেশ কয়েকটি মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন। বাগানের মেয়ে শ্রমিকদের উপর আইনী প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে শমিতা সেনের প্রবন্ধ সবিশেষ স্মরণীয়।

শ্রমিকদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার সমস্যার প্রশ্নটিও ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি।[৩৪] সম্প্রদায় চেতনা ও শ্রেণী চেতনা নিয়ে দীপেশ চক্রবর্তীর আলোচনা সবিশেষ লক্ষ্যণীয়। এছাড়া কেনেথ ম্যাকফারসনের গবেষণা (১৯৭২), নির্বাণ বসু ও ইরা মিত্রের প্রবন্ধেও এই সমস্যা আলোচিত। তৃণমূলস্তরে শ্রমিকদের সাম্প্রদাযিকতার প্রশ্নটি সুন্দরভাবে দেখিয়েছেন হুগলীর তেলিনীপাড়া নিয়ে লেখা এক প্রবন্ধে মৃণাল বসু। প্রসংগত উল্লেখ করা যেতে পারে পূর্ব বাংলার জেলাগুলির (পরবর্তীকালের পূর্ব পাকিস্তান ও বর্তমান বাংলাদেশ) শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস নিয়ে ওপার বাংলায় যে সব আলোচনা হয়েছে, তার পূর্ণ চিত্র আমরা পাই নি।[৩৫] কামরুদ্দীন আমেদের গ্রন্থ (১৯৬৯) ছাড়া আমরা যে পেয়েছি তা হল কিছু প্রবীণ কমিউনিস্ট শ্রমিক সংগঠকদের স্মৃতিচারণ যেমন অনিল মুখার্জী (১৯৬৯), মণি সিংহ (১৯৮৩) ও খোকা রায় (১৯৮৭)।

সামাজিক শ্রেণী হিসাবে শ্রমিকশ্রেণীর উদ্ভব নিয়েও ঐতিহাসিকেরা আলোচনা করেছেন।[৩৬] এব্যাপারে পার্থসারথি গুপ্ত, অমিয় বাগচী (১৯৭২) ও ললিতা চক্রবর্তীর (১৯৭৮) আলোচনা বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য। সাধারণভাবে পূর্ব ভারতের শিল্প শ্রমিক শ্রেণীর এবং আলাদা আলাদা করে এই অঞ্চলের প্রধান শিল্পগুলি যেমন চটকল, চা

ও কয়লাখনিতে শ্রমিকের উৎস নিয়ে সবচেয়ে মূল্যবান কাজ করেছেন রণজিৎ দাশগুপ্ত।

শ্রমিক আন্দোলনের উপর কিছু কিছু তাত্ত্বিক আলোচনাও এখানে হয়েছে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য "সবলটার্ন" ইতিহাসবিদদের তরফে দীপেশ চক্রবর্তীর রচনা (১৯৯২)। এই বক্তব্য তীব্রভাবে সমালোচিত হয়েছে অমিয় বাগচী, রণজিৎ দাশগুপ্ত ও দীপিকা বসুর দ্বারা। শ্রমিক আন্দোলনে বহিরাগতের ভূমিকা একটা অত্যন্ত বিতর্কিত বিষয়।[৩৭] সব্যসাচী ভট্টচার্য (১৯৮৫) এবং দীপিকা বসুর (১৪০০ বঙ্গাব্দ) রচনা এবিষয়ে উল্লেখযোগ্য। দীপিকা বসু আন্তর্জাতিকতার প্রভাবের কথাও তুলে ধরেছেন। অমল দাশ তাঁর গবেষণা ও বিভিন্ন প্রকাশিত রচনায় এবং নির্বাণ বসু একটি প্রবন্ধে শ্রমিক আন্দোলনে বহিরাগতদের ভূমিকার কথা আলোচনা করেছেন।

শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস সংক্রান্ত আলোচনা শুধু প্রাক্-স্বাধীনতা যুগ নিয়ে সীমাবদ্ধ রয়েছে ভাবলে ভুল হবে।[৩৮] স্বাধীনতা উত্তরকাল নিয়েও কিছু কিছু আলোচনা হয়েছে। সর্বভারতীয় ভিত্তিতে হ্যারল্ড ক্রাউচ, ভি. ভি. গিরি, সি. এ. মায়ার্স, আস্কার ওরাস্তি, পট্টভিরামান, ভি. বি. সিং, সুকোমল সেন ও সুনীল সেন কিছু আলোচনা করেছেন। বাংলার ক্ষেত্রে টি. এন. সিদ্ধান্তের একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ (১৯৭০) এবং বিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের সুবিশাল গ্রন্থ (১৯৯২) বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য। শিল্প ভিত্তিক আলোচনা করেছেন রত্না সেন তাঁর অনেক প্রবন্ধে, কয়লাখনির শ্রমিক নিয়ে শ্রীবাস্তব (১৯৭০) ও সুনীল বসু রায় (১৯৮৫); চটকল শ্রমিক নিয়ে সেন ও পিপলাই (১৯৬৮) এবং ভট্টাচার্য ও চ্যাটার্জী (১৯৭১)। আরও সাম্প্রতিককালের সমস্যা যেমন নয়া অর্থনীতির ফলস্বরূপ রিট্রেনচ্মেন্ট ও নয়াপ্রযুক্তি নিয়ে লিখেছেন রণবীর সমাদ্দার (১৯৯৪) এবং অমিয় বাগচী (১৯৯৪)। এমনকি নব্বই দশকে সাড়া জাগানো হাওড়ার "কানোরিয়া" জুট মিল শ্রমিকের ঐতিহাসিক আন্দোলন নিয়ে আলাদা করে অনুসন্ধান করেছেন সমাদ্দার ও রণজিৎ দাশগুপ্ত। এসব সত্ত্বেও, স্বাধীনতা উত্তর বাংলার শ্রমিক আন্দোলনের উপর আরো বিস্তৃত ও অনুপুঙ্খ বহু গবেষণা অত্যাবশ্যক হয়ে উঠেছে।

বাংলার শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস-বিষয়ক গ্রন্থ ও প্রবন্ধের পাশাপাশি শ্রমিক ইতিহাসের সূত্র হিসাবে আর এক ধরণের উপাদানের উল্লেখ করা যেতে পারে। তা হল আত্মজীবনী ও জীবনী। বামপন্থী রাজনৈতিক কর্মী ও সংগঠকদের স্মৃতিকথামূলক আত্মজীবনী বা অভিজ্ঞতার কাহিনী অনেকগুলি প্রকাশিত হয়েছে।[৩৯] যেমন, মুজাফ্ফর আমেদ (১৯৫৯, ৬৩, ৬৯), গোপেন চক্রবর্তী (১৯৬৩), মৃণালকান্তি বসু, রণেন সেন (১৯৮১), মণিকুন্তলা সেন (১৯৮২), সত্যেন মজুমদার (১৯৮৩), সরোজ মুখার্জী (১৯৮২, ১৯৮৬), মনোরঞ্জন রায় (১৯৮৭), বীরেশ্বর ঘোষ (১৩৮৮ বঙ্গাব্দ), বিমল

দাশগুপ্ত (১৪০১ বঙ্গাব্দ), রবীন সেন (১৯৯৩), বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরী (১৯৯৮), হারাধন রায় (২০০১)।

পাশাপাশি বিশিষ্ট শ্রমিক নেতাদের কয়েকটি জীবনীমূলক আলোচনা ও মূল্যায়ন প্রকাশিত হয়েছে।[৪০] যেমন শিবনাথ ব্যানার্জীকে নিয়ে সজল বসু, শশীপদ ব্যানার্জীকে নিয়ে অ্যালবিয়ন রাজকুমার ব্যানার্জী ও ডুয়ার্সের বাগিচা শ্রমিক নেতা এ. এইচ. বেষ্টার উইচকে নিয়ে সুপ্রিয় বর্ধনের রচনা। জীবনীমূলক অভিধান রচনার কাজে হাত দিয়ে পঞ্চানন সাহা একটি নতুন গবেষণাক্ষেত্র খুলে দিয়েছেন।[৪১]

উপরিউক্ত সংক্ষিপ্ত তালিকামূলক আলোচনা থেকে মোট যে ছবিটা বেরিয়ে আসে তা হল বাংলার শ্রমিক ও তাদের আন্দোলন নিয়ে ইতিহাস চর্চা বহুবিচিত্র পথে এগিয়ে চলেছে। বিশেষ করে ১৯৭০-এর দশক থেকে সারা ভারতে শ্রমিক ইতিহাসচর্চার পরিধি ও বৈচিত্র্যই শুধু অভূতপূর্বভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে তা নয়, শ্রমিক ইতিহাসচর্চার দৃষ্টিভঙ্গীর ক্ষেত্রেও একটা বড় পরিবর্তন আসতে শুরু করেছে। উত্তর-আধুনিকতাবাদ, সাবলটার্ন ঐতিহাসিক গোষ্ঠীর উদ্ভব, এবং নতুন সামাজিক ইতিহাস রচনার উপর গুরুত্বদান প্রভৃতির প্রভাবে সাধারণভাবে ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন এসেছে, শ্রমিক ইতিহাসচর্চা তার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। যে সব প্রশ্ন এতাবৎকাল উত্থিতই হয়নি, এখন সেই ধরণের প্রশ্নেরও উত্তর খোঁজার চেষ্টা শুরু হয়েছে।

এই নূতন ধরণের শ্রমিক ইতিহাসচর্চার সংগে পুরনো ইতিহাসচর্চার সবচেয়ে বড় পার্থক্য হল যে প্রথাগতভাবে শ্রমিক ইতিহাস বলতে বোঝাত নিছক শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস। বড় বড় ধর্মঘটের নানা টানাপোড়েন. ধর্মঘটের নিষ্পত্তি ও শ্রমিকদের উপর তার প্রভাবের বাইরে আলোচনা খুব একটা এগোত না। শুধু ভারতেই নয়, সারা বিশ্বেই শ্রমিক ইতিহাসচর্চার গোড়ার দিকে এই প্রবণতা ছিল।

কিন্তু পাশ্চাত্যেই ১৯৫০-এর দশক থেকে প্রথম প্রশ্ন ওঠে যে কেবলমাত্র প্রতিবাদই শ্রমিক ইতিহাসের প্রতিপাদ্য হওয়া উচিত কিনা। একদল ঐতিহাসিক সেখানে যে শিল্পায়নের একদম গোড়ায় নতুন ব্যবস্থার প্রতি শ্রমিকদের যে তীব্র প্রতিবাদ ছিল দিন যতই এগোতে থাকে প্রতিবাদ সাধারণভাবে ততই স্তিমিত হয়ে আসে। নতুন জীবনের সংগে ধীরে ধীরে খাপ খাইয়ে নিতে তারা অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। যদিও এই প্রক্রিয়া খুব সহজ বা দ্রুত ছিল না। স্বতঃস্ফূর্ত, তাৎক্ষণিক এবং জঙ্গী প্রতিক্রিয়ার বদলে আনুষ্ঠানিক ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন, মালিক ও শ্রমিকপক্ষের মধ্যে আলোচনা ও দর কষাকষি, রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ ও নানা ধরণের শ্রমিক আইন প্রণয়ন প্রভৃতি ঘটতে থাকে। তার সঙ্গে ঘটতে থাকে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ এবং সামগ্রিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর আশা-আকাঙ্ক্ষা, সংগ্রাম ও প্রাপ্তির মেলবন্ধন।

ভারতের মত দেশ যেখানে উপনিবেশিক যুগের শেষ পর্বে শিল্পায়ন শুরু হয়েছে সেখানে এই টানাপোড়েনের জটিলতাগুলি আরো তীব্রতর হতে বাধ্য। কাজেই আধুনিক গবেষকদের মতে শ্রমিক ও তার আন্দোলনকে বুঝতে হলে তিনটি মৌলিক প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হবে ঃ (ক) কিভাবে একটি শ্রমিকশ্রেণী কোন জায়গায় প্রথম গড়ে ওঠে ও শিল্প জীবনের মধ্যে নিজেদের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়? (খ) এই শ্রমিকশ্রেণী গড়ে ওঠার সময়ে প্রতিবাদী আন্দোলনের চরিত্র কি ছিল? (গ) ধীরে ধীরে এই প্রতিবাদী আন্দোলনের উপর কারা নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে এবং কিভাবে তা পরিচালনা করতে থাকে?

কাজেই "শ্রমিক"কে প্রকৃতভাবে বুঝতে হলে আজকের সমাজবিজ্ঞানীদের মতে শুধু জঙ্গি আন্দোলনের মুহূর্তগুলিই যথেষ্ট নয়। শ্রমিকচর্চা করতে হবে সামগ্রিকভাবে— তাদের উদ্ভব, নতুন শিল্প জীবনে প্রবেশ, তাদের বস্তুকেন্দ্রিক সমস্যাগুলি বেতন ও ভাতা, বাসস্থান, খাদ্য, কাজের সময় ও পরিবেশ, তাদের মানসিক জগৎ, শিক্ষা, অবকাশ বিনোদন, রাজনৈতিক ও সামাজিক চেতনা, ধর্মীয় ও সম্প্রদায়বোধ, পারিবারিক জীবন ও যৌনতাবোধ, তাদের পরিপার্শ্ব ও পরিবেশ, শ্রমিক 'মহল্লা'গুলির অবস্থা সব কিছুই সমাজবিজ্ঞানীরা এখন বিস্তারিতভাবে আলোচনা করার উপর জোর দিয়েছেন।

এক কথায়, এতকাল উপর থেকে যে ইতিহাস লেখা হয়েছে, তার সঙ্গে "নীচের থেকে লেখা" ইতিহাসকে সংযোজিত করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

সমস্ত পৃথিবীতে শ্রমিক ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে যে যুগান্তর এসেছে, বিগত ত্রিশ বছর বাংলার শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে অনেক বৈচিত্র্যপূর্ণ ও অনুপুঙ্খ গবেষণা হওয়া সত্ত্বেও, নতুন ইতিহাসচর্চার সবকটি দিক বাংলার শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসচর্চাকে এখনও স্পর্শ করে নি। তার ফলে শ্রমিকদের শ্রেণীগত বিন্যাস পুনর্বিন্যাসের নিরন্তর প্রক্রিয়াটি অনেকটাই অধরা থেকে গেছে।

এমনকি ভারতের অন্যান্য শিল্পাঞ্চলের শ্রমিকদের কেন্দ্র করে যে ধরণের কাজ হয়েছে[৪২] যেমন বোম্বাই সূতাকলের ক্ষেত্রে নিউম্যান, কুইম্যান ও চন্দ্রভারকার, কানপুরের ক্ষেত্রে চিত্রা যোশী এবং দক্ষিণ ভারতের ক্ষেত্রে জানকী নায়ারের গবেষণা সেই সবগুলির ক্ষেত্রেই শ্রমিকদের সামাজিক ইতিহাসের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বাংলার ক্ষেত্রে একমাত্র চটকল শ্রমিকদের উপর দীপেশ চক্রবর্তীর উল্লেখযোগ্য রচনা ছাড়া অনুরূপ সামাজিক ইতিহাসধর্মী গবেষণা এখনও অনুপস্থিত। নিউম্যান, কুইম্যান প্রভৃতি দেখিয়েছেন যে গ্রাম থেকে শহরে আসার পরেও শ্রমিকদের বর্ণ ও সম্প্রদায়গত নৈকট্য বজায় থাকত এবং তাদের উপর সর্দারদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সর্দারদের ভূমিকা ছিল দ্বিমুখী— একদিকে কর্তৃপক্ষের প্রতিভূ হিসাবে শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণে রাখা এবং অন্যদিকে শ্রমিকদের

"স্বাভাবিক নেতা" (natural leaders) হিসাবে তাদের সংগঠিত করা।

কাজেই সংগঠিত ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন ১৯২০-র দশকে শুরু হবার আগেই 'সর্দার'দের উপর শ্রমিকদের এক ধরণের 'informal dependency' গড়ে ওঠে। এমনকি কেন্দ্রীয় স্তরে ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন আনুষ্ঠানিকভাবে গড়ে উঠলেও এবং অন্যদিকে বিভিন্ন লেবার অ্যাক্ট অনুযায়ী লেবার ওয়েলফেয়ার অফিসার নিয়োগ ইত্যাদি পদ্ধতি তৈরী হলেও একেবারে তৃণমূল স্তরের শ্রমিকদের কাছে পৌঁছনোর জন্য মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকায় এই সব সর্দারদের উপরই রাজনৈতিক সংগঠক ও মালিকপক্ষ উভয়কেই নির্ভর করতে হত। সর্দারীপ্রথার যুগেই আসে শ্রমিক বসতি বা মহল্লার সমাজ জীবনের প্রশ্ন। শুধু কারখানার ভেতরেই শ্রমিকজীবন সীমাবদ্ধ ছিল না, বহিরাগত শ্রমিক বসবাসের জন্য যে সব জায়গায় থাকতে বাধ্য হত, সেই শ্রমিক বস্তি, মহল্লা বা ধাওড়ার মালিক, দোকানদার ও ঋণদাতারাও শ্রমিক জীবনের এক অপরিহার্য অংশ ছিল। শ্রমিকদের সমষ্টিজীবন নিয়ন্ত্রণে এদের একটা বড় নিয়ামক ভূমিকা ছিল। অনেক ক্ষেত্রেই গ্রাম, ধর্ম ও জাতের ভিত্তিতে এই মহল্লাগুলি গড়ে উঠত। চন্দ্রভারতকর বোম্বাইয়ের সূতাকল শ্রমিকদের ক্ষেত্রে গবেষণা করতে গিয়ে এই দিকগুলির উপর জোর দিয়েছেন, কিন্তু একই সংগে তিনি উল্লেখ করেছেন যে শ্রমিকশ্রেণীর নিজস্ব রাজনীতি বুঝতে হলে ট্রেড ইউনিয়ন, জাতীয়তাবাদ, সরকারী নীতি, বাণিজ্যিক কৌশল সব কিছু মিলিয়ে একটি বড় ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটকে মনে রাখতে হবে এবং তাছাড়া যে কোনো অনুগবেষণা (micro-study) দিশাহীন থেকে যাবে। বাংলার ক্ষেত্রে চটকল শ্রমিকদের নিয়ে অর্জন দ্যা হান এবং শুভ বসুর গবেষণায় এই ধরণের বিষয়ে কিছুটা আলোচনা থাকলেও আরো অনেক ব্যাপক গবেষণার সুযোগ আছে এবং চটকল ছাড়া অন্যান্য শিল্পে এই ধরণের কাজ একেবারেই হয়নি। আবার জানকী নায়ার দক্ষিণ ভারতের কোলার স্বর্ণখনি ও বাঙ্গালোরের সূতাকল শ্রমিকদের তুলনামূলক আলোচনা করতে গিয়ে ভারতীয় শ্রমিকের বহুবিধ সত্তা পরিচিতির (multiple identities) উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে শুধুমাত্র "শ্রেণীর" আবরণে সমস্ত সামাজিক জটিলতাগুলিকে মুছে দেওয়া যায় না। তাঁর বিশ্লেষণ অনুযায়ী, ভারতীয় প্রেক্ষিতে শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ করতে "শ্রেণীর" তুলনায় বর্ণ অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। বর্ণভিত্তিক ঐক্যকে শ্রেণীসংগ্রামের প্রতিবন্ধক হিসাবে না দেখে তিনি বরং সংগ্রামী মানসিকতা সৃষ্টিতে সহায়তাকারী শক্তি হিসাবে চিহ্নিত করেছেন এবং দেখিয়েছেন যে কিভাবে শ্রমিকরা বর্ণভিত্তিক ঐক্যের ভিত্তিতে নিজেদের উদ্যোগে শক্তিশালী যৌথ আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। কিন্তু মালিকপক্ষ, উপনিবেশিক রাষ্ট্র এমনকি ভারতের জাতীয় কংগ্রেস যারা স্বাধীনতার পর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতালাভে উন্মুখ হয়ে উঠেছিল তারা কেউই চায় নি যে শ্রমিকদের নিজেদের মধ্য থেকে উঠে আসুক আন্দোলনের নেতৃত্ব। নায়ার শ্রমিক

ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে আন্দোলনে 'বর্ণের' ভূমিকা এবং শ্রমিকের স্বতন্ত্র আন্দোলন (autonomous movements) সম্পর্কে যে গুরুত্ব দিয়েছেন, বাংলার শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে অনুরূপ আলোচনা অপ্রাপ্তব্য বলা যেতে পারে। রণজিৎ দাশগুপ্ত পূর্ব ভারতের বিভিন্ন শিল্পশ্রমিক শ্রেণী গড়ে ওঠার (crystallisation) সময়ের বর্ণভিত্তিক আলোচনা করেছেন, কিন্তু পরে এই বর্ণ গঠনমূলক (cementing) অথবা বিভেদমূলক (divisive) শক্তি হিসাবে কী ভূমিকা পালন করেছিল তা নিয়ে এখনও কোন আলোচনা হয় নি। অনুরূপ আলোচনা গবেষণার এক নতুন দিগন্ত খুলে দিতে পারে।

দীপেশ চক্রবর্তী সামাজিক ইতিহাসের সাংস্কৃতিক ব্যাখ্যায় বিশ্বাসী। বাংলার চটকল শ্রমিকদের উপর তাঁর বিখ্যাত গবেষণায় তিনি দুটি মূল প্রশ্ন তুলেছেন—(ক) এই শিল্পে জঙ্গি আন্দোলনের ঐতিহ্য থাকা সত্ত্বেও ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন এত দুর্বল থেকে গেল কেন? (খ) শ্রমিক সংগঠনের নেতৃত্বে বহিরাগতের ভূমিকা ধারাবাহিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ রয়ে গেল কেন?

অধ্যাপক চক্রবর্তীর গবেষণার গুরুত্ব এই নয় যে প্রশ্নগুলি তিনি প্রথম তুলেছেন। তাঁর আগেও অনেকে এই বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করেছেন, কিন্তু তাঁর রচনার বৈশিষ্ট্য হল এইখানে যে তিনি তাঁর পূর্বসূরীদের চেয়ে অনেক গভীরে গিয়ে এই প্রশ্নের উত্তর সন্ধান করেছেন। প্রথাগত ঐতিহাসিকেরা এই সমস্যাগুলির যে সব কারণকে দায়ী করেছেন যেমন, সরকার ও মালিকপক্ষের শত্রুভাবাপন্ন মনোভাব, শ্রমিকদের ভাষা-বর্ণ-সম্প্রদায়গত বিভাজন, শিক্ষা ও সচেতনতার অভাব সেগুলি অধ্যাপক চক্রবর্তী অস্বীকার করেন নি, কিন্তু তাঁর মতে, শ্রমিক সংগঠনের দুর্বলতার এগুলি প্রধান কারণ নয়। এইখানেই তিনি শ্রমিকশ্রেণীর সংস্কৃতির প্রশ্ন তুলেছেন। যে কোনও সংস্কৃতিকেই তিনি মনে করেন কর্তৃত্ব বা সম্পর্ক যাকে তিনি দুভাগে ভাগ করেন—সামন্ততান্ত্রিক বা স্তরভেদের (hierarchic) সম্পর্ক এবং উদারনৈতিক বা বুর্জোয়া সম্পর্ক। তাঁর মতে, শ্রমিকশ্রেণীর সচেতনতা শুধুমাত্র রাজনৈতিক অর্থনৈতিক বা প্রযুক্তিগত প্রশ্ন নয়, শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের মধ্যে সংস্কৃতির প্রশ্নই সবচেয়ে বড়। অর্থাৎ প্রথাগত মার্কসবাদীরা শ্রমিক-মালিক সম্পর্ককে যেভাবে মূলতঃ অর্থনৈতিক মনে করেন অধ্যাপক চক্রবর্তী সেই বক্তব্যকেই খণ্ডন করতে চান। তাঁর কাছে শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক মূলতঃ একটি মানবিক সমস্যা, ধারণা ও চেতনার প্রশ্ন এবং কর্তৃপক্ষের চাপিয়ে দেওয়া শৃংখলার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। অধ্যাপক চক্রবর্তীর মতে ভারতবর্ষে ঔপনিবেশিক যুগে যে সব ট্রেড ইউনিয়ন-সংগঠন গড়ে উঠেছিল সেগুলি ঠিক আইনানুগ নিয়মকানুন যেমন বার্ষিক চাঁদার ভিত্তিতে সদস্যপদ, নির্ধারিত সময় অন্তর সদস্যদের ভোটের ভিত্তিতে কর্মপরিষদ

ও কর্মকর্তা (office-bearers) নির্বাচন, কর্মপরিষদের নিয়মিত বৈঠক ও আলোচনা অন্তে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রভৃতি মেনে পরিচালিত হত না। ইউনিয়নগুলির ভেতরেই গণতান্ত্রিকতার অভাব ছিল। শ্রমিকরা সংগঠনকে নিজেদের বলে ভাবতে শেখেনি, তারা সংগঠনের প্রতি নয়, অনুগত থাকত সংগঠনের "সর্বোচ্চ" বহিরাগত নেতার প্রতি। এই আনুগত্যকেই তিনি "জমিদারী আনুগত্য" বলে উল্লেখ করেছেন। বহিরাগত নেতা শ্রমিকের কাছের মানুষ ছিলেন না, ছিলেন "প্রভু"। মোটর গাড়ী থেকে নামা, ইংরাজীতে শ্রমিকদের দাবী-দাওয়া নিয়ে সাহেব মালিক-ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলা, তাঁদের নিজেদের বিশাল সামাজিক অবস্থান সত্ত্বেও নিপীড়িত শ্রমিকেব পাশে দাঁড়ানোর জন্য সর্বস্ব ত্যাগের প্রতিশ্রুতি—সব কিছু মিলিয়ে এই সব "নেতা"দের এক ভাবমূর্তি গড়ে উঠত। এই সকল কারণেই চক্রবর্তীর মতে ট্রেড ইউনিয়ন শ্রমিকের "গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান" হয়ে উঠতে পারে নি। বামপন্থীরা সামন্ততান্ত্রিক প্রভুত্বেব বিরুদ্ধে বললেও এই ট্রেড ইউনিয়ন রাজনীতির গোলকধাঁধা থেকে বেরোতে পারে নি। শ্রমিকরা অবশ্য নিঃশর্তভাবে সর্বোচ্চ নেতার অনুবর্তী ছিল একথা মনে করা ভুল। তিনি যদি শ্রমিকদের দাবী-দাওয়া পূরণে অসমর্থ হতেন তাহলে অনেক ক্ষেত্রে শ্রমিকরা সেই নেতাকে ত্যাগ কবে আর একজনকে বিখ্যাত নেতা করে নিত। কিন্তু সংগঠনের চরিত্রে তাতে কোন পরিবর্তন হত না। সেই একইরকম নেতানির্ভর অগণতান্ত্রিক সংগঠনই থেকে যেত। তাঁর মতে ১৮৮০-এর দশক থেকে শুরু করে ১৯৪০-এর দশক পর্যন্ত দীর্ঘ ছয় দশকেও পরিস্থিতির কোনো মৌলিক পরিবর্তন ঘটেনি। বিংশ শতাব্দীতে জাতীয়তাবাদী ও মার্কসবাদী চিন্তা ও আন্দোলনের প্রভাব ট্রেড ইউনিয়নের উপর পড়েছিল এ কথা তিনি একেবারে অস্বীকার করেন নি বা কিন্তু তাতে তাঁর মতে পরিস্থিতির কোনো মৌলিক পরিবর্তন ঘটেনি বা শ্রমিকদের চেতনারও কোনো স্তরবৃদ্ধি ঘটেনি।

নিঃসন্দেহে, অধ্যাপক চক্রবর্তীর বক্তব্য অভিনব ও মৌলিক; কিন্তু সাংস্কৃতিক চেতনার উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব দিতে গিয়ে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিষয়গুলি তাঁর রচনায় অনেকটা অবহেলিত হয়েছে।

সাম্প্রতিককালের শ্রমিক ইতিহাসচর্চার এই সব নতুন ধরনের ধারাগুলি অবশ্যই সমালোচনার উর্ধ্বে নয়। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ্ ও সমাজবিজ্ঞানী অমিয়কুমার বাগচী[৬৩] এই ধরনের ইতিহাসচর্চার বিরুদ্ধে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন যে এগুলির একটা সাধারণ ঝোঁক হল অর্থনৈতিক বিষয়গুলির উপর গুরুত্ব না দিয়ে অর্থনীতি বহির্ভূত বিষয়গুলির উপর ঝোঁক সৃষ্টি। শ্রমিকশ্রেণীর গঠন, তাদের দৈনন্দিন অবস্থা, চেতনা ও ঔপনিবেশিক পর্বে শ্রমিকদের সংগ্রামের বহু তথ্যপূর্ণ বর্ণনা রয়েছে। কিন্তু অধ্যাপক বাগচীর মতে একটা বড় সমস্যা হল যে সংশ্লিষ্ট গবেষকরা নিজেদের তাত্ত্বিক ঝোঁক

বা বিশ্বাস অনুযায়ী পছন্দসই তথ্য আহরণ করে তার ভিত্তিতেই সিদ্ধান্তে উপনীত হন। এর ফলে শ্রমিক ইতিহাসের সামগ্রিকতা ক্ষুণ্ণ হয়ে তা অনেক ক্ষেত্রেই হয়ে ওঠে খণ্ডিত ও একপেশে।

সর্বোপরি, বাংলা তথা ভারতের শ্রমিক ইতিহাসচর্চার এতাবৎকাল পর্যন্ত যে ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে তার সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হল যে এই চর্চা প্রধানতঃ মিল, কারখানা, বাগিচা ও খনির মত বৃহৎ আনুষ্ঠানিক (formal) ক্ষেত্রের শ্রমিকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছে যারা উনিশশো কুড়ি ও ত্রিশের দশকের মধ্যেই রাষ্ট্রীয় আইনের কবচের দ্বারা বেশ কিছু অধিকার ও সুরক্ষা লাভ করেছিল। এছাড়া মধ্যবিত্ত কর্মচারীদের বিভিন্ন অংশকে নিয়েও কিছু গবেষণা হয়েছে। কিন্তু এই সংগঠিত ক্ষেত্রগুলিতে দেশের মোট শ্রমশক্তির এক ক্ষুদ্র অংশই নিয়োজিত। যে বিশাল অসংগঠিত শ্রমজীবি মানুষ এর বাইরে রয়েছে—মাঝারি, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে, দিনমজুরী, দোকানদারি, ক্ষুদ্র ব্যবসা, স্বনিযুক্তি ক্ষেত্র, কৃষিজ শিল্প প্রভৃতি বৃত্তিকে কেন্দ্র করে গ্রামে, শহরে, নগরে যারা ছড়িয়ে আছে তাদের কোন ইতিহাস আজো লেখা হয়নি। আর এই বিশাল সংখ্যক মানুষকে বাদ দিয়ে বাংলার শ্রমিক ইতিহাসচর্চা কখনও সম্পূর্ণ হতে পারে না।

নির্দেশিকা

(১) বন্দ্যোপাধ্যায় শেখর—'টুয়ার্ডস এ নিউ সোশ্যাল হিস্ট্রি অব কলোনীয়াল বেংগল : এ রিভিউ অফ রিসেন্ট রিসার্চ' (**এশিয়ান রিসার্চ ট্রেন্ডস**, সংখ্যা ৩, ১৯৯৩ দ্য সেন্টার ফর ইষ্ট এশিয়ান কালচারাল স্টাডিজ ফর ইউনেস্কো)

(২) দাশগুপ্ত, রণজিৎ - 'শ্রমিক ইতিহাস চর্চার বিভিন্ন ধারা' (**ইতিহাস অনুসন্ধান-১০**, পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদের একাদশ অধিবেশনে আধুনিক ভারত শাখার সভাপতির অভিভাষণ, ১৯৯৪)

(৩) মজুমদার রমেশচন্দ্র — **হিস্ট্রি অফ দ্য ফ্রিডম মুভমেন্ট ইন ইন্ডিয়া** ১-৩ খণ্ড (কলিকাতা, ১৯৭১)

স্পিয়ার পার্সিভাল — **দ্য অক্সফোর্ড হিস্ট্রি অফ মডার্ণ ইন্ডিয়া** (দিল্লি, ১৯৬৫)

ব্রুমফিল্ড জে এইচ — **এলিট কনফ্লিক্ট ইন এ প্লুরাল সোসাইটি — টুইয়েনটিয়েথ সেঞ্চুরি বেঙ্গল** (ক্যালিফোর্নিয়া, ১৯৬৮)

গর্ডন লিওনার্ড, এ — **বেঙ্গল : দ্য ন্যাশনালিস্ট মুভমেন্ট ১৮৭৬-১৯৪০** (নিউইয়র্ক, ১৯৭৪)

ব্রাউন জুডিথ — **গান্ধী অ্যান্ড সিভিল ডিসওবিডিয়েন্স ঃ দ্য মহাত্মা ইন ইন্ডিয়ান পলিটিক্স** (কেমব্রিজ ১৯৭৭)

(৪) দাস রজনীকান্ত — **ফ্যাক্টরী লেবার ইন ইন্ডিয়া (বার্লিন, ১৯২৩)**

ব্রাউটন জে. এম — **লেবার ইন ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রিস** (লন্ডন, ১৯২৪)

চমনলাল দেওয়ান — **কুলি ঃ দ্য স্টোরি অফ লেবার অ্যান্ড ক্যাপিটাল ইন ইন্ডিয়া** (লাহোর, ১৯৩২)

রাও বি শিবা — **দ্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ার্কার ইন ইন্ডিয়া** (লন্ডন, ১৯৩৯)

(৫) মুখার্জী রাধাকমল — **দ্য ইন্ডিয়ান ওয়ার্কিং ক্লাস** (বোম্বাই, ১৯৫০)

সিং রঘুরাজ — **দ্য মুভমেন্ট অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়েজেস অফ ইন্ডিয়া** (দিল্লি, ১৯৫৫)

পালেকর এস — **রিয়াল ওয়েজেস ইন ইন্ডিয়া**, ১৯৩৯-৫০ (বোম্বাই, ১৯৬২)

(৬) শেঠ বি আর — **লেবার ইন ইন্ডিয়ান কোল ইন্ডাস্ট্রি** (বোম্বাই, ১৯৪০)

গুহ বি পি — **ওয়েজ রেটস ইন দ্য কোল মাইনিং ইন্ডাস্ট্রি** (সিমলা, ১৯৭৩)

চট্টোপাধ্যায় কে. পি. — **এ সোসিও ইকনমিক সার্ভে অফ জুট লেবার** (কলকাতা, ১৯৫২)

মুখার্জী কে এম. — 'ট্রেড ইন রিয়াল ওয়েজেস ইন দ্য জুট টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রি ফ্রম ১৯০০-১৯৫১' (**অর্থ বিজ্ঞান**, ভলুম ২, সংখ্যা ১, মার্চ, ১৯৬০)

(৭) দাস, রজনীকান্ত — **দ্য লেবার মুভমেন্ট ইন ইন্ডিয়া** (বার্লিন, ১৯২৩)

আহমেদ মুখতার — **ট্রেড ইউনিয়ন অ্যান্ড লেবার ডিসপ্যুটস ইন ইন্ডিয়া** (বোম্বাই, ১৯৩৫)

পুনেকার এস. ডি — **ট্রেড ইউনিয়নিসম ইন ইন্ডিয়া** (বোম্বাই, ১৯৪৯)

মাথুর এ এস. এবং মাথুর জে. এস - **ট্রেড ইউনিয়ন মুভমেন্ট ইন ইন্ডিয়া** (এলাহাবাদ, ১৯৫৭)

শর্মা গৌতম কে — **লেবার মুভমেন্ট ইন ইন্ডিয়া ঃ ইটস পাস্ট অ্যান্ড প্রেজেন্ট** (নিউ দিল্লি, ১৯৬৩)

কার্ণিক ভি. বি. — **ইন্ডিয়ায় ট্রেড ইউনিয়নস ঃ এ সার্ভে** (বোম্বাই, ১৯৬৬)

ঐ — **ষ্ট্রাইকস ইন ইন্ডিয়া** (বোম্বাই, ১৯৬৭)

ঝা শিবচন্দ্র — **দ্য ইন্ডিয়ান ট্রেড ইউনিয়ন মুভমেন্ট** (কলিকাতা, ১৯৭৩)

রেভরী চমনলাল — **দ্য ইন্ডিয়ান ট্রেড ইউনিয়ন মুভমেন্ট**, ১৮৮০-১৯৪৭ (নিউ দিল্লি, ১৯৭২)

(৮) বসু সনৎ — **লেবার কন্ডিশনস্ ১৮৫০-১৯১৪**

(অতুলচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত স্টাডিস ইন বেঙ্গল রেনাসাঁসের অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধ, যাদবপুর, ১৯৫৮)

(৯) সাহা পঞ্চানন — **হিস্ট্রি অফ দ্য ওয়ার্কিং ক্লাস মুভমেন্ট ইন বেঙ্গল** (নয়াদিল্লী, ১৯৭৮)

(১০) দত্ত. আর. পি. — **ইন্ডিয়া টুডে** (প্রথম প্রকাশ, লন্ডন, ১৯৪৩)

(১১) ঘোষ গোপাল — **ইন্ডিয়ান ট্রেড ইউনিয়ন মুভমেন্ট** (কলিকাতা, তারিখ হীন)

চৌধুরী সুখবীর — **পেজেন্টস অ্যান্ড ওয়ার্কার্স মুভমেন্ট ইন ইন্ডিয়া** ১৯০৫-২৯ (নিউ দিল্লী, ১৯৭১)

চট্টোপাধ্যায় গৌতম — **আধুনিক ভারত শাখার সভাপতির অভিভাষণ** - (ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি কংগ্রেস ৪৭বর্ষ, ১৯৮৬)

গোস্বামী ধরণী — **ট্রেড ইউনিয়ন মুভমেন্ট ইন ইন্ডিয়া ঃ ইটস গ্রোথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট** (নিউ দিল্লি. ১৯৮৩)

ভট্টাচার্য সব্যসাচী — **আধুনিক ভারত শাখার সভাপতির অভিভাষণ** (ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি কংগ্রেস ৪৩বর্ষ, ১৯৮২)

কুমার কপিল (সম্পাদিত) — **কংগ্রেস অ্যান্ড ক্লাসেস ঃ ন্যাশনালিজম, ওয়ার্কার্স অ্যান্ড পেজেন্টস** (নিউ দিল্লি, ১৯৮৮)

সেন সুকোমল — **দ্য ওয়ার্কিং ক্লাস অফ ইন্ডিয়া ঃ হিস্ট্রি অফ এমার্জেন্স অ্যান্ড মুভমেন্ট** ১৮৩০-১৯৭০ (কলিকাতা, ১৯৭৭)

সেন সুনীল কুমার — **ওয়ার্কিং ক্লাস মুভমেন্টস ইন ইন্ডিয়া** (১৮৮৫-১৯৭৫) (দিল্লি, ১৯৯৪)

(১২) কবিরাজ নরহরি — **স্বাধীনতার সংগ্রামে বাংলা** (কলিকাতা, ১৯৫০)

(১৩) মার্শাল পি. জে. — 'কুলিস আন্ডার দ্য কোম্পানী' (প্রদীপ সিংহ সম্পাদিত — **দ্য আরবান এক্সপেরিয়েন্স ঃ ক্যালকাটা এসেস ইন হনর অফ নিশীথ রঞ্জন রায়**' (কলি, ১৯৮৯)

মোসেল বাসুদেব — **ভারতে ধর্মঘটের ইতিহাস**, ১৮২৭-১৮৮৫, (কলিকাতা, ১৯৮৫)

বসু দীপিকা — **দ্য ওয়ার্কিং ক্লাস ইন বেঙ্গল ফর্মেটিভ ইয়ার্স** (কলি, ১৯৯৩)

(১৪) চট্টোপাধ্যায় কানাইলাল — এ পাওনীয়ার ইন ওয়াকিং মেনস আপলিফ্‌ট অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার ওয়ার্ক ইন বেঙ্গল — শশীপদ ব্যানার্জী (ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি কংগ্রেস প্রসিডিংস ভল্যুম, ৩২তম অধিবেশনে, জব্বলপুর, ১৯৭০)

চক্রবর্তী দীপেশ — শশীপদ ব্যানার্জি (সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোস্যাল সায়েন্সেস অকেশনাল পেপার, মিমিওগ্রাফড নং ৪)

(১৫) চক্রবর্তী দীপেশ — **বিথিংকিং ওয়ার্কিং ক্লাস হিস্ট্রি বেঙ্গল ১৮৯০-১৯৪০** (প্রিন্সটন, ১৯৮৯)

দাশগুপ্ত রণজিৎ—**লেবার অ্যান্ড ওয়ার্কিং ক্লাস ইন ইস্টার্ন ইন্ডিয়া—স্টাডিজ ইন কলোনিয়াল হিস্ট্রি** (কলকাতা, ১৯৯৪)

বসু দীপিকা — প্রাগুক্ত

(১৬) চক্রবর্তী দীপেশ ও দাশগুপ্ত রণজিৎ — **সাম অ্যাসপেক্টস অফ লেবার হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল ইন দ্য নাইনটিনথ সেঞ্চুরি ঃ টু ভিউস** (মিমিওগ্রাফড, সি এস এস. এম সি, অকেশনাল পেপার, সংখ্যা ৪)

(১৭) সরকার সুমিত — **দ্য স্বদেশী মুভমেন্ট ইন বেঙ্গল**, ১৯৩০-০৮ (দিল্লি, ১৯৭৩), বসু নির্বাণ — বঙ্গভঙ্গ ঃ শিল্প-ভাবনা ও শ্রমিক আন্দোলন (দেবব্রত চট্টোপাধ্যায় (সম্পা) — **বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধের শতবর্ষ**, কলি, ১৪১৩); বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ও শ্রমজীবি মানুষ (**পরিচয়**, ১০-১২, সংখ্যা, ৭৪ বর্ষ) দাস অমল — বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে শ্রমিক শ্রেণীর ঐতিহাসিক সংগ্রামের স্মরণে (**বজ্রশিখায় বাংলা-য়** অন্তর্ভুক্ত কলিকাতা, ২০০৫)

(১৮) বসু সনৎ — লেবার মুভমেন্ট ইন বেঙ্গল ১৯২০-৩০ (অপ্রকাশিত রচনা সন্দর্ভ)

(১৯) গৌরলে এস. এন — 'ন্যাশনালিষ্টস, আউটসাইডারস অ্যান্ড দ্য লেবার মুভমেন্ট ইন বেঙ্গল ড্যুরিং দ্য নন কো-অপারেশন মুভমেন্ট ১৯১৯-২১' (কপিলকুমার সম্পাদিত গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধ)

দত্ত পার্থ — 'স্ট্রাইকস ইন গ্রেটার ক্যালকাটা রিজিয়ন, ১৯১৮-২৪' (**ইন্ডিয়ান ইকনমিক অ্যান্ড সোস্যাল হিস্ট্রি রিভিউ**, বর্ষ ৩০, সংখ্যা ১, ১৯৯৩)

রায় রজতকান্ত — **আর্বান রুটস অফ ইন্ডিয়ান ন্যাশনালিজম : প্রেশার গ্রুপ অ্যান্ড কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্টস ইন ক্যালকাটা সিটি পলিটিক্স** ১৮৭৫-১৯২৫ (নিউ দিল্লি, ১৯৭৯)

(২০) লাউসে ডেভিড এম — **বেঙ্গল টেররিজম অ্যান্ড দ্য মার্কিস্ট লেফট : অ্যাসপেক্টস অফ রিজিওনাল ন্যাশনালিজম ইন ইন্ডিয়া**, ১৯০৫-৪২ (কলকাতা, ১৯৭৫)

বন্দ্যোপাধ্যায় গীতশ্রী — **কনস্ট্রেইন্টস ইন বেঙ্গল পলিটিকস ১৯২১-৪১ : গান্ধীয়ান লীডারশীপ** (কলিকাতা, ১৯৮৫)

চ্যাটার্জী রাখহরি — **ওয়ার্কিং ক্লাস অ্যান্ড দ্য ন্যাশনালিস্ট মুভমেন্ট ইন ইন্ডিয়া : দ্য ক্রিটিকাল ইয়ার্স** ১৯২০-২৪ (নিউ দিল্লী ১৯৮৪)

সরকার তনিকা — **বেঙ্গল ১৯২৮ - ৩৪ : দ্য পলিটিক্স অফ প্রটেক্ট** (দিল্লি, ১৯৮৭)

চক্রবর্তী বিদ্যুৎ — **সুভাষচন্দ্র বসু অ্যান্ড মিডল ক্লাস র‍্যাডিকালিজম এ স্টাডি ইন ইন্ডিয়ান ন্যাশনালিজম**, ১৯২৮-৪০ (লন্ডন, ১৯৯২)

(২১) বসু নির্বাণ — **দ্য পলিটিক্যাল পার্টিস অ্যান্ড দ্য লেবার পলিটিক্স ১৯৩৭-৪৭ ইউদ স্পেশাল রেফারেন্স টু বেঙ্গল** (কলিকাতা, ১৯৯২)

মিত্র ইরা — বেঙ্গল পলিটিক্স ১৯৩৭-৪৭ উইদ স্পেশাল এমফাসিস অন্ পেজেন্ট অ্যান্ড লেবার মুভমেন্টস (অপ্রকাশিত গবেষণা সন্দর্ভ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯২)

(২২) চন্দ্র-অমিতাভ — ভারতেব কম্যুনিষ্ট পার্টি, জনযুদ্ধ এবং ভারত ছাড়ো আন্দোলন (**অনীক**, ৩১বর্ষ, ২ নং সংখ্যা, আগষ্ট ১৯৯৪)

সেনগুপ্ত অমলেন্দু — **উত্তাল চল্লিশ অসমাপ্ত বিপ্লব** (কলকাতা, ১৯৮৯)

দত্তরায় কেকা — **পলিটিক্যাল আপসার্জেস ইন পোষ্ট-ওয়ার ইন্ডিয়া** ১৯৪৫-৪৬ (নিউ দিল্লি, ১৯৯২)

চট্টোপাধ্যায় গৌতম—দ্য অলমোস্ট রিভোলিউসন : এ কেস স্টাডি অফ ইন্ডিয়া ইন ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬ ('**এসেস ইন অনার অফ এস. সি সরকার** নিউ দিল্লি, ১৯৭৬ এ অন্তর্ভুক্ত)

(২৩) গুপ্ত ইন্দ্রজিৎ — **ক্যাপিটাল অ্যান্ড লেবার ইন জুট ইন্ডাস্ট্রি** (এ. আই. টি. ইউ. সি. পাবলিকেশন, ১৯৫৩)

চক্রবর্তী দীপেশ - প্রাগুক্ত

গোস্বামী ওঁকার — **ইন্ডাস্ট্রি, ট্রেড অ্যান্ড পেজেন্ট সোসাইটি : দ্য জুট ইকনমি অফ ইষ্টার্ন ইন্ডিয়া**, ১৯০০-৪৭ (দিল্লি, ১৯৯১)

বসু নির্বাণ — **দ্য ওয়ার্কিং ক্লাস মুভমেন্ট : ষ্টাডি অফ দ্য জুট মিলস অফ বেঙ্গল**, ১৯৩৭-৪৭ (কলকাতা, ১৯৯২)

দাস অমল — **আর্বান পলিটিক্স ইন অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়ান এরিয়া - স্টাডি অফ মিউনিসিপ্যাল অ্যান্ড লেবার পলিটিক্স ইন হাওড়া**, ১৮৫০-১৯২৮ (কলকাতা, ১৯৯৪)

মিত্র ইরা — প্রাগুক্ত

হান অর্জন দ্য — **আনসেটলড সেটলারস, মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কার্স, অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্যাপিটালিজম ইন ক্যালকাটা** (কলকাতা, ১৯৯৬)

বসু শুভ—ওয়ার্কার্স পলিটিক্স ইন বেঙ্গল ১৮৯০-১৯২৯ : মিল টাউনস, স্ট্রাইকস অ্যান্ড ন্যাশনাল এজিটেশন (গবেষণা সন্দর্ভ, কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৪)

ঘোষ পরিমল — **কলোনিয়ালিসম, ক্লাস অ্যান্ড এ হিস্ট্রি অফ দ্য ক্যালকাটা জুট মিল হ্যান্ডস**, ১৮৮০-১৯৩০ (চেন্নাই, ২০০০)

(২৪) বসু সনৎ — **ক্যাপিটাল অ্যান্ড লেবার ইন দ্য ইন্ডিয়ান টি ইন্ডাস্ট্রি** (এ আই টি ইউ সি পাবলিকেশন, (বোম্বাই, ১৯৫৪)

বসু নির্বাণ — **পলিটিক্স অ্যান্ড প্রটেক্ট ১৯৩৭-৪৭ : এ কমপ্যারাটিভ স্টাডি অফ ফোর মেজর ইন্ডাস্ট্রিস অফ বেঙ্গল**, (কলকাতা, ২০০২)

মজুমদার সত্যেন্দ্রনারায়ণ — **পটভূমি কাঞ্চনজঙ্ঘা**, (কলিকাতা, ১৯৮৩)

সেনগুপ্ত কল্পতরু — যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষের দিনে চা শ্রমিকদের সংগ্রামের কাহিনী — (**পর্যবেক্ষক**, শারদ সংখ্যা, ১৯৮৮)

ভৌমিক সরিৎ — **ক্লাস ফর্মেশন ইন প্ল্যানটেশন সিস্টেম** (নিউ দিল্লি, ১৯৮১)

দাশগুপ্ত রণজিৎ - **ইকনমি, সোসাইটি অ্যান্ড পলিটিক্স ইন বেঙ্গল ঃ জলপাইগুড়ি, ১৮৬৯-১৯৪৭** (দিল্লি, ১৯৯২)

(২৫) মিত্র শিশির — **এ পাবলিক ফ্যাসিলিটি, ইটস ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড দ্য ওয়ার্কার্স ঃ এ কেস স্টাডি অফ দ্য ক্যালকাটা ট্রামওয়েজ**, ১৯৩৯-১৯৭৫ (নিউ দিল্লি, ১৯৮০)

গুহরায় সিদ্ধার্থ — **ক্যালকাটা ট্রামওয়েমেন ঃ এ স্টাডি অফ ওয়ার্কিং ক্লাস হিস্ট্রি**, ১৯২০-৬৭ (কলকাতা, ২০০৭)

মিত্র ইরা — প্রাগুক্ত

(২৬) মুখার্জী, নীলমণি — **'পোর্ট লেবার ইন ক্যালকাটা**, ১৮৭০-১৯৫৩ ঃ সাম ট্রেন্ডস অফ চেঞ্জ (এম. ভি. চৌধুরী সম্পাদিত - **ট্রানস্যাকশন অফ দ্য ইন্ডিয়ান ইনষ্টিট্যুট অফ অ্যাডভানসড স্টাডি**, সিমলা ভল্যুম ৭ (১৯৬৯)এর অন্তর্ভুক্ত)

বোগায়ের্ট মাইকেল ভ্যান ডেন — **ট্রেড ইউনিয়নিজম ইন ইন্ডিয়ান পোর্টস ঃ এ কেস স্টাডি অ্যাক্ট ক্যালকাটা অ্যান্ড বোম্বে** (নিউ দিল্লি, ১৯৭০)

মিত্র ইরা — প্রাগুক্ত

(২৭) বসু নির্বাণ --- **পলিটিক্স অ্যান্ড প্রটেক্ট**, ১৯৩৭-৪৭, প্রাগুক্ত

(২৮) ভৌমিক শ্যামাপদ — **হিস্ট্রি অফ দ্য বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ে ওয়ার্কিং ক্লাস মুভমেন্টস**, ১৯০৬-৪৭ উইদ স্পেশাল রেফারেন্স টু খড়্গপুর (কলিকাতা, ১৯৯৮)

(২৯) মোমিন আব্দুল — **কলকাতার গাড়োয়ান ধর্মঘটের** (১৯৩০) **চারদিন** (কলকাতা, ১৯৮০)

আলি মহ. জুলফিকার — **মুর্শিদাবাদ বিড়ি শিল্প এবং সংযুক্ত শ্রম সম্প্রদায় ঃ একটি সমীক্ষা** (ইতিহাস অনুসন্ধান, ৮, ১৯৯৩)

বাগচী অমিয় — **ওয়েলথ অ্যান্ড ওয়ার্ক ইন ক্যালকাটা**, ১৮৬০ - ১৯২১ (সুকান্ত চৌধুরী সম্পাদিত), **ক্যালকাটা দ্য লিভিং, সিটি**, ভল্যুম ১, কলকাতা ১৯৯০)

বন্দ্যোপাধ্যায় রাঘব — 'রাস্তার মানুষ' (জাতীয় গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত **'বিষয় কলকাতা'** প্রবন্ধ সংকলনের অন্তর্ভুক্ত)

বসু নির্বাণ — কলকাতার কারখানা বহির্ভূত শ্রমিকের আন্দোলন, ১৯৩৭-৪০ (**ইতিহাস অনুসন্ধান** ৪, ১৯৮৯)

সেন রত্না — 'চাইল্ড ব্যাগ পিকার্স অফ ক্যালকাটা'

(মঞ্জু গুপ্ত সম্পাদিত **চাইল্ড লেবার ইন ইন্ডিয়া**, দিল্লি, ১৯৮৭-তে অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধ)

রায় পুলকেশ — দ্য স্টোরি অফ মেথর স্ট্রাইক ইন ক্যালকাটা, ১৮৭৭ (**রিভোল্ট স্টাডিজ, ভল্যুম** ১, নং ১, ১৯৮৫)

চট্টোপাধ্যায় মঞ্জু — কলকাতায় ধাঙড় ধর্মঘট — ১৯২৮ ও ১৯৪০ (**ইতিহাস অনুসন্ধান** ২, ১৯৮৭)

বসু নির্বাণ — প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে কলকাতার ধাঙড় আন্দোলন (**ইতিহাস অনুসন্ধান**, ৬, ১৯৯১)

(৩০) ভট্টাচার্য, যতীন — ভারতের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে মধ্যবিত্ত (**সাপ্তাহিক কালান্তর**, নভেম্বর ৯, ১৯৬৮)

চক্রবর্তী দীপেন্দু — কেরানী কমিউনিজম (**দেশ**, ৫৬বর্ষ, ৪৯ সংখ্যা, ১২ই আগস্ট, ১৯৮৯)

কয়াল অনুরাধা — অর্গানাইজেশন অ্যান্ড মুভমেন্ট অফ হোয়াইট কলার এমপ্লয়িজ ইন বেঙ্গল ১৯৪৫-৪৭ (এম. ফিল. গবেষণা - কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০২)

চক্রবর্তী রাজীব -- ইভোলিউশন অফ ইউনিয়ানিজম ইন দ্য ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কিং উইদ রেফারেন্স টু ইটস ক্লাস ক্যারাক্টারাইজেশন ১৯৪৬-৮৪ (গবেষণা গন্দর্ভ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯২)

পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি — **অধ্যাপক সমিতির ইতিহাসের উপাদান**, ২ খণ্ড (২০০২)

নিখিল বঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি — **সংগ্রাম আন্দোলনে (১৯৩৫-২০০৫)** (কলকাতা, ২০০৭)

(৩১) দাশ অমল — প্রাগুক্ত

দাশগুপ্ত রণজিৎ — প্রাগুক্ত

কর্মকার সনৎ এবং ঘোষ দেবাশিস — **বজবজে শ্রমিক আন্দোলন**, (কলকাতা, তারিখবিহীন)

বসু নির্বাণ — হুগলী জিলায় শিল্প শ্রমিকের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন ১৯২১-৪৭ (**হুগলী মহসীন কলেজ স্মারক গ্রন্থ**, ১৯৮৮)

হান, অর্জন দ্য — প্রাগুক্ত

বসু দীপিকা — সংগ্রামী কলকাতার শ্রমজীবী মানুষ (**মূল্যায়ন**, ২৬বর্ষ, নববর্ষ সংখ্যা, ১৩৯৭)

বসু নির্বাণ — শহর কোলকাতার শ্রমিক আন্দোলন (**সমতট**, বিশেষ সংখ্যা, ১৯৯০)

(৩২) চট্টোপাধ্যায় মঞ্জু — বাংলাদেশের প্রথম যুগের শ্রমিক আন্দোলনে মহিলা নেতৃত্ব ১৯২০-৪০ (রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায় ও গৌতম নিয়োগী সম্পাদিত **ভারত ইতিহাসে নারী**-তে অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধ); এবং **ইতিহাস অনুসন্ধান** - ১, ২, ৩, ৪, খণ্ড সমূহ

সেন সুনীল — **দ্য ওয়ার্কিং উইমেন অ্যান্ড পপুলার মুভমেন্টস ইন বেঙ্গল** (কলকাতা, ১৯৮৫)

ডাগমার এ. ই. এংগেলস — দ্য চেঞ্জিং রোল অফ উইমেন ইন বেঙ্গল ১৮৯০-১৯৩০ উইদ রেফারেন্স টু ব্রিটিশ অ্যান্ড বেঙ্গলী ডিসকোর্স অন জেন্ডার (গবেষণা সন্দর্ভ, লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৭)

ব্যানার্জী নির্মলা — **ওয়ার্কিং উইমেন ইন কলোনীয়াল বেঙ্গল মডার্নাইজেশন অ্যান্ড মার্জিনালাইজেশন** (কে. সাংগ্রি ও এস ভাইদ সম্পাদিত **রিকাস্টিং উইমেন : এসেস ইন কলোনীয়াল হিস্ট্রি** নিউ দিল্লি, ১৯৮৯-তে অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধ)

সেন শমিতা -- উইমেন ওয়ার্কাস ইন দ্য বেঙ্গল জুট ইন্ডাস্ট্রি ১৮৯০-১৯৪০ : মাইগ্রেশন, মাদারলুড অ্যান্ড মিলিটান্সী (গবেষণা সন্দর্ভ, কেমব্রিজ বিশ্ববিদালয়, ১৯৯২)

ফার্নান্ডেজ লীলা — দ্য জেন্ডারড ওয়ার্ল্ড অফ ক্লাস অ্যান্ড কমিউনিটি ইন ইন্ডিয়া : দ্য পলিটিক্স অফ অর্গানাইজড লেবার ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল জুট মিলস (গবেষণা সন্দর্ভ, শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৪)

রায়চৌধুরী রাখী — **জেনডার অ্যান্ড লেবার ইন ইন্ডিয়া : দ্য কামিনস অফ ইস্টার্ন কোল মাইনস**, ১৯০০-১৯৫০, কলকাতা, ১৯৯৬)

ভদ্র মিতা — চা শিল্পের মহিলা শ্রমিক (**মধুপর্ণী**, জলপাইগুড়ি জেলা সংখ্যা, ১৩৯৪)

চ্যাটার্জী সুপর্ণা — বিশ্বায়ন ও চা বাগানের নারী শ্রমিক (**ইতিহাস অনুসন্ধান**, ১৯, কলিকাতা, ২০০৫)

বসু নির্বাণ — উইমেন ইন ট্রেড ইউনিয়ন মুভমেন্ট ইন বেঙ্গল ১৯২১-৪৭ (**রিভোল্ট-স্টাডিস**, বর্ষ ১, সংখ্যা ২, ডিসেম্বব ১৯৮৫তে অন্তর্ভুক্ত)

(৩৩) দাস আর কে — **হিস্ট্রি অফ দ্য ইন্ডিয়ান লেবার লেগিজলেশন** (কলকাতা, ১৯৪১)

আহমদ মুখতার — **ট্রেড ইউনিয়ন অ্যান্ড লেবার ডিসপ্যুটস ইন ইন্ডিয়া** (বোম্বাই, ১৯৩৫)

বসু দীপিকা — প্রাগুক্ত

বেগম জাহানারা — **দ্য লাষ্ট ডিকেড অফ আনডিভাইভেড বেঙ্গল** (কলকাতা, ১৯৯৪)

চট্টোপাধ্যায় রামকৃষ্ণ — সোশ্যাল পারস্পেকটিভ অফ লেবাব লেজিসলেশন ইন ইন্ডিয়া, ১৮৫৯-১৯৩২ : অ্যাস অ্যাপ্লায়েড টু টী প্ল্যানটেশনস (গবেষণা সন্দর্ভ, কলকাতা বিশ্ববিদালয়, ১৯৮৯)

সেন শমিতা — আনসেটলি্ দ্য হাউসহোল্ড : অ্যাক্ট অফ, ১৯০১ অ্যান্ড দা রেগুলেশন অফ উইমেন মাইগ্রান্টস ইন কলোনীয়াল বেঙ্গল (**ইন্টারন্যাশনাল রিভিয়্যু অফ সোশ্যাল হিস্ট্রি**, ভল্যুম ৪১, ১৯৯৬ তে অন্তর্ভুক্ত)।

(৩৪) চক্রবর্তী দীপেশ — প্রাগুক্ত

ম্যাকফারসন কেনেথ — দ্য মুস্লিমস অফ ক্যালকাটা ১৯১৮-১৯৩৫; এ স্টাডি অফ দ্য সোসাইটি অ্যান্ড পলিটিক্স অফ এন আর্বান মাইনরিটি গ্রুপ ইন ইন্ডিয়া (গবেষণা সন্দর্ভ, অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ইউনির্ভাসিটি, ১৯৭২)

বসু নির্বাণ -- সাম্প্রদায়িকতা ও বাংলার শিল্প শ্রমিক আন্দোলন (**ইতিহাস অনুসন্ধান**, ১, ১৯৮৬)

মিত্র ইরা — প্রাগুক্ত

বসু মৃণালকুমার — গো হত্যা : তেলিনীপাড়ার শ্রমিক ও ভদ্রলোক (ইতিহাস অনুসন্ধান, ৪, ১৯৮৯)

(৩৫) আমেদ কামরুদ্দীন — **লেবার মুভমেন্ট ইন ইস্ট পাকিস্তান**, (ঢাকা, ১৯৬৯)

মুখার্জী অনিল — **শ্রমিক আন্দোলনে হাতেখড়ি** (ঢাকা, ১৯৬৯)

সিংহ মণি — **জীবন সংগ্রাম** (ঢাকা, ১৯৮৩)

রায় খোকা — **সংগ্রামের তিন দশক** ১৯৩৮-৬৮ (ঢাকা, ১৯৮৭)

(৩৬) গুপ্ত পার্থসারথি — 'নোটস অন দ্য অরিজিন অ্যান্ড স্ট্রাকচারিং অফ দ্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল লেবার ফোর্স ইন ইন্ডিয়া, ১৮৮০-১৯২০ (আর এস শর্মা ও বিবেকানন্দ ঝা সম্পাদিত — **ইন্ডিয়ান সোসাইটি : হিস্টোরিক্যাল প্রবিসেত্র** - অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধ।

বাগচী অমিয় — **প্রাইভেট ইনভেস্টমেন্ট ইন ইন্ডিয়া** ১৯০০-৩৯ (লন্ডন, ১৯৭২) অধ্যায় ৫

চক্রবর্তী ললিতা — 'ইমার্জেন্স অফ এন ইন্ডাস্ট্রিয়াল লেবার ফোর্স ইন এ ডুয়াল ইকনমি — ব্রিটিশ ইন্ডিয়া ১৮৮০-১৯২০ (**ইন্ডিয়ান ইকনমিক অ্যান্ড সোশ্যাল হিস্ট্রি রিভিউ**, পঞ্চদশ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, ১৯৭৮)

(৩৭) ভট্টাচার্য সব্যসাচী - 'দ্য আউটসাইডার্স : এ হিস্টোরিকাল নোট (অশোক মিত্র সম্পাদিত — **দি ট্রুথ ইউনাইটস-এর অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধ**, কলকাতা, ১৯৮৫)

বসু দীপিকা — ভারতের শ্রমিক আন্দোলনে বহিরাগতের ভূমিকা (**মূল্যায়ন**, ২৯০০, শারদীয়া সংখ্যা, ১৪০০)

বসু নির্বাণ — আউটসাইড লিডারশিপ, পলিটিক্যাল রাইভালরিস অ্যান্ড লেবার মবিলাইজেশন — দ্য জুট বেল্ট অফ বেঙ্গল (অর্জন দ্য হান ও শমিতা সেন সম্পাদিত **এ কেস ফর লেবার হিস্ট্রি** গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধ কলকাতা ১৯৯৯)

দাস অমল — প্রাগুক্ত

(৩৮) সিদ্ধান্ত টি. এন. — স্বাধীনতা পরবর্তীযুগে শ্রমিক আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত খতিয়ান (**সাপ্তাহিক কালান্তর**, ২২ অগাষ্ট, ১৯৭০)

মুখোপাধ্যায় বিনয়কৃষ্ণ — **ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশন অ্যান্ড ট্রেড ইউনিয়নিজম ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল**, ১৯৪৭-৮৭ (কলকাতা, ১৯৯২)

সেন রত্না — ট্রেড ইউনিয়নিজম ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল : রিসেন্ট ট্রেন্ডস (**ইন্ডিয়ান জার্নাল অফ লেবার ইনকমিক্স**, বর্ষ ৩৩, সংখ্যা ৪)

শ্রীবাস্তব ভি. এল. — **এ সোসিও ইকনমিক সার্ভে অফ দ্য ওয়ার্কার্স ইন দ্য কোল মাইনস অফ ইন্ডিয়া** (কলকাতা, ১৯৭০)

বসু রায় সুনীল — **কয়লা শ্রমিক - জীবন ও সংগ্রাম** (দুর্গাপুর, ১৯৮৫)

সেন এস. এন ও পিপলাই তপন — **ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশনস ইন দ্য জুট ইন্ডাস্ট্রি ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল,** ১৯৫১-৬১, (কলি, ১৯৬৮)

ভট্টাচার্য এন. অ্যান্ড চ্যাটার্জী এ. কে. — "সাম সোসিও ইনকমিক অ্যাসপেক্টস অফ জুট ইন্ডাস্ট্রি ওয়ার্কার্স ইন গ্রেটার ক্যালকাটা" (*সোসিও ইকনমিক রিসার্চ ইনস্টিট্যুট বুলেটিন, বর্ষ* - ৫, সংখ্যা ৫, ১৯৭১)

সমাদ্দার রণবীর — **দ্য লেনদেনিং শ্যাডো অফ নিউ টেকনোলজি** (সি. এস. এস. এস. সি, অকেশনাল পেপার, নং ১২৮, কলকাতা, ১৯৯২)

সমাদ্দার রণবীর — 'রুখে দাঁড়ানো শ্রমিক' (**দেশ** ৬১ বর্ষ, সংখ্যা ১৩, ২৩শে এপ্রিল, ১৯৯৪)

দাশগুপ্ত রণজিৎ — 'কানোরিয়ার শ্রমিক আন্দোলন প্রসঙ্গে' (**অনীক**, এপ্রিল মে, ১৯৯৪)

বাগচী, অমিয়কুমার (সম্পাদিত) — **নিউ টেকনোলজি অ্যান্ড দ্য ওয়ার্কার্স রেসপনস** (নিউ দিল্লি, ১৯৯৪)

(৩৯) আহমেদ মুজাফফর — **কম্যুনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া : ইয়ার্স অফ ফরমেশন**, ১৯২১-৩৩ (কলি, ১৯৫৯); **সমকালের কথা** (কলিকাতা ১৯৬৩); **আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি** - ১৯২০-২৯ (কলি, ১৯৬৯)

চক্রবর্তী গোপেন — স্মৃতিকথা (**সাপ্তাহিক কালান্তর**, ৯ই ফেব্রুয়ারী ৬ই এপ্রিল, ১৯৬৩)

বসু মৃণালকান্তি — **স্মৃতিকথা** (কলিকাতা, তারিখবিহীন)

সেন মণিকুণ্ডলা — **সেদিনের কথা** (কলকাতা, ১৯৮২)

সেন রণেন — **বাংলায় কম্যুনিস্ট পার্টি গঠনের প্রথম যুগ**, ১৯৩০-৪৮ (কলিকাতা, ১৯৮১)

মজুমদার সত্যেন্দ্রনারায়ণ — **পটভূমি কাঞ্চনজঙ্ঘা** (কলি, ১৯৮৩)

মুখার্জী সরোজ — **ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও আমরা** (কলিকাতা, ১ম খণ্ড - ১৯৮২; ২য় খণ্ড- ১৯৮৬)

রায় মনোরঞ্জন — **সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রাম ও শ্রমিক আন্দোলন** (কলি, ১৯৮৭)

ঘোষ বীরেশ্বর — **চলার পথে** (বাঁকুড়া, ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ)

দাশগুপ্ত বিমল — **আমার কথা ও ডুয়ার্সের কথা** (জলপাইগুড়ি, ১৪০১ বঙ্গাব্দ)

সেন রবীন — **পাঁচ অধ্যায়** (কলকাতা, ১৯৯৩)

চৌধুরী বিনয়কৃষ্ণ — **অতীতের কথা ঃ কিছু অভিজ্ঞতা** (কলকাতা, ১৯৯৮)

রায় হারাধন — **অগ্নিগর্ভ দিনগুলি** (কলকাতা ২০০২)

(৪০) বসু সজল — **ইন কোয়েস্ট অফ ফ্রিডম ঃ শিবনাথ ব্যানার্জী অ্যান্ড হিজ টাইমস** (কলকাতা, ১৯৯০)

ব্যানার্জী এ্যালবিয়ন রাজকুমার — **অ্যান ইন্ডিয়ান পাথফাইন্ডার** (কলিকাতা, ১৯৭১)

বর্ধন সুপ্রিয় — **"চা বাগিচা শ্রমিক আন্দোলন ও ডুয়ার্সের কালাসাহেব"** (*দাবী*, শারদীয় ১৩৯২, আলিপুরদুয়ার)

(৪১) সাহা পঞ্চানন — **ডিকসনারী অফ বায়োগ্রাফি অফ লেবার লীডার্স** (ভলুম ১, কলিকাতা, ১৯৯৪)

(৪২) নিউম্যান আর কে — **ওয়ার্কার্স অ্যান্ড ইউনিয়নস ইন বোম্বে মিলস** ১৯১৮-২৯ (অস্ট্রেলীয়ান ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, ১৯৮২)

কুইম্যান ডিক — **বোম্বে টেক্সটাইল লেবার ঃ ম্যানেজার, ট্রেড ইউনিয়নস অ্যান্ড অফিসিয়ালস**, ১৯১৮-৩৯ (নিউ দিল্লি, ১৯৮৯)

চন্দ্রভারকর রাজনারায়ণ এস — **ইম্পিরীয়াল পাওয়ার অ্যান্ড পপুলার পলিটিক্স ঃ ক্লাস রেজিশটেন্স এবং দি স্টেট ইন ইন্ডিয়া**, ১৮৫০-১৯৫০ (কেমব্রিজ, ১৯৯৮)

যোশী চিত্রা — কানপুর টেক্সটাইল লেবার ঃ সাম স্ট্রাকচারাল ক্যারাকটারিস্টিক্স অ্যান্ড আসপেক্টস অফ লেবার মুভমেন্ট (গবেষণা সন্দর্ভ, জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৮১)

নায়ার জানকী — **ওয়ার্ক কালচার অ্যান্ড পলিটিক্স ইন প্রিন্সলি মাইশোর** (নিউ দিল্লি, ১৯৯৮)

(৪৩) বাগচী অমিয়কুমার — 'ওয়ার্কার্স অ্যান্ড হিস্টোরিয়ানস বার্ডেন' (**বেঙ্গল পাস্ট অ্যান্ড প্রেজেন্ট**, ভল্যুম ১০৮, পার্ট ১-২, জানুয়ারী-ডিসেম্বর ১৯৯৮)

৭

নারী-শ্রমিক ও অভিবাসন : উত্তর ভারত, বাংলা ও আসাম, ১৮৭০-১৯২০

শমিতা সেন*
অনিন্দিতা ঘোষ**

উত্তর ভারতের অভ্যন্তরে এবং সেখান থেকে বিভিন্ন অঞ্চলে নারীদের অভিবাসন নিয়ে আলোচনা এই প্রবন্ধের মূল উপজীব্য। আলোচনার সুবিধার্থে এই অভিবাসন প্রক্রিয়াকে কয়েকটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়। প্রথমত, নারীদের একধরণের অভিবাসন ঘটে থাকে যেখানে পারিবারিক নিয়ন্ত্রণ কোনোভাবে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয় না, বরং পারিবারিক কৌশল অনুযায়ী গ্রামীণ অর্থনীতির মধ্যে নারী শ্রমিকদের সহজসাধ্য নিযুক্তিকরণ হয়। দ্বিতীয়ত, শিল্প ও খনি অঞ্চলের নারীদের অভিবাসন ঘটে পরিবারের একজন সদস্য হিসাবে বা 'একক' অভিবাসিত হিসাবে। তৃতীয়ত, বিদেশে চুক্তির মাধ্যমে নারী-শ্রমিক নিযুক্ত করা হতো। চতুর্থত, আসামের চা-বাগানগুলিতে নারীদের শ্রমিক হিসাবে অভিবাসন প্রক্রিয়া, যা শ্রমিক হিসাবে নারীদের নিয়োগের সবচেয়ে পীড়াদায়ক চিত্রটি আমাদের সামনে তুলে ধরে। এই নিয়োগকারীদের বিরুদ্ধে অপহরণ ও প্রতারণার নানা অভিযোগ বারবার এক্ষেত্রে উঠেছে এবং ১৮৭০ সাল থেকে নিয়োগকারীদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগের ঘটনাও ঘটেছে। এই বিতর্কের পরিণামে অবশেষে ১৯০১ সালে কিছু আইন প্রণয়ন করা হয়। এই নতুন আইনের বলে ভারত সরকার বিবাহিত নারীদের তাদের অভিভাবক বা স্বামীর মত ছাড়া নিয়োগ করা যাবে না, এই মর্মে

*অধ্যাপক ও কর্মাধ্যক্ষ, মানবীবিদ্যাচর্চা কেন্দ্র, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
**গবেষণা সহায়ক, মানবীবিদ্যাচর্চা কেন্দ্র, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

ঘোষণা করেন। এই আইনের পর্যালোচনায় এটা প্রতীয়মান হয় যে, একদিকে গ্রামস্তরে পরিবারের অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে নারীদের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে, অন্যদিকে পরিবারের মধ্যে নারীদের শ্রমের ওপর পুরুষদের দাবি সরকারের অনুমোদিত বা স্বীকৃত।

ভারতীয় গ্রামগুলির দিকে তাকালে আমরা নারীদের শুধুমাত্র একজন কৃষক-রমণী হিসাবে দেখতে পাই না। ক্ষুদ্র এবং প্রান্তিক চাষীদের পরিবারের নারীরা অনেক ব্যাপক অর্থে কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত থাকত। বপন ও পরিদর্শন ছাড়াও পণ্য উৎপাদন, ফসলের ঝাড়াই-মাড়াই, গবাদি পশুর খাদ্যের সংস্থান, খাদ্যের প্রক্রিয়াকরণ, বিক্রয় এবং এমনকি পারিশ্রমিক-ভিত্তিক কাজ সবই নারীরা করতেন।[১] নারীদের কাজের ক্ষেত্র এতটাই বিস্তৃত ও তা এতটাই বাজারভিত্তিক যে, পরিবারের প্রয়োজন অনুযায়ী নারীদের পর্দাপ্রথার বা তথাকথিত 'আব্রু'-র সঙ্গে সমঝোতায় আসতেই হয়েছিল। উনিশ শতকীয় ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের কর-সংক্রান্ত নানান নীতির প্রবর্তন দরিদ্র গ্রাম্য পরিবারের নারী-শ্রমিকদের অবস্থানকে আরও সংকটপূর্ণ করে তোলে। চক্রবৃদ্ধি হারে কর এবং খাজনার ভার সামলাতে না পেরে পরিবারের কর্তারা নারী ও শিশুদের ওপরেও কিছু বোঝা চাপিয়ে দিতে বাধ্য হয়। রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক হিসেব-নিকেশে পারিবারিক শ্রমের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল। তাই রাষ্ট্রীয় আধিকারিকবর্গ পরিবারের কর্তৃত্ব তথা পরিবারের পিতৃতান্ত্রিক ক্ষমতার বৃদ্ধিকরণ এবং নারী ও শিশুদের ওপর পুনরায় নির্ভরশীলতাকে মদত দিত।[২] রাষ্ট্রে নতুন আইনী প্রথায় জমি ও অর্থের উপর পুরুষ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয় ও পরিবারের মধ্যে লিঙ্গ-বৈষম্য আরও তীব্র আকার ধারণ করে। ফলে, পুরুষরা তাদের বর্ধিত-পারিবারিক কর্তৃত্বের দ্বারা পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার নতুন নতুন ক্ষেত্রে নিজেদের বেতনভুক শ্রমিক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়। অন্যদিকে নারী ও শিশুরা অপেক্ষাকৃত নিম্নপদে, কম বেতনের পুনরুৎপাদনশীল ক্ষেত্রে নিযুক্ত হতে থাকে। ১৮৬০-এর দশক থেকেই নারী ও শিশু-শ্রমিকদের অবৈতনিক শ্রমের মাত্রা অত্যধিক বৃদ্ধি পায়, অন্যদিকে বেতনভুক নারী ও শিশু-শ্রমিকের মাত্রা হতে থাকে ক্রমনিম্নগামী।[৩]

উনিশ শতকে নারীদের আরো দৃঢ়ভাবে পারিবারিক নিয়ন্ত্রণে আনার মুখ্য উপায় ছিল বিবাহ। এইসময় বিবাহ কার্যত ছিল সার্বজনীন। ১৯১১ সালে ১৫ বছরের উপরে মাত্র ২% এবং ২০ বছরের উপরের কেবল ০.৮% নারী অবিবাহিত ছিল। জনগণনা কমিশনারের মতে, এই অবিবাহিতদের মধ্যে আবার একটা বড় অংশ গণিকাবৃত্তিতে নিয়োজিত ছিল। 'প্রকৃত কুমারী' সেই সময়কার ভারতীয় সমাজে খুবই অপ্রতুল ছিল।[৪] উনিশ শতকীয় ব্রিটিশ আইনে নারীদের এরকম কোনো সুযোগ-সুবিধা ছিল না যাতে

তারা তাদের অসুখী বিয়ে ভেঙে বেরিয়ে আসতে পারে। পরিবার নারীদের অভিবাসনে বাধা প্রদান করত এবং তাদের পারিশ্রমিকের বিনিময়ে শ্রমদানে নিযুক্ত করত, বিশেষত পারিবারিক আর্থ-কাঠামোর মধ্যে তাদের নিযুক্ত করা হতো এবং যখন গ্রামে আয়ের উৎস সম্পূর্ণভাবে নিঃশেষিত হয়ে যেত তখন নারীরাও পরিবারগতভাবে অভিবাসিত হতো। আসলে নারীদের অভিবাসন তখনও ঘটত, কোনো কোনো সময় দীর্ঘ দূরত্বে।

উত্তর ভারতে বেশিরভাগ মেয়েরই তাদের জন্মস্থান থেকে অনেক দূরের গ্রামে বিয়ে হতো। সেই অর্থে প্রতিটি গ্রামের মেয়েই তাদের বিবাহের মাধ্যমে অভিবাসিত হতো।[৫] এই বিষয়কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে অনেক লোকসংগীত, যেখানে জীবনের এইদিকের চিত্র খুব স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। প্রায় বেশিরভাগ উত্তর ভারতীয় মেয়ের ক্ষেত্রেই প্রথমে নিজে বধূ হিসাবে এবং পরে নিজের মেয়ের থেকে এধরণের বিচ্ছেদের দুঃখময় অভিজ্ঞতা ছিল। বৈবাহিক বা এই ধরণের দাম্পত্য সম্পর্কের জন্য মেয়েরা যেন সারা জীবনের জন্য পিতৃগৃহ ছেড়ে চলে যাচ্ছে—এমন চিত্রই চিত্রায়িত হতো। প্রকৃতপক্ষে বেশিরভাগ মেয়েরই সারাজীবন পিতৃগৃহ ও শ্বশুরগৃহে চলাচল ছিল এবং জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে এই চলাচলের প্রকৃতি আলাদা ছিল। উত্তর ভারতীয় সমাজে মেয়েরা তাদের পিতৃগৃহে প্রথম সন্তান জন্মানোর সময় এবং বার্ষিক কোনো অনুষ্ঠানের সময় আসতে পারত। কোনো কোনো সময় বিবাহিত নারীদের পরিভ্রমণের ক্ষেত্রে এবং পর্দাপ্রথার বিভিন্নতার জন্য তাদের পিতা এবং শ্বশুর, উভয় গৃহেই শ্রমিক হিসাবে নিয়োগ করা হতো। বিয়ের আগে বা পরে প্রয়োজন অনুযায়ী পর্দাপ্রথার সঙ্গে মেয়েদের এক পারস্পরিক সমঝোতায় আসার ঘটনা বিরল ছিল না। বিবাহিত মেয়েরা যখন মাঠে চাষের বা বপনের কাজ করত, তখন অনেক সময়েই তারা তাদের শ্বশুরবাড়ির বয়ঃজ্যেষ্ঠদের থেকে আড়াল করতে কোনোরকম চেষ্টা করত না।[৬] আবার মেয়েরা অনেক সময় দল বেঁধে পুরুষদের থেকে পৃথক হয়েও মাঠে কাজ করত। মারাঠা কৃষক রমণীরা মাঠে চাষের কাজ করবার সময়েও তাদের মুখ ঢেকে রাখত।[৭] পর্দাপ্রথার সঙ্গে এই ধরণের পারস্পরিক সমঝোতা নারী-কৃষি-শ্রমিকেরা মরশুমী অভিবাসনের সময় করেই থাকত।

এইভাবে কম দূরত্বে ব্যক্তিগতভাবে নারীদের অভিবাসন অনেক সময়েই পুরুষদের অভিবাসনকে ছাপিয়ে যেত। বিশেষত, গ্রামে আন্তঃরাজ্যে যুক্ত কৃষি অভিবাসনের ক্ষেত্রে, নারীদের বেশি বেশি সংখ্যায় পাওয়া যেত। এর মধ্যে মাত্র কয়েকটি অভিবাসন বিবাহের মাধ্যমে হতো।[৮] বিংশ শতাব্দীতে কৃষি শ্রমিক হিসাবে এইরকম সাময়িক ও মরশুমী অভিবাসন জেলার গ্রামগুলিতে এক সময়ে অভিবাসিতের সংখ্যা ব্যাপক মাত্রায় বাড়িয়ে দিয়েছিল। ১৯৩০ সালের ডিস্ট্রিক্ট গেজেট অনুযায়ী উত্তর বিহারের সারণে

মোট অভিবাসিতের অর্ধেক এইরকম সাময়িক কাজের জন্য এসেছিল এবং এদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল নারী।[৯] শ্রমিক পরিবারগুলির নারীরা কৃষির মরশুমে সাধারণত এইরকম সাময়িকভাবে কাজের খোঁজে বেরিয়ে পড়ত—কখনও একা, আবার কখনও বা গোষ্ঠীবদ্ধভাবে। এইভাবে নারী-শ্রম একটি পরিবারের রুজি-রোজগারের অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায় এবং এই মরশুমী অভিবাসন ছিল পারিবারিক কর্তৃত্বের গণ্ডীর মধ্যেই, বরং বলা যায় নারীদের এই ধরণের অভিবাসন ছিল ক্ষুদ্র এবং প্রান্তিক কৃষক পরিবারের রুজির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

পরিবার-বহির্ভূত শ্রমিক : কারখানা ও খনিতে নারীরা

উনিশ শতকের মধ্যভাগে বিহার এবং যুক্তপ্রদেশ ছিল ভারতের দুটি শহরের শ্রমিকদের মূল যোগানদার—একটি কলকাতা, অন্যটি বোম্বাই। যদিও, পাট এবং বস্ত্রশিল্পে পুরুষরাই শ্রমিক হিসাবে আসত, তা সত্ত্বেও এইসব শিল্পে নারীদেরও নিয়োগ করা হতো। কলকাতার এবং বোম্বাইয়ের প্রাপ্তবয়স্ক জনসংখ্যার প্রায় ৩০%-৪০% ছিল এই নারীরা।[১০] সর্বোচ্চ, বোম্বাইয়ের কারখানাগুলিতে প্রতি ৪ জন শ্রমিকের ১ জন এবং কলকাতায় প্রতি ৫ জন শ্রমিকের ১ জন ছিল নারী। এই নারী-শ্রমিকদের অধিকাংশই বাইরে থেকে আসত, খুব কমসংখ্যকই স্থানীয় অঞ্চলগুলি থেকে নিয়োগ করা হতো। এদের মধ্যে কিছু নারী পরিবারের সদস্য হিসাবেই অভিবাসিত হতো, আর বাকিরা গ্রাম থেকে শহরে আসত রোজগারের আশায়।

গ্রাম-শহরের মধ্যে অভিবাসনের ক্ষেত্রে নারীদের অপেক্ষাকৃত কম অংশগ্রহণের অনেকে অনেক রকম ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন। কোনো কোনো ঐতিহাসিক চাহিদার দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।[১১] নানা কারণে কারখানার মালিকরা নারী অপেক্ষা পুরুষ শ্রমিক নিয়োগেই বেশি উৎসাহিত ছিল।[১২] আবার কারোর মতে ঐতিহ্যগত সংস্কৃতি নারীদের এই সঞ্চালনের পথে বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়াত। যেসব পুরুষরা পরিবারের আয়ের জন্য শহরে অভিবাসিত হতো বা হতে বাধ্য হতো, তারা কখনোই তাদের সঙ্গে নিজেদের স্ত্রীদের শহরে আনত না। কারণ গ্রামে নিজেদের অধিকার বা মর্যাদা তারা হারাতে চাইত না। দাগমাব এঙ্গেলস্ তাঁর বাংলার নারীদের নিয়ে গবেষণাপত্রে দেখিয়েছেন যে, এর পশ্চাতে ভারতীয় ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ কতটা কাজ করত। বিশেষ করে বিহার ও যুক্তপ্রদেশে এই ঘটনা বেশি করে দেখা যেত।[১৩] আব্দুল হাকিমও ১৯৩০ সালে রয়্যাল কমিশনের কাছে যুক্তপ্রদেশ থেকে আগত শ্রমিক নিয়ে এই বক্তব্যই পেশ করেন। তারপর থেকে ঐতিহাসিকরা এই উদ্ধৃতির মারফত বারবার প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন যে, সম্ভ্রান্ত কৃষক পরিবারের রমণীরা কখনোই শহরে যান না।

বিভিন্ন শ্রম কমিশন বিভিন্ন সময়ে যে মৌখিক প্রমাণ সংগ্রহ করেছে, সেগুলি থেকে অন্য ব্যাখ্যাও হয়। যেসব নারীরা বিধবা বা স্বামী-পরিত্যক্তা বা নিঃসন্তান, বা যাদের সংসারে কোনো পুরুষ উপার্জনকারী নেই তারা অনেক সময়েই শহরে এসে কারখানাতে কাজ গ্রহণ করত। গ্রাম্য অর্থনীতিতে জীবিকার উপায়গুলি ক্রমশ হ্রাস পাওয়ায় এই নারীরা কাজের সুযোগের জন্য শহরে আসতে বাধ্য হতো।[১৪] অত্যাচারী বাবা বা স্বামীর হাত থেকে পালানোরও এই একই পন্থা ছিল। এই ধরণের নারীদেরই কলকারখানায় বেশি দেখা যেত। ১৮৯১ সালের কমিশন যেসব মেয়েদের সাক্ষাৎকার নিয়েছিল তাঁরা সকলেই বিধবা ছিলেন এবং বৈধব্যই তাঁদের কারখানায় কাজ গ্রহণ করতে বাধ্য করেছে বলে তাঁরা জানিয়েছিলেন।[১৫] এমনকি ১৯৩০ সালেও এই চিত্র খুব একটা বদলায়নি।[১৬]

নারী-শ্রমিকরা সাধারণত সমাজের নিম্নস্তর থেকে আসত, যেমন, মুচি বা চামার, তারা কারখানাগুলিতে প্রায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে কাজ করত। অর্থাৎ গ্রামের সঙ্গে তাদের বিচ্ছেদ প্রায় সম্পূর্ণ হতো। অবশ্য অধিকাংশ পুরুষের ক্ষেত্রে তা হতো না — তাদের সংসার, জমি, ভিটে—ইত্যাদির মাধ্যমে গ্রামের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক বজায় থাকত। শহরের স্থায়ী বাসিন্দা যে নারী-শ্রমিকেরা, তাদের সমাজচ্যুত, কুলভ্রষ্ট, চরিত্রহীন ইত্যাদি নেতিবাচক বিশেষণে আখ্যায়িত করা হতো। এই মেয়েরা যেন শহরের সামাজিক অবক্ষয়ের প্রতীক ছিল। জাতি ও লিঙ্গভিত্তিক ভেদাভেদের উপর গ্রামীণ সমাজের যে নৈতিকতার ধারণা ছিল, শহরজীবনে তার অবনমনের সঙ্গে নারী-শ্রমিকের চিত্রায়ণ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত হয়ে পড়ে।

যেসব মেয়েরা শহরে তথা কারখানার কাজে নিয়োগের জন্য অভিবাসিত হতো তাদের প্রায়শই প্রান্তীয় হবার জন্য কলঙ্কিত করা হতো। এই বিষয়ে সবচেয়ে সংবেদনশীল মতামত আমরা ডাগমার কুর্জেল-এর কাছ থেকে পাই। আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগঠনের ১৯১৯ সালের মাতৃত্বজনিত সুবিধা-সংক্রান্ত চুক্তি কতটা সফলভাবে প্রয়োগ করা যায়, তা অনুসন্ধানের জন্যই ডঃ কুর্জেলকে ভারত সরকার নিয়োগ করেছিল। তিনি পাট কারখানাগুলির শ্রমিকদের পরিবার-বহির্ভূত চরিত্র নিয়ে বেশ কিছু তথ্য-প্রমাণ তাঁর রিপোর্টে দিয়েছিলেন। তাঁর লেখা থেকে জানা যায় যে, অভিবাসিত শ্রমিকরা তাদের সঙ্গে করে যেসব মেয়েদের আনত তারা তাদের স্ত্রী নয়। পুরুষদের সাহায্য ছাড়া নারী-শ্রমিকদের পক্ষে অনেক সময়ই বসবাস করা সম্ভব হতো না। তিনি আরো লিখছেন যে, কারখানাগুলিতে যেসব বাঙালী মেয়েরা শ্রমিক হিসাবে থাকত তারা অত্যন্ত নিম্নস্তরের এবং বেশিরভাগই ছিল গণিকা।[১৭] যেসব পুরুষ-শ্রমিকরা গ্রামে পরিবার রেখে আসত, এইসব নারী-শ্রমিক তাদের সঙ্গে স্বল্পমেয়াদী সহবাসের সম্পর্কে

থাকত। ১৯৪০ সাল নাগাদ এই মতামত যথেষ্ট গ্রহণীয় হয়ে ওঠে। ভারতীয় শ্রমিক শ্রেণী নিয়ে প্রথম বৃহৎ আকারে গবেষণা করেছিলেন ঐতিহাসিক রাধাকমল মুখোপাধ্যায়। তিনি দেখিয়েছেন যে, পুরুষ-শ্রমিকরা একা শিল্প-শহরগুলিতে কাজের জন্য আসত, পরিবার নিয়ে আসত না। ফলত, স্ত্রী-পুরুষ অনুপাতের এক অস্বাভাবিক অসাম্য তৈরী হতো। এর অনিবার্য ফল ছিল, গণিকাবৃত্তিতে উৎসাহ প্রদান এবং যৌনব্যাধির প্রসার।[১৮] বিভিন্ন সরকারী নথি ও স্বাধীন গবেষকদের পর্যবেক্ষণ থেকে জানা যায় যে, যেসব মেয়েরা আর গ্রামে ফিরে যেতে পারত না এবং যেসব পুরুষ অভিবাসিত স্থানীয় মেয়েদের সঙ্গে নানারকম সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ত, তারাই সাধারণত শিল্প-শহরগুলিতে স্থায়ীভাবে বসবাসের চেষ্টা করত।[১৯]

শিল্পের থেকে আমরা খনির দিকে নজর ফেরালে দেখতে পাই যে, নারী-শ্রমিকদের এক্ষেত্রে পরিবারেরই অংশ হিসাবে গণ্য করা হতো। ১৯২১ সালের তথ্য থেকে দেখা গেছে যে, বাংলা-বিহারের রাণীগঞ্জ, ঝরিয়া অঞ্চলে সে সময় সমগ্র ভারতের প্রায় ৯০% কয়লা উত্তোলিত হতো এবং সেখানকার শ্রমিকের সংখ্যা ২,০০,০০০ ছাড়িয়ে গিয়েছিল।[২০] ১৯২০ সালে এখানে সবথেকে বেশি নারী-শ্রমিক নিয়োজিত হয়েছিল, — সমগ্র শ্রমিকের প্রায় ৩৭.৫%। বেশিরভাগ শ্রমিকই আসত ঐ অঞ্চলেরই প্রত্যন্ত জায়গা থেকে এবং এদের অভিবাসন-সংক্রান্ত পরিভ্রমণ ছিল খুবই কম সময়ের জন্য।[২১] প্রায় ৭০% শ্রমিক উত্তর ভারতের সমাজের প্রায় নিম্নস্তর বা অন্ত্যজ শ্রেণী থেকে আসত। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক কর্মাধিকারীরা এদের ভারতের আদিম বা প্রায়-আদিম অধিবাসী বলে বর্ণনা করত, যারা নিজেদের অঞ্চলে বেশ প্রপীড়িতই ছিল (যথা : বাউরি, ভুঁইঞা, কুর্মী, ঘাটওয়াল, টুরি, চামার, ডোম, মুশাহার, দোসাদ প্রমুখ)।[২২] এই শ্রেণীর মেয়েরা গৃহে উৎপাদন বা অন্যান্য কাজকর্মে যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত, তা-ই খনি শিল্পে সঞ্চালিত হয়েছিল।

১৯৩০-এর দশক পর্যন্ত কয়লাখনির কাজ হতো শ্রমিকদলভিত্তিক। এক একটি দলে পুরুষ, নারী ও শিশু-শ্রমিক থাকত এবং এদের মধ্যে সুস্পষ্ট শ্রমবিভাজন করা ছিল। পুরুষরা কয়লা খুঁড়ে বের করত ও কাটত এবং নারী ও শিশুরা তা বয়ে নিয়ে যেত। তাদের মাইনেও সাধারণত সেই গোষ্ঠীর মাইনের অন্তর্ভুক্ত থাকত। এই ধরণের শ্রম আয়োজন অনেক সময়েই পরিবারভিত্তিক শ্রমপ্রথা হিসাবে ভুল করা হতো। রয়্যাল কমিশন অফ্ লেবার (১৯৩০-৩১)-এর দ্বারা সংগৃহীত তথ্যে দেখা যায় যে, খনি অঞ্চলে অভিবাসিত নারীদের অর্ধেকই ছিল পরিবার-বহির্ভূত, একক অভিবাসিত। নারী-শ্রমিকদের মধ্যে প্রায় ৩০% তথাকথিত পরিবারের অন্তর্ভুক্তও ছিল না এবং শ্রমভিত্তিক গোষ্ঠীর পুরুষদের সঙ্গে কাজের বাইরে সামাজিক কোনো সম্পর্কও ছিল না। গোষ্ঠীর

মধ্যে সাধারণত এইসব নারী-পুরুষদের সম্পর্ক ছিল কয়লা বহনের ওপর নির্ভরশীল—দাগমার এঙ্গেলস্ এভাবেই পুরো বিষয়টিকে দেখেছেন। মাত্র ১০% নারী, পুরুষ সহকর্মীদের সঙ্গে কাজের বাইরেও সম্পর্ক তৈরি করত। কিন্তু ৪০% মেয়ের ক্ষেত্রে কোনোরকম বৈবাহিক সম্পর্ক ছিল না এবং তারা নিজেরাই নিজেদের অভিবাসন সংক্রান্ত সমস্ত সমস্যা সামলাত।[২৩]

খনিতে কাজ করা মেয়েরা পরিবারের অন্তর্ভুক্ত, এই ভুল চিত্রায়নের জন্য তাদের বড় খেসারত দিতে হয়েছিল। ১৯২৯ সালে মেয়েদের খনিতে মাটির নীচে কাজ করা নিষিদ্ধ হয়ে যায়।[২৪] যে নারী-শ্রমিকেরা কর্মচ্যুত হন তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন পরিবারের একমাত্র অথবা প্রধান উপার্জক। এই সংসারগুলি চরম দুরবস্থার সম্মুখীন হয়। খনির মালিক এবং সংস্কারকদের ধারণা ছিল যে, মেয়েদের মাটির নীচের কাজ বন্ধ হলেও সেই পরিবারগুলি কর্মরত পুরুষদের আয়ের সুবিধা ভোগ করবে। অনুরূপ ঘটনা আবার ঘটে ১৯৩৭ সালে, যখন খনি শ্রমিক সংকোচনের কাজ শুরু হয়, তখন প্রায় ৬০% প্রাপ্তবয়স্ক মহিলা তাদের কাজ হারায়।

স্বাধীন ভারতে শিল্প ও খনি অঞ্চলে নারীদের ভূমিকা ক্রমাগতই প্রান্তিক হতে থাকে। পুরুষ-শ্রমিকরা রাষ্ট্রীয় আইনের প্রবর্তনের ফলে নানান সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে থাকে, উপরন্তু শ্রমিক সংগঠনের মাধ্যমে তারা নিজেদের সংগঠিত করতে থাকে। মেয়েরা এই কর্মকাণ্ড থেকে প্রায় বিতাড়িত হয়েছিল বলা চলে। সংগঠিত শ্রমিক আয় বৃদ্ধির দাবি জানাতে থাকে এবং এই চাহিদায় জয়ী হতেও শুরু করে। একজন পুরুষের আয়ের ওপর নির্ভরশীল শ্রমজীবি পরিবার নতুন করে গঠিত হতে থাকে। এই নতুন উন্নতিশীল শ্রমিক পরিবারের স্বপ্ন গৃহবন্দী স্ত্রী ও কন্যা, সাংসারিক জীবনে পরিতৃপ্তি। যেহেতু এই ধরণের মূল্যবোধ শ্রমিক, সংগঠক এবং মালিক—সব শ্রেণীর পুরুষেরই গ্রহণযোগ্য ছিল, তাই সংগঠিত শিল্পের ক্ষেত্র থেকে নারী-শ্রমিক বিতাড়ন সহজসাধ্য হয়। এর ফলে যখন দরিদ্র নারীদের অবস্থার চাপে পড়ে কাজে যুক্ত হতেই হতো, তারা আর সংগঠিত শ্রমিকের পদমর্যাদার নাগাল পেত না।

স্বাধীনতা না ছাড়পত্র? বিদেশে নারী-শ্রমিক নিয়োগ

প্ল্যানটেশনের ক্ষেত্রে লিঙ্গভিত্তিক সম্পর্ক সম্পূর্ণ পৃথক এক পথ ধরে চলে। এই শ্রমিকরা প্রায় প্রথম থেকেই চুক্তির মাধ্যমে যথেষ্ট সংগঠিত ছিল এবং ঔপনিবেশিক কাল থেকেই তীক্ষ্ণ রাষ্ট্রীয় সমীক্ষা ও আইনের আওতাভুক্ত ছিল। দ্বিতীয়ত, প্ল্যানটেশনে বরাবরই মেয়েদের চাহিদা বেশি ছিল, কারণ এক্ষেত্রে কিছু কিছু কাজ একান্তই 'মেয়েলী' হিসেবে চিহ্নিত। একারণে বাগিচা-মালিকরা মেয়েদের নিয়োগ করতে যথেষ্ট

উৎসাহী ছিল—তা একক বা পরিবারভুক্ত যেভাবেই হোক না কেন। তৃতীয়ত, নারীদের অংশগ্রহণ শ্রমিক সংগঠনে বা রাষ্ট্রীয় আইনীকরণে স্বীকার করা হয়নি। শিল্প এবং খনির পুনর্গঠনের ফলে নারীরা নির্ভরশীল এবং সংসারে আবদ্ধ 'স্ত্রী'-তে রূপায়িত হয়। বাগিচাগুলিতে কিন্তু সবসময়ই উত্তর ভারতের গ্রামাঞ্চল থেকে আগত মেয়েদের নিয়োগ করার চেষ্টা করা হতো এবং তারা নতুন স্থানে বসতি স্থাপন করত। ১৮৩০ সাল থেকেই বিদেশে, বিশেষ করে ওয়েস্ট ইন্ডিজে প্ল্যানটেশনের জন্য দালালদের দ্বারা চুক্তির মাধ্যমে নারী-শ্রমিকদের নিয়োগ করার ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিতর্ক আবর্তিত হতে থাকে। ১৮৭০-১৮৮০'র দশকে যখন আসামের চা-বাগানে ব্যাপক হারে মেয়েদের নিয়োগ করা শুরু হয়, তখন বিতর্ক আরো বৃদ্ধি পায়।

১৮৩০ সালে দাসপ্রথার অবসানের পর অস্ট্রেলিয়া ও ক্যারিবিয়ান উপনিবেশগুলিতে চুক্তিবদ্ধ ভারতীয় শ্রমিকদের রপ্তানী শুরু হয়। এই ধরণের বিদেশী উপনিবেশগুলিতে অভিবাসনের অর্থই ছিল দীর্ঘ দূরত্ব অতিক্রম এবং দীর্ঘদিনের জন্য, যেমন—১ থেকে ৫ বছরের বা তারও বেশি বছরের চুক্তি হতো। এই সময় পুরুষদের কুলি হিসাবে একক অভিবাসনের ওপরেই জোর দেওয়া হতো। প্রথমবার ১০০ জন নারী ও ৬০০০ জন পুরুষ অভিবাসিত হয়।[২৫] আসলে বাগিচা-মালিকরা মেয়েদের ভবিষ্যৎ গর্ভসঞ্চার ও সন্তানজন্মের দায়িত্ব নিতে রাজি ছিল না।

ভারতীয় শ্রমিকদের বিদেশে পাঠানোর জন্য বেশ কিছু সমালোচনার সৃষ্টি হয়, যার অন্যতম ছিল পুরুষ-অভিবাসিতদের দেশের বাড়িতে রেখে যাওয়া পরিবারের অবস্থা। কিন্তু, সরকার এই ধরণের অভিযোগের প্রতি কোনোভাবেই সহানুভূতিশীল ছিল না।[২৬] যেসব উপনিবেশে তারা শ্রমিক হিসাবে নিয়োজিত হতো সেখানে সম্পূর্ণ পুরুষ-সমৃদ্ধ পৃথিবীতে পরিবারের অনুপস্থিতিতে বাস করায় নানান সমস্যা দেখা দিত। নিয়োগকারী দেশের ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষ এই সামাজিক অস্থিরতা, ক্রমবর্ধমান অপরাধের মাত্রা এবং প্রায় মহামারীর মতো স্ত্রী-হত্যা নিয়ে খুবই চিন্তিত ছিল। এই অবস্থায় ব্রিটিশ সরকার বিষয়টি নিয়ে ভাবতে শুরু করে।[২৭]

১৮৫৮ থেকে ১৮৬০-এর মধ্যে অভিবাসনের হার মারাত্মক বৃদ্ধি পায়।[২৮] এই সময়ের মধ্যে প্রায় ৫১,২৪৭ জন শ্রমিক কলকাতা থেকে বিদেশে যাত্রা করে। বেশ কিছু নীতি প্রয়োগের উদ্যোগ ব্যর্থ হওয়ায় ১৮৬৮ সালে ভারত সরকার আইন প্রয়োগের মাধ্যমে প্রতিটি যাত্রার সময়ে স্ত্রী-পুরুষের অনুপাত স্থির করে দেয়। প্রতি ১০০ জন পুরুষের সঙ্গে ৪০ জন মহিলা—এই অনুপাত স্থির হয়। ব্যতিক্রম ছিল মরিশাস। মরিশাসে এই সংখ্যা হয় প্রতি ১০০ জন পুরুষে ৩৩ জন মহিলা।[২৯]

সমগ্র পরিবারের অভিবাসনের মাধ্যমে ভারতীয় শ্রমিকদের একটা সমাজ তৈরির জন্য ব্রিটিশ সরকারের তরফ থেকে বরাবরই একটা চাপ ছিল।[৩০] উনিশ শতকের শেষ ভাগ থেকে ক্যারিবিয়ান বাগিচা-মালিকদের মধ্যেও নারীদের অভিবাসন সংক্রান্ত ব্যাপারে উৎসাহ দেখা যায়।[৩১] এই সময় থেকে বেশ বেশি সংখ্যায় নারীরা অভিবাসিত হতে শুরু করে, যদিও এর পেছনে কোনো আইন বা অতিরিক্ত অর্থ কিছুই প্রণোদন হিসাবে কাজ করেনি। এই প্রথা প্রচলিত হবার পরেই তৎকালীন সরকার মেয়েদের কম অভিবাসন সংক্রান্ত একটি বিশেষ ফাইল খুলতে বাধ্য হয়েছিল। এর ফলে নির্ধারিত অংশ বা কোটা (Quota) ব্যবস্থাকে এড়ানো সম্ভব হয়েছিল। একবার যাত্রার সময়ে যদি এই সংখ্যায় কোনোরকম কম-বেশি হতো, তাহলে পরের বার সেই ঘাটতি পূরণ করা হতো। কিন্তু অসাম্য বৃদ্ধি পেতেই থাকে।[৩২] অনুসন্ধানের ফলে জানা গিয়েছিল যে, কাঙ্ক্ষিত সংখ্যায় নারী-শ্রমিক পাওয়া অসম্ভব। ইতিমধ্যেই দালালদের বিরুদ্ধে অপহরণের অভিযোগ গ্রামাঞ্চলে কর্তৃপক্ষের চিন্তার কারণ হয়ে ওঠে।[৩৩]

মেয়েদের নিয়োগ-সংক্রান্ত ব্যাপারে অনুসন্ধানের জন্য সরকারের তরফ থেকে মেজর পিচার এবং মি. গ্রিয়ারসনকে নিযুক্ত করা হয়। প্রচলিত ধারার প্রতিকূলে তাঁরা বলেছিলেন যে, পুলিশের মাধ্যমে অপহৃত আত্মীয়দের তদন্ত করানো বন্ধ করা উচিত। এই ব্যক্তির অপহরণকে তাঁরা খুব বড় সমস্যা বলে মনে করতেন না। মেয়েদের কাজে নিয়োগ করা হতো, তাদের নিজস্ব সমর্থনের বিরুদ্ধে নয়—সমস্যা ছিল, তাদের পরিবারের সমর্থনের অভাব। তাঁরা আরও বলেছিলেন যে, নারীদের অভিবাসন প্রক্রিয়া সহজ করার একমাত্র উপায় হল, নারীদের কাজের আরও স্বাধীনতা দেওয়া।[৩৪] তাঁরা এবং অভিবাসনের সঙ্গে যুক্ত সংস্থা-সমূহ নারীদের, তাদের শ্রম-বিক্রয়ের অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়ার এবং চুক্তিবদ্ধ অভিবাসনের অধিকারের জন্য ক্রমান্বয় আর্জি জানিয়ে যাচ্ছিল। অন্যদিকে, বেশিরভাগ স্থানীয় সরকারী আধিকারিকবর্গ পারিবারিক কর্তৃত্বের প্রতি এই চ্যালেঞ্জের জন্য যথেষ্ট শঙ্কিত ছিলেন। অভিবাসিত সংস্থাগুলির দ্বারা সৃষ্ট এই বিতর্ক ১৮৭০ সালে এক উত্তেজনাপূর্ণ স্তরে গিয়ে পৌঁছায়, যখন আসামে বিশাল সংখ্যায় মেয়েদের নিয়োগ করা শুরু হয়।[৩৫]

অপহরণ না পলায়ন? আসামের চা-বাগিচায় নারী-শ্রমিক নিয়োগ

১৮৭০-এর দশকের শেষদিক ছিল আসামের চা-চাষের উড়ান পর্ব। এলাকায় জনসংখ্যার ঘনত্ব কম থাকায় প্রথম থেকেই শ্রমিকের যোগান খুবই কম ছিল। বাগিচা-মালিকদের রপ্তানীকৃত শ্রমিকদের ওপর নির্ভর করতে হতো। এই নির্ভরশীলতা খুবই খরচ সাপেক্ষ হলেও দীর্ঘকালীন সাফল্য এক্ষেত্রে পাওয়া যেত। সরকারও চা-বাগিচা মালিকদের চাহিদা মেনে নেয়, যার ফল ছিল ১৮৫৯ সালে শ্রমিকদের চুক্তিভঙ্গ সংক্রান্ত আইন

বা ওয়ার্কমেন্স্ ব্রিচ অফ্ কনট্যাক্ট অ্যাক্ট-এর প্রবর্তন। এর দ্বারা শ্রমিকদের আইনসঙ্গত চুক্তি ও অতি-কঠোর শ্রমশাসন জমানার সূত্রপাত ঘটেছিল। এই শতাব্দীর শেষের দিকে আসামে ৯০০টি চা-বাগান ছিল ও তাতে শ্রমিকদের সংখ্যা ছিল প্রায় ৫০০,০০০।[৩৬]

শ্রমিক যোগানের খরচ কমাতে চা-বাগান মালিকেরা পরিবার সমেত শ্রমিকদের অভিবাসনে উৎসাহ দিত এবং সমাজের সেই স্তর থেকেই শ্রমিক নিয়োগ করত, যেখানে এই ধরণের অভিবাসন সহজসাধ্য ছিল। যেমন, দক্ষিণ বিহার, বাংলা, উড়িষ্যা এবং মধ্যপ্রদেশের আদিবাসীরা।[৩৭] এর পাশাপাশি পুরুষ ও নারীদের 'একক' অভিবাসনও বেশ ব্যাপক মাত্রায় ছিল। বংশবৃদ্ধিতে উৎসাহ প্রদানের জন্য, যেসব নারী এবং পুরুষরা এককভাবে অভিবাসিত হতো, তাদের কুখ্যাত 'ডিপো বিবাহ' করতে বাধ্য করা হতো। সন্তান জন্মানোয় উৎসাহ প্রদানের উদ্দেশ্যে বাগিচা-মালিকরা বেশ কিছু নীতি গ্রহণ করেছিল, যথা, মাতৃত্বজনিত সুবিধা প্রদান, জীবন্ত সন্তান প্রসবের জন্য বিশেষ পুরস্কার প্রদান ইত্যাদি। দীর্ঘদিন পরে হলেও বাগিচা-মালিকরা এর সুফল ভোগ করত। এই নারী ও শিশুরা চা-পাতা তোলার মতো কাজে অত্যন্ত কম টাকায় অংশগ্রহণ করত। এইভাবে সস্তায় শ্রমিকের ব্যবহার শিল্পক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল।

এরপর থেকেই আসামে চা-শিল্পে নারী-অভিবাসিতদের চাহিদা বাড়তে থাকে, যদিও এই চাহিদা পূরণ ততটা সহজ ছিল না। নারী নিয়োগের দায়িত্ব পেশাদার দালালদের উপর ন্যস্ত করা হয়েছিল। প্রতি শ্রমিকের যোগান পিছু এরা বড় বড় চা-বাগান মালিকদের কাছ থেকে ১২০ টাকা থেকে ১৫০ টাকা পর্যন্ত পেত, যা উনিশ শতকের শেষের দিকেও যথেষ্ট বেশি ছিল।[৩৮] উচ্চ লাভ ও সাফল্যের হারের অনিবার্য ফল ছিল প্রতারণা, চাতুরি এবং পরিশেষে অপরাধপ্রবণতা।

নারীদের নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রতারণা এবং বলপ্রয়োগ একমাত্র বিষয় ছিল না। আসামের চা-বাগানে যেহেতু দীর্ঘকালীন চুক্তিকেই উৎসাহ প্রদান করা হতো, সেহেতু এক্ষেত্রে শ্রমিকেরা হয় পরিবারগতভাবে অভিবাসিত হতো, না হয় বৈবাহিক সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হতো। যেসব মেয়েরা সেই সময় অভিবাসিত হতো তাদের বেশিরভাগই বিবাহিত ছিল। আর একজন বিবাহিত মেয়ের আসামের চা-বাগানে অভিবাসনকে, তাও আবার দীর্ঘদিনের জন্য,—পরিবার কোনোদিনই মেনে নিত না। যখন বিবাহিত মেয়েরা একা বা সন্তানসমেত আসামে যেত তখন অবশ্যই তারা তাদের পরিবারের কর্তৃত্বকে অগ্রাহ্য করেই যেত। কোনো কোনো সময় স্বামী ও শ্বশুরবাড়িকে না জানিয়ে, আবার কোনো কোনো সময় তাদের মতের বিরুদ্ধে গিয়েও তারা আসামে যেত। নিয়োগকারী সংস্থা বা দালালরা সাধারণত পরিবারের অসুখী মেয়েদের লক্ষ্যবস্তু

হিসাবে স্থির করত এবং তাদের এই শ্বাসরোধ করা অবস্থা থেকে মুক্তির আশ্বাস দিত। পরিবারের পুরুষরা এই ঘটনায় যথেষ্ট শঙ্কিত ছিল যে, মেয়েরা তাদের পরিবারের দাবিকে অগ্রাহ্য করে আসামের চা-বাগানগুলিতে 'অদৃশ্য' হয়ে যেতে পারে।

এই সময় নারীদের এই অভিবাসনের সুযোগকে সীমাবদ্ধ করে পারিবারিক অর্থনীতিকে বাঁচানোর চাহিদাকে স্থানীয় সরকার যথেষ্ট সহানুভূতির দৃষ্টিকোণ থেকে দেখত, বিশেষ করে ছোটনাগপুরে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, এই জেলা থেকে সবচেয়ে বেশি শ্রমিক বাইরে নিয়োগ করা হতো। শুধুমাত্র সরকারের নিজেদের কর-সংক্রান্ত বিষয় ছিল না, স্থানীয় সরকারের ওপর স্থানীয় জমিদারদের থেকেও যথেষ্ট চাপ ছিল। কারণ নিজের অঞ্চলের শ্রমিকের বাইরে চলে যাওয়ার অর্থ তাদের শ্রম সম্পত্তির লুণ্ঠন, যা স্থানীয় জমিদারশ্রেণী বন্ধ করতে চেয়েছিল। এর পাশাপাশি আসামের নিয়োগকারীরা উত্তরবঙ্গের চা-বাগান মালিক এবং কয়লাখনি শিল্পের থেকেও প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয়েছিল।

১৮৬০ এবং ১৮৭০-এর দশকের প্রথম দিকে আসামে যাওয়ার পথে শ্রমিকদের মৃত্যুর হার ছিল সবথেকে বেশি। এই ঘটনা বাংলা সরকারকে সমস্যার সম্মুখীন করেছিল। ফলশ্রুতি হিসাবে নিয়োগের সময় ও যাতায়াতের ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিদর্শন শুরু হয়। ১৮৬৩ সালে দেশীয় শ্রমিকদের যাতায়াত-সংক্রান্ত একটি আইন (ট্রান্সপোর্ট অফ্ নেটিভ লেবারারস্ অ্যাক্ট) পাশ হয়েছিল। পরবর্তী দশকে পর পর তিনটি, যথাক্রমে—১৮৬৮, ১৮৭০ এবং ১৮৭৩ সালে এই সংক্রান্ত আইন প্রবর্তিত হয়। কিন্তু, ১৮৭৪ সালে আসাম মুখ্য-কমিশনারের অধীনে চলে গেলে বাংলার সরকার এক্ষেত্রে তার বৈধ কর্তৃত্ব হারিয়েছিল। আসামের চা-বাগানেরা মালিকেরা তখন থেকে আরও বেশি করে সরকারের নীতি নির্ধারণকে প্রভাবিত করতে শুরু করেছিল। উনিশ শতকের শেষ দশক পর্যন্ত ভারত সরকার এক অদ্ভুত দো-টানায় পড়েছিল—একদিকে ছিল বাগিচা-মালিকেরা, যারা নিয়োগের ক্ষেত্রে সমস্তরকম বাধাকে দূর করতে চাইছিল, অন্যদিকে ছোটনাগপুর জেলা সরকার, যারা মেয়েদের নিয়োগকে আটকাতে চাইছিল। এমনকি, বাংলার আঞ্চলিক সরকারও ছোটনাগপুর সরকারকে মাঝে মাঝে সমর্থন করতে শুরু করেছিল। গ্রিয়ারসন ও পিচারের মতোই বাগিচা-মালিকদের সমর্থকরা বলতে থাকে যে, অভিবাসনের সিদ্ধান্তে মেয়েদের, এমনকি বিবাহিত মেয়েদের সর্বাধিক স্বাধীনতা থাকা দরকার। তারা আরও বলে যে, মেয়েরা নিজেরাই নিয়ন্ত্রণ-মূলক এই ধরণের পারিবারিক ও সামাজিক কাঠামোর বাইরে বেরোতে চায়, তাই তাদের অপহরণ করবার দরকার হয় না। কৃষিকাজ বা চা-বাগানের কাজ ছিল একধরণের স্বাধীন আয়ের অন্যতম পথ। বাংলার প্রাদেশিক সরকার এই মত গ্রহণযোগ্য মনে করেনি। এর বিরুদ্ধে দুটি যুক্তির অবতারণা করা হয়েছিল। প্রথমত, স্বাধীনতার

নামে মেয়েদের পরিবার থেকে এই ধরণের পলায়ন, তাদের গৃহ ও শিশুদের পরিত্যাগ করার সামাজিক ফলশ্রুতি অতি ভয়ানক রূপ নিতে পারে। দ্বিতীয়ত, যেসব মেয়েরা স্বামী বা অন্যান্য পুরুষ অভিভাবক ছাড়া অভিবাসিত হয়, তারা কখনোই সুরক্ষিত নয়, এবং বিবাহ বন্ধন অস্বীকার করতে দেওয়ার অর্থ একধরণের অরাজকতাকে প্রশ্রয় দেওয়া। এই বিতর্কে তৎকালীন ধারণা স্পষ্ট হয় : নারীর শ্রম এবং যৌনচেতনার ওপর পরিবারের দাবিই স্বীকার্য। ১৮৮০ থেকে ১৯০০-এর মধ্যে বাগিচা-মালিকদের পক্ষই জয়ী হয়, কিন্তু ১৯০১ সালে একটি নতুন আইন প্রবর্তনের মাধ্যমে নারীদের শ্রম-নিয়োগ আরও কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা শুরু হয়েছিল।

১৮৭০ সাল নাগাদ ছোটনাগপুরে অপহরণ একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অবৈধভাবে নাবালক-নাবালিকাদের নিয়োগের বিরুদ্ধে ১৮৭২ সালে ছোটনাগপুরের মানভূমে ৭টি মামলা দায়ের করা হয়েছিল। ১৮৭২ সালেব ১১ জুন, জুগ্ন মাহাতো নামে একজন কুলি-নিয়োগকারী, তার বিরুদ্ধে ৩টি মামলা দায়ের করা হয়। মাধব গৌরাই এই ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগে জানিয়েছিল যে, সে মাধবের ১২-১৩ বছরের ছেলেকে রঘুনাথপুর স্টেশন থেকে অপহরণ করেছিল কুলি হিসাবে বিক্রি করে দেবার জন্য। একই দিনে চুনী বাউরি ও সোরোদা মহাতিন এই জুগ্ন মাহাতোর বিরুদ্ধে তাদের ১৩ বছরের মেয়েকে অপহরণের অভিযোগ জানিয়েছিল। মিতুন নাপিতও তার ১১ বছরের ছেলেকে অপহরণের জন্য এই একই নিয়োগকারীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছিল। এই মামলাগুলির বিচারের ভার ছিল ক্যাপ্টেন গারবেট, অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনারের ওপর। তিনি তাঁর বিচারের রায়ে জানিয়েছিলেন যে, জুগ্ন মাহাতো এই ছেলে-মেয়েগুলিকে প্রতারণা করেছে, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু, তিনি মাহাতোর বিরুদ্ধে অপহরণের অভিযোগ খারিজ করে দেন, কারণ যাদের অপহরণ কবা হয়েছিল, তাদের বয়স ছিল, যথাক্রমে ১৮, ১৭ এবং ১৬। তদন্তের নথিতে এই ছেলে-মেয়েগুলির নাম জানা না গেলেও, জানা যায় যে, যারা অপহৃত হয়েছিল তাদের প্রত্যেকেই গারবেটের সামনে উপস্থিত হয়েছিল এবং তাদের পরীক্ষাও করা হয়েছিল। তাদের বয়সের হিসাবের মানদণ্ড হিসাবে সিপাহী বিদ্রোহকে ধরা হয়েছিল। মাধব গৌরাই বলেছিল যে, সিপাহী বিদ্রোহেব সময় তার ছেলের বয়স ছিল ২-৩ বছর। মিতুন নাপিত জানিয়েছিল যে, তার ছেলে তখনও মাতৃদুগ্ধ পান করত এবং চুনী বাউরির মত অনুযায়ী তার মেয়ে মিতুন নাপিতের ছেলের থেকে ১ বছরের বড় ছিল। এইসব তথ্যের উপর নির্ভর করে গারবেট এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, অপহৃতরা প্রত্যেকেই ১৬ বছরের বেশি বয়স্ক। ছোটনাগপুরে জুডিশিয়াল কমিশনার কর্ণেল জে. এস. ডেভিস সবগুলো ক্ষেত্রেই অপহরণের অভিযোগকে 'সুস্পষ্টভাবে অননুমোদনযোগ্য' বলে বর্ণনা করেছিলেন।[৩৯]

আরও একটি মামলায় অভিযুক্তকে কখনোই বিচারের জন্য সর্বসমক্ষে নিয়ে আসা হয়নি। ঐ বছরের ২০ অক্টোবর চিরকুন্ডাতে কোমল মুচী, গোরা মুচীর বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়েছিল যে, গোরা তার ১২ বছরের ছেলেকে কুলি হিসাবে আসামে বিক্রি করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে অপহরণ করেছে। এই মামলাটিও খারিজ হয়ে যায়, কারণ ছেলেটি তার বর্ণিত বয়সের থেকে বড় ছিল। পুলিশের রিপোর্ট অনুযায়ী এই মামলাটি সম্পূর্ণ মিথ্যা ছিল এবং ছেলেটির বয়স কখনোই ১৭-১৮ বছরের নীচে ছিল না।[৪০]

২৩ মার্চ প্রসাদ ভকত গিরিধারী ভুঁইএগার বিরুদ্ধে তার দত্তক কন্যাকে অপহরণ করার অভিযোগ দায়ের করেছিল। মেয়েটির বয়স ছিল ১১ অথবা ১২, এবং তাকে গণিকালয়ে বিক্রি করে দেবার উদ্দেশ্য ছিল বলেই অভিযোগকারী মনে করেছিল। গোবিন্দপুরের সাব-ইন্সপেক্টর অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছিলেন, কিন্তু পরে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল, কারণ এটা প্রমাণ হয়ে গিয়েছিল যে, মেয়েটি তার পালক-পিতার অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে নিজের সম্মতিক্রমে পালিয়ে গিয়েছিল। প্রায় প্রত্যেক উচ্চপদস্থ আধিকারিকই এই ঘটনার বিরোধিতা করেছিলেন। তৎকালীন পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেল এই সিদ্ধান্তকে আইন ও নৈতিকতার বিরুদ্ধাচরণ বলে অভিহিত করেছিলেন।[৪১] জুডিশিয়াল কমিশনার মামলাটিকে পুনরায় উত্থাপিত করার কথা বলেছিলেন। কারণ তাঁর মনে হয়েছিল এখানে আইনের ব্যর্থতা স্পষ্টতই প্রতীয়মান। মামলাটির বিষয় এরকম ছিল যে, মেয়েটির বয়স ১১-১২-এর মধ্যে। সে অনাথ ছিল। মেয়েটিকে দত্তক নেওয়া হয়েছিল, যা মেয়েটির এক কাকার বক্তব্যে প্রমাণিত। এরপর তাকে অভিযুক্ত প্রলুব্ধ করেছিল। মেয়েটি এই কারণেই নিজের সম্মতিক্রমে বাড়ি ছেড়েছিল, কারণ তার পালক-পিতা তাকে মারধোর করত। এই একই কারণে গোবিন্দপুরের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার অভিযুক্তকে ছেড়ে দিয়েছিলেন এবং মামলাটিকে কোনোরকম ফৌজদারী আইনের ধারার অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।[৪২]

১৮৭২ সালের ২০ আগস্ট শেখ পঞ্চু নবীন মুচীকে তার স্ত্রীকে মালদা স্টেশন থেকে অপহরণের অভিযোগে অভিযুক্ত করে। পুলিশ নবীনকে গ্রেপ্তার করলেও বিচারক তার কোনোরকম বিচার না করেই তাকে ছেড়ে দিয়েছিলেন। এমনকি, এই মামলা-সম্পর্কিত রায় ইংরাজীতে দেওয়া হয়নি। স্থানীয় ভাষায় বলা হয়েছিল যে, এটি কোনো মামলাই নয়। বিচারকের মতে, মেয়েটির প্রথমত, ২০-২২ বছরের মধ্যে বয়স ছিল, এবং দ্বিতীয়ত, অভিযোগকারী এই মেয়েটিকে প্রকৃত নিয়ম মেনে বিবাহ বা 'নিকাহ' করেনি।[৪৩]

একমাত্র একটি ক্ষেত্রেই অপরাধী শাস্তিলাভ করেছিল। একজন নিয়োগকারী এক ধোপার ভাইপোকে কাছাড়ে কুলি হিসাবে পাঠানোর উদ্দেশ্য নিয়ে প্রলোভিত করে অপহরণ করতে চেয়েছিল। কিন্তু, এক্ষেত্রে ছেলেটির কাকা ঐ লোকটির পিছু ধাওয়া করেছিল এবং ছেলেটিকে উদ্ধার করা হয়েছিল। সেই নিয়োগকারীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছিল এবং ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট তাকে চার বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছিলেন।[৪৪]

উপরে উল্লিখিত প্রতিটি ঘটনার ক্ষেত্রেই আমরা দেখতে পাই যে, যাদের নিয়োগ করা হতো, তাদের বয়স কত, সেটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং তা সঠিকভাবে নির্ধারণ করাটাও একটি বড় সমস্যা ছিল। এই সমস্ত মামলার রায় তৎকালীন পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেল কর্ণেল পুঘের পছন্দসই ছিল না, তা তিনি জানিয়েছিলেন। তিনি প্রশ্ন তুলেছিলেন যে, যেখানে ছেলে-মেয়ের বাবা-মা জানাচ্ছে তাদের সন্তানদের বয়স ১২ থেকে ১৩-এর বেশি নয়, সেখানে তাদের ১৬ বছরের উর্ধ্বে ধরে নিয়ে বিচারের অর্থ কি? এমনকি তিনি বয়স নির্ধারণের পদ্ধতি নিয়েও নিজের অপছন্দের কথা জানিয়েছিলেন। তিনি আরো বলেছিলেন যে, ১৪-১৫ বছরের মধ্যে দেশীয় মেয়েদের শরীর সম্পূর্ণরূপে গঠিত হয়ে যায়, তাই অনায়াসেই তাদের ১৪-১৮ বছরের মধ্যে বয়স বলে চালানো যায়, আসলে যেসব মামলায় অপহৃতদের বয়স স্পষ্টভাবে বিচারকের সামনে প্রমাণ করা যায়নি, সেইসব ক্ষেত্রেই বিচারক অভিযুক্তদের অপহরণকারী হিসাবে মেনে নেননি। কিন্তু, পুঘের মতে, বিচারকদের এইসব নথিকরণ বাতিল করে দেওয়া উচিত ছিল।[৪৫]

'অপহরণ'-এর সংজ্ঞা কি — এটা ছিল আলোচনার আর একটি বিষয়। এখানে এসে আলোচনা বাস্তবতার সীমা ছাড়িয়ে যায়। অল্পবয়স্ক মেয়েদের ক্ষেত্রে তাদের বয়সই কি বিচারের একমাত্র মানদণ্ড হিসাবে বিবেচিত? সরকারী আধিকারিকবর্গ প্রায় প্রত্যেকেই এই বিষয়ে একমত ছিলেন যে, প্রাপ্তবয়স্ক বা নাবালিকা—সবক্ষেত্রেই মেয়েদের তাদের স্বামীর মতামত ছাড়া অভিবাসিত হওয়া কখনোই মেনে নেওয়া যায় না, এবং এই ধরণের অভিবাসনকে অবৈধ বলে ঘোষণা করা উচিত। ইন্সপেক্টর জেনারেল পুঘের মতে, স্বামীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো স্ত্রীর অভিবাসন সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা উচিত। কিন্তু এর ভিত্তি কি? বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অপহরণ প্রমাণ করা যেত না। তবে ম্যাজিস্ট্রেট যদি সন্তুষ্ট না হতেন তাহলে কোনো নারীর অভিবাসন-সংক্রান্ত নথিভুক্তিকরণে বাধা দিতে পারতেন। ডেপুটি কমিশনার, যিনি এই মামলাগুলির পুনরায় তদন্তের ভার পেয়েছিলেন, তিনি পুঘের সঙ্গে একমত ছিলেন। বেশিরভাগ মামলাই আইনের চোখে অপহরণের মামলা ছিল না, কিন্তু এতটাই কাছাকাছি ছিল যে, অনেক পরিবারের কাছেই তা অত্যন্ত কষ্টদায়ক ও অসহনীয় ছিল।

বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বিবাহিত মেয়েরা নিয়োগকারীদের প্রলোভনের শিকার হয়ে স্বামী, সন্তান ছেড়ে চলে যেত, কোনো কোনো ক্ষেত্রে সন্তানরা এতটাই ছোট ছিল যে, মাতৃস্তন্য ও মায়ের যত্ন না পেয়ে তাদের মৃত্যু পর্যন্ত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল।[৪৬] নিয়োগকারীরা গয়না, জামাকাপড় ও বিলাসবহুল জীবনের চিত্র মেয়েদের সামনে তুলে ধরে তাদের প্ররোচিত করত। চা-বাগানের কাজে গেলে তারা এই বিলাসবহুল জীবন-যাপন করতে পারবে, যা কখনোই বাড়ির কাজ ও কষ্টের মধ্যে পাওয়া সম্ভব নয়—এই মর্মে তাদের প্রলোভিত করা হতো। এইভাবে বেশিরভাগ সময়েই প্ররোচনার মাধ্যমে নিয়োগকারীরা সফলভাবে মেয়েদের তাদের পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারত।

জুডিশিয়াল কমিশনার ডেভিস এ-কথা স্বীকার করে নিয়েছিলেন যে, অপহরণের সংজ্ঞা যথেষ্ট সীমাবদ্ধ। তিনি মনে করতেন যে, কোনো মেয়েকে কুলি হিসাবে নথিভুক্ত করার সময় তার স্বামীর সম্মতি না থাকলে ম্যাজিস্ট্রেটের উচিত সেই মেয়ের নাম নথিভুক্ত না করা। কিন্তু, একজন প্রাপ্তবয়স্ক নারীকে কিসের ভিত্তিতে আটকানো যাবে? যে আধিকারিক নাম নথিভুক্তিকরণের দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন, তাঁর নিজস্ব কিছু ক্ষমতা থাকলেও প্রচলিত ব্যবস্থায় যথেষ্ট উপায় ছিল না—এ-কথা একজন আধিকারিক স্বীকার করেই নিয়েছিলেন। ন্যূনতম বাধার সামনেই বেশিরভাগ ম্যাজিস্ট্রেট নতি স্বীকার করে নিতেন। ডেভিসের মতে, তৎকালীন আইন এমনই ছিল যে, ১৬ বছরের উর্দ্ধে কোনো বিবাহিত নারীকে চা-বাগান অঞ্চলে কুলি হিসাবে যদি কোনো নিয়োগকারী পাঠাত তাহলে সেটা কোনোরকমভাবেই অন্যায়ের পর্যায়ভুক্ত হতো না, এমনকি প্রাপ্তবয়স্ক বিবাহিত মেয়েদের প্রলোভনের দ্বারা পাঠালেও তা অন্যায় হতো না। ডেপুটি কমিশনার লক্ষ্য করেছিলেন যে, অল্পবয়স্ক পুরুষ ও নারীদের মধ্যে নিয়োগকারীদের সঙ্গে স্বেচ্ছায় যাওয়ার একটা প্রবণতা ছিল। ফলত, তাদের বিরুদ্ধে অপহরণের অভিযোগও আনা যেত না।[৪৭]

দেহব্যবসার মতো অনৈতিক কাজে বিবাহিত মেয়েদের প্রলোভিত করার মতো ঘটনাকে অপরাধ হিসাবে ভারতীয় ফৌজদারী দণ্ডবিধির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। কোনো কোনো অফিসার মনে করতেন যে, বিবাহিত মেয়েদের প্রলোভিত করাই এ-ধরণের অপরাধ বলে গণ্য হতে পারে। ডেপুটি কমিশনারের মতে, বিবাহিত নারীদের অন্য পুরুষের সঙ্গে স্বামীকে ছেড়ে চলে যাওয়া আপাতভাবে অবৈধ না হলেও বিবাহিত নারীদের অনৈতিক কারণে প্ররোচিত করে তাদের স্বামীদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া অবশ্যই অপরাধ ছিল। কারণ নিয়োগকারীরা জানত যে এর ফলাফল কি হতে পারে।[৪৮]

জুডিশিয়াল কমিশনার ডেভিস এই মত মেনে নিতে রাজি ছিলেন না। তাঁর মতে, ভারতীয় ফৌজদারী দণ্ডবিধির ৩৬৬ ধারা অনুযায়ী এইসব নিয়োগকারীদের দোষী সাব্যস্ত করতে গেলে আইনের সম্প্রসারণ প্রয়োজন। এইসব বিবাহিত মেয়েরা কোনোভাবে অবৈধ যৌনাচারের মাধ্যমে তাদের নারীত্ব বিসর্জন দিতে পারে, তার ভিত্তিতে নিয়োগকারীদের দোষী সাব্যস্ত করা সম্ভবপর ছিল না। কিন্তু আবার স্বামীকে ছাড়া যেসব মেয়েরা একা অভিবাসিত হচ্ছে তাদের ক্ষেত্রে এই সম্ভাবনা থাকাটাই স্বাভাবিক ছিল। ফৌজদারী আইনের টীকাকারদের মতে, বিপথে নিয়ে যাবার জন্য প্রলোভিত করা এবং উত্ত্যক্ত করার মাধ্যমে কারুকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া অবশ্যই অপরাধ, কিন্তু তা কখনোই ফৌজদারী দণ্ডবিধির অন্তর্ভুক্ত নয়।[৪৯]

ছোটনাগপুরে কর ও আইন বিভাগের আধিকারিকরা বিবাহিত নারীদের চুক্তির মাধ্যম আসামে অভিবাসনের বিরুদ্ধে এক নতুন আইন প্রণয়ন করার প্রয়োজনীয়তা আছে বলে মনে করতেন। নিয়োগকারীদের ছল বা কৌশলের হাত থেকে স্বামীদের বাঁচানোর জন্যই এই ধরণের আইনের প্রয়োজন বলে জুডিশিয়াল কমিশনার মনে করতেন। ১৮৭৩ সালের আইন ছিল এর সবথেকে সহজ সমাধান। এখানে বলা হয়েছিল নিয়োগকারীদের বৈধ ছাড়পত্র বা লাইসেন্সে একথা উল্লেখ করতে হবে যে, বিবাহিত মেয়েদের তাদের স্বামীর অনুমতি ছাড়া বাইরে পাঠানো নিষিদ্ধ।[৫০]

ছোটনাগপুরের ঘটনাক্রম একমাত্র বা প্রথম ঘটনা ছিল না। ১৮৭১ সালে মেদিনীপুরে ঘটে যাওয়া কিছু ঘটনা বাংলা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। ১৮৭১ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারী, মধু খেরয়া এবং আরও তিনজন পুলিশের অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারিন্টেনডেন্টের কাছে অভিযোগ জানিয়েছিল যে, তাদের ছেলে এবং মেয়েদের প্রলোভিত করে নিয়োগকারীরা নিয়ে যাচ্ছে এবং গুদামে আটকে রাখছে। এই অভিযোগের ভিত্তিতে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশ তদন্ত শুরু করেছিল। পরের দিনই দুজন নিয়োগকারীকে গ্রেপ্তার করে বিচারের জন্য পাঠানো হয়েছিল। এরা উজ্জ্বল এবং অহল্যা নামে দুটি মেয়েকে অপহরণ করেছিল। মেদিনীপুরের তৎকালীন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট যদুনাথ বসু; ডঃ ম্যাথিউ, সিভিল সার্জন এবং তদন্তের ভারপ্রাপ্ত সাব-ইসপেক্টর সমেত ৯ জন সাক্ষীকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন। সিভিল সার্জনের বক্তব্য ছিল যে, এই মেয়েদের মধ্যে একজনের বয়স ১৬-১৭ বছরের মধ্যে, আর একজনের ১৫ কি ১৬ বছর। কিন্তু, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সমস্ত প্রমাণাদি বিচারের দ্বারা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে, এই দুটি মেয়েকেই তাদের স্বামী ও গৃহ ছাড়বার জন্য সুখকর জীবনযাপনের স্বপ্ন দেখানো হয়েছিল, এবং প্রবঞ্চনার কারণেই এই ধরণের প্রলোভন দেখানো হয়েছিল। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট আরও বলেছিলেন যে, কুলি-নিয়োগকারীদের সবসময়ই উদ্দেশ্য থাকত

অসৎ কাজে নিয়োগের জন্য এইসব মেয়েদের নিয়ে যাওয়া। নবীন সিং নামে এরকম একজন নিয়োগকারীর কথা জানা গেছে। সে বিবাহিত মেয়েদের তাদের স্বামীর অনুমতি ছাড়াই দীর্ঘ দূরত্বের কোনো জায়গায় পাঠিয়ে দিত এবং এইসব মেয়েদের অবৈধ যৌনাচারে লিপ্ত হতে বাধ্য করা হতো। নবীন এসব কথা স্বীকার করে নিলেও, অভিবাসিত মেয়েদের যেহেতু তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে পাঠানো হতো না, তাই নবীনকেও অপহরণের অভিযোগে অভিযুক্ত করা যায়নি। এই ঘটনাটিকে ৩৬২নং ধারার অন্তর্ভুক্ত করে অপহরণের অভিযোগে নবীনকে অভিযুক্ত করা যাবে কি না এ বিষয়ে বিচারক নিজেই নিশ্চিত ছিলেন না। অভিবাসিত মেয়েদের বয়স নিয়ে সংশয় থাকায় অবশেষে অপহরণের বিষয়টিকে খারিজ করে দেওয়া হয়েছিল।[৫১]

১৮৭১ সালে বর্ধমান বিভাগে এরকম ১০টি ঘটনা ঘটেছিল, যেখানে মেয়েদের কুলি হিসাবে আসাম ও কাছাড় অঞ্চলে নিয়োগকারীরা পাঠাচ্ছিল,—যেখানে অবশ্যই প্রলোভন কাজ করেছিল। এর মধ্যে ৭টি ঘটনায় অপহৃত মেয়েদের বয়স ১৬ বছরের নীচে ছিল। ৩টি ঘটনায় প্রমাণের অভাবে মামলা খারিজ হয়ে গিয়েছিল, আর বাকিগুলো কোর্টের বাইরে মিটিয়ে নেওয়া হয়েছিল। একটিমাত্র ক্ষেত্রেই অভিযুক্তকে বিচারকের সামনে আনা হয়েছিল, কিন্তু সে সমস্ত দোষ থেকে মুক্তি পেয়েছিল। আরও ৩টি ঘটনার কথা জানা যায় যেখানে পুরুষদের অপহরণ করা হয়েছিল। কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রমাণের অভাব ছিল। বর্ধমানের তৎকালীন কমিশনার এ বিষয়ে মন্তব্য করেছিলেন যে, এই জেলায় কুলি-নিয়োগের ঘটনাগুলি ছাড়া অপহরণের আর কোনো ঘটনা ঘটেনি।[৫২]

ক্রমান্বয়ে এই ধরণের অপহরণের ঘটনা ঘটে যাওয়ায় বাংলা সরকার ছোটনাগপুরের কমিশনারের সঙ্গে একমত হতে বাধ্য হয়েছিল। লেফটেন্যান্ট গভর্ণর বলেছিলেন যে, যেসব ক্ষেত্রে গৃহে স্বামী বা পিতা জীবিত আছে, সেসব ক্ষেত্রে বিবাহিত নারীদের তাদের স্বামীর এবং শিশুদের তাদের পিতার সম্মতি ছাড়া কোনোভাবেই কোথাও নিয়োগ করা যাবে না—এই মর্মে অবশ্যই একটি আইন প্রণয়ন করা উচিত।[৫৩]

১৮৮২ সালে যখন অবশেষে নতুন আইন প্রবর্তিত হয়েছিল তখনও কিন্তু চা-বাগানের মালিকদের বিরুদ্ধাচরণের জন্য এই দিকগুলো তাতে রাখা হয়নি। বরং এই আইনের মাধ্যমে স্বাধীনভাবে অভিবাসনকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। এখানে অভিবাসনের সময় আর নাম নথিভুক্ত করারও প্রয়োজন পড়ত না। স্যার জন এডগার এই স্বাধীন অভিবাসন প্রক্রিয়ার সমস্যাগুলিকে তুলে ধরেন।[৫৪] তিনি বলেন যে, এই আইনের দ্বারা বিবাহিত মেয়েরা তাদের স্বামীদের ছেড়ে পালিয়ে যেতে পারত এবং স্বামীরা আর কোনোভাবেই তাদের স্ত্রীদের খুঁজে পেত না। ছোটনাগপুরের কমিশনার সি. সি.

স্টিভেন্স এ বিষয়ে একমত ছিলেন যে, পরীক্ষার মাধ্যমে অভিবাসন প্রক্রিয়াতেই অন্যায় ও অপরাধ যেখানে আটকানো যায়নি, সেখানে নিয়ন্ত্রণহীন এই অভিবাসন প্রক্রিয়ায় এ-ধরণের অপরাধমূলক ঘটনা যে আরও ঘটবে তা বলাই বাহুল্য। নিয়োগকারীরা লাভের জন্য কাজ করত এবং অসহায় বা অজ্ঞ নারী ও শিশুদের বাইরে পাঠাতে তাদের কোনো দ্বিধা ছিল না।[৫৫]

স্থানীয় আধিকারিকরা এ বিষয়ে একমত ছিলেন যে, পেশাদার নিয়োগকারীদের দ্বারা তোষামোদ, প্রলোভন বা অপহরণ থেকে নিয়োগপ্রথাকে নিরাপদ করা নয়, সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ছিল এই ধরণের নিয়োগের ক্ষেত্রে পরিবারের আপত্তিকে তুলে ধরা। পেশাদার নিয়োগকারীরা শুধু অভিবাসিত নারী ও শিশুদের কাছেই অপরাধী ছিল না, তারা অপরাধী ছিল সেইসব অভিবাসিতদের পরিবারের কাছেও। ১৮৮৪ সালে অ্যাসিস্ট্যান্ট পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট কায়ে এই বিষয়ে সাবধান করে বলেছিলেন যে, অল্পবয়সীদের তাদের পিতা বা স্বামীর অনুমতি ছাড়া, তাদের ছেড়ে চলে যাবার ইচ্ছা হলেই তারা তা করতে পারবে। তিনি আরও বলেছিলেন যে, যেসব নাবী ও শিশুরা সবকিছু ত্যাগ করে যেতে চাইবে, এই ধরণের স্বাধীন অভিবাসন-প্রক্রিয়া তাদের কাজকে আরও সহজ করে দিয়েছে। স্যার এডগার প্রথম থেকেই এই বক্তব্য পেশ করে এসেছিলেন যে, নথিভুক্তিকরণের ছাড় বিবাহিত মেয়েদের তাদের স্বামীকে ছেড়ে পালিয়ে যেতে আরও সাহায্য করেছিল।[৫৬]

এইভাবে আসামের চা-বাগানগুলিতে নারী, আর কিছু কিছু ক্ষেত্রে পুরুষদের প্রায় 'অদৃশ্য' হয়ে যাওয়াকে তৎকালীন কমিশনার কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলেন না। কিন্তু, অল্পবয়সী মেয়েদের ক্ষেত্রে এর ফলাফল বেশিরভাগ সময়েই অত্যন্ত কঠোর হতো। ঝালদা অঞ্চলের বিমলা কাঁদুনি, ১১ বছর বয়স্ক একটি বিবাহিত মেয়ে, একজন নারী-নিয়োগকারীর প্ররোচনায় নিজের বাড়ি ছেড়েছিল। মেয়েটির ওপর কোনো ঘুমপাড়ানি ওষুধ প্রয়োগ করা হয়েছিল এবং তাকে রাণীগঞ্জ অঞ্চলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কিছুদিন বাদে মেয়েটির পরিবারের লোকজন তাকে উদ্ধার করে। অবশ্যই এর পরিণাম ছিল অত্যন্ত দুঃখজনক। সেই নিয়োগকারিণী ছিল একজন গণিকা। যেহেতু মেয়েটি এক রাত ও এক দিন ঐ নিয়োগকারিণীর বাড়িতে একসঙ্গে কাটিয়েছিল, সেহেতু মেয়েটির পরিবারের লোকেরা তাকে ত্যাগ করে। এই মেয়েদের অনেক সময়ে গণিকাবৃত্তি ছাড়া জীবনধারণের অন্য কোনো উপায় থাকত না।[৫৭]

বাংলা সরকারের মুখ্য সহায়ক (সেক্রেটারি) স্যার জন এডগার অভিবাসনের সঙ্গে যেসব জায়গায় অপরাধ জড়িত ছিল, সেইসব ক্ষেত্রগুলিতে তদন্তের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন।[৫৮] বিশেষত নারী এবং নাবালক-নাবালিকাদের অভিবাসনের ক্ষেত্রে এই

তদন্ত করা হয়েছিল। এরপর ভারত সরকার নাবালক-নাবালিকা এবং নারীদের স্বাধীনভাবে অভিবাসনের বিরোধিতা করে এবং পরিশেষে বাধ্য করে অন্যান্যদের তা মেনে নিতে। নারীদের ওপর পারিবারিক কর্তৃত্ব কায়েম করা এবং তাদের শ্রম পুনরায় পরিবারের ইচ্ছার অধীন করা ছিল সরকারের মুখ্য উদ্দেশ্য। কুলি-নিয়োগকারীদের কু-নজর থেকে পরিবারতন্ত্রকে রক্ষা করাই মূলত ব্রিটিশরাজের উদ্দেশ্য ছিল।

১৯০১ সালের আসাম শ্রমিক এবং অভিবাসন আইন (আসাম লেবার অ্যান্ড এমিগ্রেশন অ্যাক্ট)-এর মাধ্যমে স্বাধীন অভিবাসন প্রক্রিয়ার অধিকারকে বেশ খানিকটা খর্ব করা হয়। এই আইনে নারীদের অভিবাসন নিয়ে একটি আলাদা অধ্যায় ছিল। ১৮৭৩ সালেই ইন্সপেক্টর জেনারেল কর্ণেল পুঘে বলেছিলেন যে, একজন বিবাহিত নারী মূলত বিবাহের মাধ্যমে তার স্বামীর সঙ্গে একধরণের চুক্তি করে, আর তাই তার স্বামীর অনুমতি ছাড়া ঐ সময়ের মধ্যে সে আর অন্য কারোর সঙ্গে কোনোরকম কাজে যুক্ত হতে পারে না। মূলত নারীদের অভিবাসন আটকাতেই পুঘে এই ধরণের মতামত ব্যক্ত করেছিলেন। ভারত সরকারের এই মতামত মেনে নিয়ে আইন প্রবর্তন করতে প্রায় তিন দশক সময় লেগে গিয়েছিল। আর পুঘের এই বক্তব্য সংশ্লিষ্ট আইনের প্রস্তাবনায় শেষ পর্যন্ত স্থান পেয়েছিল। বিবাহিত নারীদের তাদের স্বামীর বা অন্যান্য অভিভাবকের সম্মতি ছাড়া অভিবাসন আটকাতে এই আইনে অনেক ধারা-উপধারার সংযোজন ঘটানো হয়েছিল। একজন বিবাহিত নারীর স্বতঃপ্রবৃত্ত অভিবাসন নিষিদ্ধ হয় এই আইনের মাধ্যমে।

পরিশেষ

নারীদের শ্রমের ওপর পারিবারিক দাবি ও কর্তৃত্ব থাকলেও স্বামী বা পিতা অনেক সময়েই নারীদের অভিবাসনকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারত না। একা, বিবাহিত বা বিধবা যেসব মেয়েরা খনি বা কৃষিতে কাজের জন্য বিদেশে বা দেশের অভ্যন্তরেই যাত্রা করত, তারা অনেক সময়ই তাদের পারিবারিক নিয়ন্তা বা নিয়ন্ত্রকদের সম্মতির প্রযোজনবোধ করত না। আনুমানিক ১৮৬০ সালে, নারী-শ্রমিকের উৎপাদন ও পুনরুৎপাদনশীল ব্যবহার এবং সরকারী নীতির দ্বারা চালিত হয়ে যখন বিদেশে এবং দেশে চা-বাগানগুলির মালিকেরা তাদের ব্যাপক ও খরচসাপেক্ষ নিয়োগপ্রথা অর্থাৎ নারীদের নাম নথিভুক্তিকরণ চালু করে, তখন দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয়। সমাজের বিভিন্ন প্রান্ত থেকেই আপত্তি উঠতে থাকে। স্থানীয় অভিজাতরা নারীদের ওপর পরিবারের দাবিকে সমর্থন জানায়। আর একদিকে দুটি অত্যন্ত ক্ষমতাশালী স্বার্থগোষ্ঠী ছিল, যথা, বিদেশে প্ল্যানটেশনের কাজে নিযুক্ত করার সংস্থা ও তার দালালরা এবং আসামের চা-বাগিচা মালিকরা। আবার নারীদের ক্ষেত্রে একদিকে ছিল নিজেদের শ্রমের এবং শ্রমিক

হিসাবে চুক্তির ওপর নিজস্ব অধিকার, অন্যদিকে ছিল পারিবারিক কর্তৃত্ব ও বিবাহের পবিত্র বন্ধন। অভিবাসনের সময়কার অনিশ্চিত ও বিপদসংকুল যাত্রাপথ এবং কর্মক্ষেত্রের হাড়ভাঙা খাটুনি—এইসব সত্ত্বেও মেয়েরা নিজেদের ইচ্ছায় অভিবাসিত হতো কি না, তা নিয়ে অবশ্যই নানান ব্যাখ্যা রয়েছে। কিন্তু এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ ছিল না যে, গ্রামাঞ্চলে ক্রমশ কমে আসা আয়ের উৎস এবং কষ্টদায়ক বৈবাহিক জীবন—এই উভয়ই মেয়েদের এই পথে ঠেলে দিয়েছিল। চা-বাগান বা অন্যান্য কৃষিক্ষেত্রে কাজ গ্রহণ করা তখন অন্যতম নতুন আয়ের উৎস ছিল এবং তার সঙ্গে ছিল কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত অত্যাচারী পারিবারিক কাঠামোর বাইরে যাবার তাগিদ, সম্ভবত অন্যভাবে নিজেদের যৌনকাঙ্ক্ষা পূরণের উপায়ও।

১৮৮০ এবং ১৮৯০-এর দশকে ভারত সরকার স্বাধীনভাবে অভিবাসনের সুযোগ দিয়ে চা-বাগিচা মালিকদের সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করে। কিন্তু, শেষপর্যন্ত নারীদের অভিবাসনের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা দাবিকেও সরকার অগ্রাহ্য করতে পারেনি। এর অনিবার্য ফল ছিল ১৯০১ সালের আইন, যেখানে চা-বাগানে নিয়োগ-সংক্রান্ত আইনকে পুনর্বিবেচনা করা হয়েছিল, বিশেষত নারীদের নিয়োগপ্রথাকে। এখন থেকে আইন করে মেয়েদের সিদ্ধান্ত পরিবারের ওপর ছেড়ে দেওয়া হল।

নির্দেশিকা

1. Ranajit Dasgupta, "Migrant Workers, Rural Connections and Capitalism : The Calcutta Jute Industrial Labour, 1890s to 1940s", Indian Institute of Management, Calcutta, Working Paper Series, April 1987, Mimeograph; and also Samita Sen, *Women and Labour in Late Colonial India. The Bengal Jute Industry, 1890-1940* (Cambridge : Cambridge University Press, 1999), Chapter 2.
2. *Recasting Women. Essays in Colonial History,* Kumkum Sangari and Sudesh Vaid, eds. (New Delhi : Kali for Women, 1989). Michael Anderson, "Work Construed : Ideological Origins of Labour Law in British India to 1918" in *Dalit Movements and the Meaning of Labour in India,* Peter Robb, ed. (Oxford and New Delhi : Oxford University Press, 1993), 87-120.
3. Suagata Bose, *Peasant Labour and Colonial Capital. Rural Bengal Since 1770,* New Cambridge History of India, III-2 (Cambridge : Cambridge University Press, 1993), 66-111.

4. *Census of India*, 1911, Bengal, 342.

5. *Social and Economic Status of Women Workers in India*, Labour Bureau, Ministry of Labour, Government of India, 1953.

6. *Ibid.*, 94

7. Rosalind O'Hanlon, *For the Honour of My Sister Countrywomen : Tarabai Shinde and the Critique of Gender Relations in Colonial India* (Oxford: Oxford University Press, 1994), Introduction.

8. A. Menefee Singh, "Rural-to-Urban Migration of Women in India : Patterns and Implications" in *Women in the Cities of Asia : Migration and Urban Adaptation*, J.T. Fawcett et al., eds. (Boulder, Colorado : Westview, 1984).

9. A. P. Middleton, *Bihar and Orissa District Gazetteer*, Saran (Patna, 1930), 32

10. *Census of India*, 1921, 5, 2.

11. Nirmala Banerjee, "Working Women in Colonial Bengal : Modernization and Marginalization" in *Recasting Women*, Kumkum Sangari and Sudesh Vaid, eds. (New Delhi : Kali for Women, 1989), 269-301.

12. Dasgupta, 'Migrant Workers'.

13. D.A.E. Engels, *Beyond Purdah? Women in Bengal, 1890-1939*, (New Delhi: Oxford University Press, 1996), 209.

14. Banerjee, "Working Women in Colonial Bengal".

15. Indian Factory Commission, Government of India, Calcutta, 1891.

16. Report of the Royal Commission of Labour in India, Government of India, (London, 1931), 5, 2.

17. Curjel Report, Main Report, 1-2.

18. Radhakamal Mukherjee, *Indian Working Class* (Bombay Hind Kitab, 1945), 261-262.

19. Curjel Report, Main Report.

20. *Ibid.* See also Banerjee, "Working Women in Colonial Bengal," 275.
21. Engels, *Beyond Purdah?* 209.
22. *Census of India,* 1921, 7, 1, 12.
23. Engels, *Beyond Purdah?* 211.
24. Dilip Simeon, *The Politics of Labour Under Late Colonialism. Workers, Unions and the State in Chota Nagpur, 1928-1939* (New Delhi : Manohar, 1995), 24.
25. Hugh Tinker, *A New System of Slavery : The Export of Indian Labour Overseas, 1830-1920,* (Oxford : Oxford University Press, 1974). Rhoda Reddock, "Freedom Denied : Indian Women and Indentureship in Trinidad and Tobago, 1845-1917", *Economic and Political Weekly,* 20:43 (1985).
26. D. McFarlen, *Memoranda of 48 Examinations of Mauritius Laboures Returned to Bengal in the "Graham,"* Government of India (Calcutta, 1841).
27. WBSA General, Emigration, April 1872, A 118.
28. Tinker, *A New System of Slavery,* 100; for additional detail on trends see 273.
29. *Ibid,* 90.
30. Lord Salisbury to Governor-General of India in Council, 24 March 1875; *Report of the Indian Jute Manufacturers Association,* (Calcutta, 1899).
31. Reddock, "Freedom Denied". Also see Madhavi Kale, "'Capital Spectacles in British Frames" : Capital, Empire and Indian Indentured Migration to the British Caribbean,' *International Review of Social History* 41 (1996) [special supplement, "Peripheral" Labour ? Studies in the History of Partial Proletarianisation'].
32. Report on the Emigration from the Port of Calcutta to British and Foreign Colonies, 1875-1880.
33. Bihar State Archives, General Department, Emigration Branch, May 1885, 6-8.
34. *Ibid.*

35. Samita Sen, "Unsettling the Household : Act VI (of 1901) and the regulation of women migrants in colonial Bengal," *International Review of Social History* 41 (1996) [special supplement, "Peripheral" Labour ? Studies in the History of Partial Proletarianisation'].

36. The Report of the Assam Labour Enquiry Committee, Government of India (Calcutta, 1906) [henceforth Assam Report, 1906].

37. The literal meaning is original inhabitants. The British referred to them as 'aboriginals' or 'tribals'. In the Indian Constitutions most of these communities are included under the category 'Scheduled Tribes.' The term *adivasi* emerged out of self-assertion movements.

38. Assam Report, 1906.

39. WBSA, Judicial Police, August 1873, A95-98. Statement of cases from Annual Police Report of Commissioner of Chota Nagpore for the year 1872, Mannbhoom district. Opinion of the Judicial Commissioner in letter from Colonel J.S. Davies, Judicial Commissioner of Chota Nagpore to the Commissioner of Chota Nagpore, No. 132, 26 July 1873.

40. WBSA, Judicial Police, August 1873, A95-98. Annual Police Report of Commissioner of Chota Nagpore for the year 1872, Mannbhoom District.

41. WBSA, Judicial Police, August 1873, A95-98. Letter from Colonel J.R. Pughe, Inspector General of Police, Lower Provinces. to the Secretary to the Government of Bengal, Judicial Department, No. 6268, 20 August 1873.

42. WBSA, Judicial Police, August 1873, A95-98. Letter from Colonel J.S. Davies, Judicial Commissioner of Chota Nagpore to the Commissioner of Chota Nagpore, No. 132, 26 July 1873.

43. WBSA, Judicial Police, August 1873, A95-98. Annual Police Report of Commissioner of Chota Nagpore for the year 1872, Mannbhoom District.

44. *Ibid.*

45. WBSA, Judicial Police, August 1873, A95-98. Letter from Colonel J.R. Pughe, Inspector General of Police, Lower

Provinces, to the Secretary to the Government of Bengal, Judicial Department, No. 6268, 20 August 1873.

46. *Ibid.*
47. WBSA, Judicial Police, August 1873, A95-98.
48. WBSA, Judicial Police, August 1873, A95-98. Letter from Colonel J.R. Pughe, Inspector General of Police, Lower Provinces, to the Secretary to the Government of Bengal, Judicial Department, No. 6268, 20 August 1873.
49. WBSA, Judicial Police, August 1873, A95-98. Letter from Colonel J.S. Davies, Judicial Commissioner of Chota Nagpore to the Commissioner of Chota Nagpore, No. 132, 26 July 1873.
50. WBSA, Judicial Police, August 1873, A95-98. Letter from Colonel J.R. Pughe, Inspector General of Police, Lower Provinces, to the Secretary to the Government of Bengal, Judicial Department, No. 6268, 20 August 1873.
51. WBSA, Judicial Department, March 1873, A132-134. Letter from C.T. Buckland, Esq., Commissioner of the Burdwan Division to the Offg. Secretary to the Government of Bengal, Judical Department, No. 27, 17 January 1873.
52. WBSA, Judicial Department, March 1873, A132-134. Letter from C.T. Buckland, Esq., Commissioner of the Burdwan Division to the Secretary to the Government of Bengal, Judical Department, No. 93, 5 March 1873.
53. WBSA, Judicial Police, August 1873, A95-98. Letter from A. Mackenzie, Officiating Secretary to the Government of Benqal to the Secretary to the Government of India in the Legislative Department, No. 3980, 29 August 1873.
54. Sir John Edgar as Junior Secretary to the Government of Bengal had put together a collection of papers on Assam Tea in 1873. By 1882 he had become the Chief Secretary to the Government of Bengal. Sir Edgar's Report to the Government, No. 479 Cr., 3 November 1882. WBSA, Judicial Department, Judicial Branch, August 1893, A65-66, paragraph 7.

55. From C.C. Stevens, Commissioner of the Chota Nagpur Division to the Chief Secretary to the GOB, 28 February 1888. WBSA, Judicial Department, Judicial Branch, August 1893, A65-66.

56. WBSA, Judicial Department, Judicial Branch, August 1893, A65-66.

57. WBSA, Judicial Department, Judicial Branch, August 1893, A65-66.

58. Sir John Edgar, Chief Secretary to the Government of Bengal to the Commissioner of the Patna Division, 30 November 1889. *Ibid.*

৮

দুই বিশ্বযুদ্ধ মধ্যবর্তীকালীন বাঙলায় শ্রমিক-আন্দোলনে মার্কসবাদী ধারা

সুস্নাত দাশ*

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে প্রধানত ব্রাহ্মসমাজ-সংস্কারকদের আগ্রহে (শশীপদ বন্দোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখের নাম স্মর্তব্য) বাঙলায় শ্রমিক কল্যাণমূলক নানা কর্মসূচী বাস্তবায়িত হতে শুরু করে। শ্রমিক সাক্ষরতা ও ইউনিয়ন গঠন তার অন্যতম বিষয় ছিল। এরপর স্বদেশী যুগে বিপিন চন্দ্র পাল, ব্রহ্মবান্ধব থেকে অশ্বিনী ব্যানার্জী পর্যন্ত বাঙলায় শ্রমিক আন্দোলনের সংগঠনে জাতীয়তাবাদী নেতারা উদ্যোগ নিয়েছিলেন। বাঙলা ও বোম্বেতে প্রেস কর্মচারী, রেল কর্মচারী, ইঞ্জিনিয়ারিং, চটকল ও সূতাকল শ্রমিকরা স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে নিজেদের দাবি-দাওয়া নিয়ে বেশকিছু ধর্মঘট সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন। এ বিষয়ে সুমিত সরকার ও রজতকান্ত রায় বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।[১] প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে স্বয়ং গান্ধীজিও আমেদাবাদের মিল মজদুরদের ধর্মঘটের প্রতি সংহতি জ্ঞাপন করেছিলেন, যদিও শ্রেণী-সংগ্রাম পরিহার করে নিজস্ব আপসমুখী পথে। কিন্তু ১৯১৭ সালের নভেম্বরে রাশিয়ায় বলশেভিক বিপ্লব ও শ্রমিকশ্রেণীর শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সংবাদে ভারতের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনেও সদ্য মার্কসবাদে দীক্ষিত একদল তরুণের দ্বারা শ্রেণী-সংগ্রামের ও সমাজতান্ত্রিক ভাবাদর্শ রূপায়ণের প্রয়াস পূর্ণ-উদ্যমে শুরু হয়ে যায়। মূলত এরা সক্রিয় ছিল বোম্বে, বাঙলা, মাদ্রাজ এবং যুক্তপ্রদেশের শিল্পাঞ্চলগুলিতে। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে অবশ্য সংগঠিত ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সূচনা হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর অসহযোগ আন্দোলন চলার সময়। চিত্তরঞ্জন দাশ এ বিষয়ে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেন। দাশের অনুসরণে যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, বীরেন্দ্রনাথ

*লেখক রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস বিভাগের রীডার ও প্রধান।

শাসমল, সুভাষ বসু কংগ্রেস নেতারাও ট্রেড ইউনিয়নের কাজে নেতৃত্ব দেন। ডা. সুরেশ ব্যানার্জীরাও ছিলেন। এঁরা কিন্তু ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে কখনোই শ্রেণী-সংগ্রামের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখতেন না। অনেক পেশাদার উকিল-ব্যারিস্টার শিক্ষিত সম্প্রদায় থেকে ট্রেড ইউনিয়ন করতে আসতেন সমাজ সেবার মানসিকতা নিয়ে। এই নিবন্ধে সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটে দুই বিশ্বযুদ্ধ মধ্যবর্তীকালীন অবিভক্ত বাঙলায় বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়নের কর্মধারায় সদ্যগঠিত কমিউনিস্ট দলও নেতৃত্বের ভূমিকার একটি বস্তুনিষ্ঠ পর্যালোচনার চেষ্টা করা হয়েছে।

নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস (AITUC) প্রতিষ্ঠা ও কমিউনিস্ট তৎপরতা

রাশিয়ায় বলশেভিক বিপ্লবের (১৯১৭) পর, মধ্যএশিয়ার তাসখন্দে এম. এন. রায় প্রমুখের উদ্যোগে ১৯২০ সালে গড়ে ওঠে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি। আর সেই ১৯২০ সালে ৩১ শে অক্টোবর বোম্বের এম্পায়ার থিয়েটারে লালা লাজপত রায়ের সভাপতিত্বে ভারতবর্ষের শ্রমিকশ্রেণীর প্রথম সর্বভারতীয় সংগঠন 'All India Trade Union Congress (AITUC)' গঠিত হয়। ১৯২৯ সালে নাগপুর কংগ্রেসে এম. এন. যোশী, ভি. ভি. গিরি প্রমুখের নেতৃত্বের মডারেটরা যখন Indian Federation of Trade Unions (IFTU) গঠন করে AITUC থেকে বেরিয়ে গেলেন, তখন থেকে কমিউনিস্টরা AITUC-র উপর তাদের প্রাধান্য বেশ খানিকটা প্রতিষ্ঠা করতে শুরু করেছে। সাধারণ সম্পাদক পদে এস. ভি. দেশপাণ্ডে এবং সহ-সভাপতিদের মধ্যে কমিউনিস্ট-পন্থী ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ও বঙ্কিম মুখার্জী ছিলেন। সভাপতি হন সুভাষচন্দ্র বসু। বলাবাহুল্য বিগত সভাপতি জওহরলাল নেহরুর সমর্থন এরা লাভ করেছিলেন। AITUC তখন সংবাদ মাধ্যমের কাছে 'Communist dominated body' এবং 'Moscow inspired organisation নামে পরিচিত ছিল।[২] ১৯২৯-এ AITUC-র প্রথম ভাঙ্গনের কারণ নিঃসন্দেহে ছিল রাজনৈতিক। মডারেটরা শ্রমিক সংগঠনকে অর্থনীতির (economism) মধ্যেই আটকে রাখতে চেয়েছিল। এদের সঙ্গে ছিল ৩০টি ইউনিয়নের ৯৬,৬৩৯ জন সদস্য। অপর দিকে বামপন্থী ও কমিউনিস্টরা চেয়েছিল রাজনৈতিকভাবে AITUC-কে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের অংশ করতে। তারা সঙ্গে পেয়েছিল ২১টি ইউনিয়নের ৯২,৭৯৭ জন সদস্যকে।[৩]

ইতোমধ্যে ১৯৩১ সালে AITUC-তে আরো একটি ভাঙন এসেছিল। এই অভিমত প্রচলিত যে এর জন্য সম্পূর্ণতই দায়ী ছিল কমিউনিস্টরা এবং কমিণ্টার্নের (Comintern) ষষ্ঠ কংগ্রেসের (মস্কোতে ১৯২৮ সালে সংগঠিত কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক) নির্দেশ অনুসারে সমস্ত প্রকার বুর্জোয়াদের দ্বারা পরিচালিত প্রতিষ্ঠান থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে নেবার যে রাজনৈতিক লাইন তারা নিয়েছিল তারই পরিণতিতে এই ভাঙ্গন। নিঃসন্দেহে এটা আংশিক সত্যমাত্র। সুকোমল সেন দেখিয়েছেন কিভাবে কমিউনিস্টদের AITUC-র নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে দেবার ষড়যন্ত্র রায়পন্থীরা করেছিলেন এবং AITUC-র তৎকালীন সভাপতি সুভাষচন্দ্রের

ভূমিকাও এ ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ ছিল না।[৪] ড. সুমিত সরকার 'ঠাকুরদাস পেপার্স' উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন যে কিভাবে জামসেদজী টাটা ও ভারতীয় পুঁজিপতিদের একাংশ কমিউনিস্টদের ঠেকাতে একটা শক্তিশালী পুঁজিপতি লবি গড়ে তুলতে সক্রিয় হয়েছিল এবং এজন্য ইউরোপীয় পুঁজিপতিদের সঙ্গে হাত মেলাতেও দ্বিধাগ্রস্থ ছিল না।[৫]

১৯৩০-এর আইন অমান্য আন্দোলনে শ্রমিকশ্রেণীকে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করানোর একটা প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছিল। পরে অবশ্য কংগ্রেসের পক্ষ থেকে তাতে ভাঁটা পড়ে। বসু ও সেনগুপ্তরা নিম্নস্তরের দলাদলির রাজনীতিতে (তৎকালীন কলকাতা কর্পোরেশন-রাজনীতি এ প্রসঙ্গে উল্লেখ) এমনভাবে জড়িয়ে পড়েন যে শ্রমিক প্রত্যাশা পূরণে তা যথেষ্ট প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। উপরন্তু শাসমল-এর মতো জন্মসূত্রে নিম্নবর্ণীয় নেতাকে ক্ষমতা থেকে সরানোর যে সক্রিয় প্রয়াস উচ্চবর্ণের কংগ্রেসী নেতারা নেন শ্রমজীবি মানুষ তা ভাল চোখে নেননি।[৬] এছাড়া কংগ্রেসের শ্রেণী-রাজনীতি বিমুখতা তো ছিলই। আব্দুর রেজ্জাক খান, ধরণী গোস্বামী প্রমুখ কমিউনিস্টদের পরিচালনায় কলকাতা গাড়োয়ান ধর্মঘট (১৯৩০) ছিল এসময়ের এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

যাহোক এইসবের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৩১-এর পর ৬ই জুলাই কলকাতায় AITUC-র সম্মেলন স্থল ছেড়ে মেটিয়াবুরুজে একটি সম্মেলনে মিলিত হয়ে কমিউনিস্টরা তৈরী করলো *'All India Red Trade Union Congress'* — যার সভাপতি ডি. বি. কুলকার্ণি। এস. ভি. দেশপাণ্ডে, বঙ্কিম মুখার্জী ও এস. জি. সারদেশাই সম্পাদক এবং ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত হলেন কোষাধ্যক্ষ। ১২টি ইউনিয়ন এদের সঙ্গে ছিল। অপরদিকে রায়পন্থী আর. এস. রুইকর এবং সুভাষপন্থী মুকুন্দলাল এবং সুভাষচন্দ্র বসু স্বয়ং যথাক্রমে AITUC-র সভাপতি সম্পাদক এবং কোষাধ্যক্ষ হয়েছিলেন। Red Trade Union Congress-এর বাঙলা শাখার সম্পাদক হন সরোজ মুখার্জী। অফিস ছিল ৪১, জ্যাকেরিয়া স্ট্রীটে অর্থাৎ তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টির অফিসে।[৭]

মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার (১৯২৯-৩৩) পরেই এই ভাঙ্গন যে কমিউনিস্টদের পক্ষে মোটেই ভাল হয়নি ব্রিটিশ কমিউনিস্ট নেতা R. P. Dutt তা মেনে নিয়েছেন।[৮] কিন্তু এটাও ঘটনা যে ১৯৩৩ সালের মাঝামাঝি Red Trade Union Congress-এর তরফে যখন বি. টি. রণদিভে, সোমনাথ লাহিড়ি, বঙ্কিম মুখার্জী, জামালউদ্দিন বোখারী, জয়বন্ত-রা (বাঙলা থেকে যারা মীরাট বন্দী ছিলেন তাঁরা হলেন মুজফ্ফর আহমেদ, গোপাল বসাক, শামসুল হুদা, অযোধ্যা প্রসাদ, গোপেন চক্রবর্তী, ধরণী গোস্বামী, শিবনাথ ব্যানার্জী ও কিশোরীলাল ঘোষ—এই আটজন; এঁদের মধ্যে শেষোক্ত দুজন কমিউনিস্ট ছিলেন না। অপর একজন বাঙালী বন্দী ডঃ বিশ্বনাথ মুখার্জী ছিলেন সংযুক্ত প্রদেশের (UP) শ্রমিক-কৃষক দলের সভাপতি। AITUC-র সঙ্গে সাংগঠনিক ঐক্যের আবেদন করেন তখন তা প্রত্যাখ্যাত হয়।) AITUC-র পক্ষ থেকে বলা

হয়ঃ "....If the 'official communist group really desired unity, they should dissolve their Red Trade Union Congress altogether and join the AITUC unconditionally."[৯] যাহোক তা তখনই ঘটেনি এবং ১৯৩৩ সালে মডারেট নেতৃত্বে IFTU নাম বদল করে National Federation of Trade Unions বা NFTU গঠন করে।

AITUC-র দ্বিতীয় ভাঙ্গনের পূর্বেই ভারতের শ্রমিক আন্দোলনে কমিউনিস্টরাই ক্রমশঃ সংগ্রামী শক্তিরূপে গড়ে উঠতে থাকে, যদিও প্রদেশভিত্তিতে তাদের সংহতি খুব জোরালো তখনও হয়ে ওঠেনি। বোম্বেতে 'জি. আই. পি. রেল শ্রমিক ইউনিয়ন' ও 'গিরনী কমগর ইউনিয়নের' মতো দুটি শক্তিশালী শ্রমিক ইউনিয়নে ছিল কমিউনিস্টদের প্রায় অখণ্ড প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ। বাঙলা প্রদেশেও কলকাতা, হাওড়া, হুগলী ও ২৪পরগণার চটকল-শিল্প, ইঞ্জিনিয়ারিং-শিল্প ও অসংগঠিত কর্মচারীদের (যেমন গাড়োয়ান) মধ্যেও কমিউনিস্ট পার্টির বা বিভিন্ন কমিউনিস্ট গ্রুপের শ্রমিক সংগঠকরাই প্রধানত কাজ করতেন। মৃণালকান্তি বসু, সুভাষচন্দ্র বসু, প্রভাবতী দাশগুপ্ত প্রমুখ কংগ্রেসী নেতারা শ্রমিক সংগঠনের মাথায় থাকলেও, একবারে শ্রমিকদের মধ্যে থেকে কাজ করতেন আব্দুর রেজ্জাক খাঁ, মণি সিং, অখিল ব্যানার্জী, কঙ্কন মুখার্জী, আব্দুল মোমিনরা। মোমিন তখনও কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য না হলেও কমিউনিস্টদের সঙ্গেই কাজ করতেন। এই সময়কার (১৯২৮-৩৪) বাঙলার শ্রমজীবি (কলকাতা-কেন্দ্রিক) মানুষের প্রতিবাদী আন্দোলন-সংগ্রামের (Popular Protest) ইতিহাস পাওয়া যাবে তনিকা সরকারের গবেষণায়।[১০] কমিউনিস্টদের ভূমিকাই সেখানে বেশী উজ্জ্বলতর।

ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট সংগঠকরা দুটি ধারার মিশ্রণ ঘটিয়ে শ্রমিকদের মধ্যে ক্রমশই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল (অবশ্য দত্ত মজুমদারের লেবার পার্টিকে সঙ্গে পাওয়া তাদের পক্ষে সুবিধাজনক হয়েছিল)। এই দুটি ধারা ছিল—১. অর্থনীতিবাদী শ্রেণী সংগ্রাম অর্থাৎ মজুরী বাড়ানো ও ছাঁটাই কমানোর আন্দোলন এবং ২. শ্রমিকদের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদ বিরোধী রাজনৈতিক চেতনা গড়ে তোলা। দত্ত-ব্রাডলে থিসিসের Towards Trade Union's Unity অংশটি এক্ষেত্রে বিশেষ উপযোগী হয়েছিল। কারণ তাতে যেমন ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার লক্ষ্যে জাতীয় আন্দোলনে শ্রমিকশ্রেণীর অংশগ্রহণের কথা বলা হয়েছিল, পাশাপাশি আটঘণ্টা কাজের দাবী এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক দাবীদাওয়ার জন্যেও শ্রমিকদের সংগ্রাম করার পরামর্শ দেওয়া হয়। এছাড়া ছিল খাজনা কমানোর;জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের ও কৃষকের হাতে জমি তুলে দেওয়ার দাবী।[১১] যেহেতু আমাদের দেশের সাধারণ শ্রমিকদের অধিকাংশ গ্রামীণ ক্ষেত্র থেকে আগত—ফলে ভূমি সংস্কারের প্রশ্নে কমিউনিস্টদের এই আপসহীন মনোভাব তাদের আকৃষ্ট করত। বিশেষ করে বাঙলার চটকল শ্রমিকদের মধ্যে যেখানে কমিউনিস্টদের প্রভাব ছিল সর্বাধিক সেখানে এ স্লোগানগুলোর

মাধ্যমে তারা জনপ্রিয়তা অর্জন করে। ক্রমশই Bengal Provincial Trade Union Congress (BPTUC)- তে কমিউনিস্টরা প্রাধান্য বিস্তার করতে থাকে। ১৯৩৯-৪০ সালে যা শীর্ষ উঠে তার ভিত্তি তৈরী হয় ১৯৩৫-৩৬ সালেই। বস্তুতপক্ষে এই সময়কালে CPI নতুন উদ্যমে পরিবর্তিত পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে শ্রমিক আন্দোলনে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করে ও বিভিন্ন শিল্পে ট্রেড ইউনিয়ন গড়ার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এর উল্লেখযোগ্য প্রভাব দেখা গেছে বাঙলার চটকলগুলিতে ১৯৩৭ সালের বৃহত্তম সাধারণ ধর্মঘটের সময়।

১৯৩৫ সালের ১৯-২১ এপ্রিল AITUC-র চতুর্দশ সম্মেলনে C.P.I. পরিচালিত Red Trade Union Congress ভাঙ্গনের চার বছর পর পুনরায় AITUC-র সঙ্গে মিশে যায়। ঐক্যবদ্ধ ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের দাবী তখন সাধারণ শ্রমিক ও ইউনিয়ন কর্মীদের মধ্যে থেকেই উঠেছে। অর্থনৈতিক মন্দার ফলে শ্রমিকশ্রেণীর উপর ঔপনিবেশিক ও পুঁজিবাদী শোষণ ও আক্রমণ যতই তীব্র হতে থাকে ততই শ্রমিক আন্দোলনে ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা সব মহলেই গুরুত্ব পেতে থাকে। এছাড়া কমিউনিস্ট পার্টিও কমিন্টার্নের কাছ থেকে ক্রমশই আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক ঐক্য (বামপন্থী ও শ্রমিকশ্রেণীর প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করতে থাকে। এই প্রেক্ষাপটে ট্রেড ইউনিয়ন ঐক্যের রাজনৈতিক পটভূমিকাটি যথাযথভাবে দিয়েছেন সুকোমল সেন। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী ১৯৩৫-৩৬ সময়কালটি ছিল পূর্বের কয়েক বছর অপেক্ষা ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের এক নব উত্থানের পর্ব।[১২]

১৯৩৫-এর মার্চ মাসে AITUC-র নেতৃবৃন্দ একটা প্রচেষ্টা চালায় National Trade Union Federation-এর সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার, কিন্তু তখনই তা সম্ভব হয়নি NTUF নেতাদের অনমনীয়তার জন্যে। তবে ১৯৩৬ সালে একটি Joint Labour board গঠিত হয়েছিল ভবিষ্যৎ একীকরণের জন্য যা ১৯৩৭ সালে সম্ভবপর হয়। এই সময়কালের উল্লেখযোগ্য বিষয় নিঃসন্দেহে ছিল অর্থনৈতিক মন্দা সত্ত্বেও শ্রমিক সংখ্যার ক্রমবৃদ্ধি। চালু শিল্পগুলিতে ছাঁটাইয়ের ফলে শ্রমিক সংখ্যা হ্রাস পেলেও এই সময়কালে গড়ে ওঠা বিভিন্ন ক্ষেত্রে শিল্পোৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে ১৯৩৩ সালে সারা ভারতেব মোট শ্রমিক সংখ্যা ১৪ লক্ষ ৩ হাজার ২১২-র স্থলে ১৯৩৬ সালে হয় ১৬ লক্ষ ৫২ হাজার ১৪৭ জন। খুব স্বাভাবিকভাবেই ইউনিয়নের সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। ১৯২৯ সালে রেজিস্ট্রিকৃত ইউনিয়ন ও সদস্য সংখ্যা যেখানে ছিল যথাক্রমে ৭৫টি এবং ১ লক্ষ ৮১ হাজার ৭৭ জন—সেখানে ১৯৩৬ সালে দাঁড়ায় যথাক্রমে ২৪১টি এবং ২ লক্ষ ৬৮ হাজার ৩২৬ জন। এর মধ্যে AITUC-র হাতে ছিল ৭১টি ইউনিয়নের ৯৩,৭৫০ জন শ্রমিক এবং এন. এম. যোশী পরিচালিত সংস্কারপন্থী NTUF-এর হাতে ৬০টি ইউনিয়নের ১ লক্ষ ৪৭ হাজার ৫১৬ জন সদস্য। বাকি ছোটোখাটো ১১০ টি শ্রমিক ইউনিয়নের ২৭,০৬০ জন শ্রমিক

পরিচালিত হতো অন্যদের দ্বারা। NTUF-এর ১ লক্ষ ৬ হাজার ৬২৯ জন শ্রমিকই বন্দর, রেল ও জাহাজ শিল্পের কর্মী ছিল। পণ্য উৎপাদন শিল্পের অধিকাংশই ছিল AITUC-র হাতে। তবে কিছু ইউনিয়ন বার্ষিক রিটার্ন দাখিল করতো না। কিছু ভূয়ো সদস্যও নথিভুক্ত করতো। ১৯৩৬ সালে মে মাসে বোম্বেতে বামপন্থী ও কমিউনিস্টদের মিলিত AITUC-র সভাপতি হন আর. এস. রুইকর (জেলে যাওয়ার পরে হন মনিবেন কারা) এবং সাধারণ সম্পাদক হন আর. এ. খেদগিকার।[১৩]

নিঃসন্দেহে AITUC এবং Red Trade Union Congress-এর মধ্যেকার মিলন ভারতের কমিউনিস্টদের কাছে প্রেরিত কমিন্টার্ন-এর নির্দেশ ও দত্ত-ব্রাডলে থিসিস-এর সঙ্গে সম্পূর্ণই সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। ইনপ্রেকার-এর ৭ই মার্চ ১৯৩৬-এর সংখ্যায় লেখা হয়েছিল, *"For the working class of India to realise this important role, one thing is indispensable--the development of a united trade union movement, organising the main body of the workers on the basis of their common class interests in the daily struggle. In this manner the united working class will not merely be able to pull its full weight in successful economic struggles, but will be able to bring its full strength to bear in the powerful anti-imperialist people's front and this will be decisive for the future victory in the struggle against British imperialism"*[১৪]

ত্রিশের দশকের বাঙলায় বামপন্থী ও কমিউনিস্ট প্রভাবিত Trade Union-এর কর্মতৎপরতাই ছিল বেশী। NTUF-এর তুলনায় ১৯৩৫-৩৬ সালে AITUC-র দ্বারাই অধিক সংখ্যক ইউনিয়ন পরিচালিত হত বিশেষ করে বাঙলার চটকলের ৩ লক্ষ শ্রমিকের মধ্যে বামপন্থীদেরই শক্তি ছিল বেশি। ১৯৩৫-৩৬ সালে AITUC-কেই কমিউনিস্টরা সংগঠন গড়ার প্রধান মঞ্চ করে নেবার পর (মনে রাখা উচিত সে সময় দেশের মোট শ্রমিকের অর্থাৎ ১৬ লক্ষ ৫২ হাজারের মধ্যে মাত্র ২ লক্ষ ৬৮ হাজার অর্থাৎ মাত্র ১৫% সংগঠিত ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের মধ্যে এসেছে। শ্রমিক আন্দোলনে আধিপত্য (hegemony) প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা শুরু হয়। বাঙলায় এই কাজ অনেক সহজ হবার অন্যতম কারণ কমিউনিস্ট পার্টি তখন সদ্য 'জাতীয় বিপ্লববাদী' অংশ থেকে আসা এক ঝাঁক উজ্জ্বল তরুণের কর্মনৈপুণ্য যেমন লাভ করেছে, তেমনি বাঙলায় সর্বপ্রকার রাজনৈতিক মহলে শ্রদ্ধেয় ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত (স্বামী বিবেকানন্দের ভ্রাতা) এবং একদা গান্ধীর স্নেহধন্য কংগ্রেস নেতা বঙ্কিম মুখার্জীর সক্রিয় সহযোগিতা ট্রেড ইউনিয়ন ক্ষেত্রে পাচ্ছিল। বঙ্কিমবাবু ১৯৩৬ সালেই কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হন। তবে ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত কখনো সদস্য হননি, কিন্তু তিনি সর্বদা কমিউনিস্টদের সঙ্গেই চলেছেন এবং সহযোগীর ভূমিকা পালন করে গেছেন।[১৫]

সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে শ্রমিক আন্দোলনের বিস্তার

১৯৩৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে ১১টির মধ্যে সাতটি প্রদেশেই কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার ফলে কৃষকদের মতো শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যেও বিপুল প্রত্যাশা সৃষ্টি হয়েছিল। প্রধানত কমিউনিস্ট সোস্যালিস্ট ও বামপন্থী কংগ্রেসীদের দ্বারা পরিচালিত ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে এর ফলে নতুন গতিবেগ সৃষ্টি হয়েছিল। প্রধানত কমিউনিস্ট, সোস্যালিস্ট ও বামপন্থী কংগ্রেসীদের দ্বারা পরিচালিত ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে নতুন গতিবেগ সৃষ্টি হয়েছিল। কংগ্রেস মন্ত্রিসভাগুলিরও শ্রমিকদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট পূর্বেকার সিদ্ধান্ত ও প্রস্তাবগুলি রূপায়নের দায়বদ্ধতা ছিল। এতদিন শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থে যেসকল দাবিসমূহ নিয়ে কংগ্রেস সোচ্চার ছিল সেগুলি বাস্তবে প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা ক্রমশই জরুরী হয়ে পড়ে। কিন্তু ক্রমশই কংগ্রেস পরিচালিত মন্ত্রিসভার দায়-দায়িত্ব, জাতীয় কংগ্রেসের শ্রমিক-সমস্যা সম্পর্কে নীতিগত অবস্থান, এবং ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষার প্রশ্নে কংগ্রেসের বামপন্থী অংশ তথা কমিউনিস্টদের সঙ্গে দক্ষিণপন্থী অংশের মতবিরোধ তীব্র হয়ে উঠতে থাকে। জাতীয় কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতৃত্ব শ্রমজীবী মানুষের শ্রেণী ও পেশাগত আন্দোলনের সঙ্গে জাতীয় সাংগঠনিক যোগাযোগের ছিল তীব্র বিরোধী। অন্যদিকে কমিউনিস্ট ও অন্যান্য কংগ্রেসের বামপন্থী অংশ চাইছিলেন কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলনগুলিকে কংগ্রেসের পতাকাতলে সংগঠিত করতে। এই কারণে তারা শ্রমিক ও কৃষক সংগঠনগুলি যাতে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সামূহিক অনুমোদন (collective affiliation) পায় তার জন্য আগ্রহী ছিলেন। এই প্রশ্নে জওহরলাল নেহরুও বামপন্থীদের পক্ষ অবলম্বন করে অভিমত প্রকাশ করেন।[১৬] কিন্তু এসত্ত্বেও বাস্তবে কালেক্টিভ বা গ্রুপ অ্যাফিলিয়েশন ও বামপন্থীদের দ্বারা শ্রেণী-আন্দোলনকে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত করার এই প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হয়নি। তথাপি বিহার, যুক্তপ্রদেশ, মাদ্রাজ, বোম্বাই প্রভৃতি শিল্পোন্নত প্রদেশগুলিতে কংগ্রেস সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার ফলে শ্রমিকদের মধ্যে এই ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল যে আন্দোলন শুরু করলে তাদের দাবিগুলির মীমাংসা হতে পারে। ১৯৩৭ সালের ফেব্রুয়ারী-মে মাসে বাঙলায় চটকল শ্রমিকদের ছয় সপ্তাহব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে এই উত্তাল শ্রমিক আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে ১৯৩৭-৩৮ সময়কালে বামপন্থী প্রভাবিত ট্রেড ইউনিয়নগুলির আন্দোলন সংগ্রামের বিস্তারিত একটি রূপরেখা পাওয়া যায় সাম্প্রতিক গবেষণায়।[১৭]

এই সময় বোম্বাই, শোলাপুর, আহমেদাবাদ, কানপুর এবং মাদ্রাজের কোয়েম্বাটুর, মাদুরাই প্রভৃতি স্থানে সূতাকলে শ্রমিক অসন্তোষ লেগেই ছিল। কানপুর সূতাকলে মজদুর সভার ডাকে বেতনবৃদ্ধি, ছাঁটাই বন্ধ ও অন্যান্য দাবিতে শ্রমিকদের আন্দোলন শেষ পর্যন্ত ৪০,০০০ শ্রমিকের সাধারণ ধর্মঘটে পরিণত হয়। এর আগে আন্দোলন খর্ব করার জন্য সরকার ও

মালিকদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ১৯৩৮ সালে বাংলার চটকল শ্রমিকরা জুট অর্ডিন্যান্স (যার দ্বারা শ্রমিকদের কাজের ঘণ্টা অনুযায়ী বেতন কমিয়ে দেবার ব্যবস্থা হয়)-এর বিরুদ্ধেও আন্দোলনে নামতে বাধ্য হয়। শেষ পর্যন্ত অবশ্য বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে কৌশলগত মতপার্থক্যের দরুণ কোন সাধারণ ধর্মঘট করা সম্ভব হয়নি। ১৯৩৯-এর গোড়ার দিকে জুট অর্ডিন্যান্স প্রত্যাহৃত হয়।

১৯৩৯-এর নভেম্বরে বোম্বাই সরকার ট্রেড ডিসপিউটস বিল প্রয়োগ করে আকস্মিক শ্রমিক ধর্মঘট ও মালিক পক্ষের ঘোষিত লকআউট উভয়ই নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। বোম্বাই-এর অধিকাংশ ধর্মঘট সূতাকলে হত বলে একটি 'এনকোয়ারি কমিটি' গঠিত হয় এবং তার অনুমোদনক্রমে শ্রমিকদের বর্ধিত বেতনহার ও বসবাসের উন্নততর ব্যবস্থার দাবি সরকার এই সময় খানিকটা মেনে নেয়। কিন্তু বোম্বাই-এর কমিউনিস্ট নেতৃত্বাধীন গিরনি কামগড় ইউনিয়ন তাতে সন্তুষ্ট হয় না এবং ৭ই নভেম্বর সরকার এই সময়কার শ্রমিক-মালিক সংঘাতের ঘটনাগুলিতে হস্তক্ষেপ করে—তার ফলে কিছু মজুরি বেড়েছিল। কানপুরে ১৯৩৭ সালের ধর্মঘটের পর গঠিত 'লেবার এনকোয়ারি কমিটির' সুপারিশ মালিকরা মানতে রাজী না হলে ১৯৩৮ সালে দ্বিতীয়বার সাধারণ ধর্মঘট শুরু হয়। ইউনিয়ন নেতৃত্বের কমিউনিস্ট ভাবাপন্ন অংশটিই দীর্ঘ ধর্মঘট চালানোর পক্ষপাতী ছিল। সরকারের সমস্ত দমনপীড়ন সত্ত্বেও ৫২ দিন ধরে আন্দোলন সংগ্রাম চলার পর, মালিকরা শেষ পর্যন্ত সুপারিশ মেনে নেয়। এই সময়কার অন্যান্য উল্লেখযোগ্য ধর্মঘটের মধ্যে ছিল আসামের বিভিন্ন চা বাগানের ধর্মঘট, ১৯৩৯ সালে প্রায় ৮ মাসব্যাপী ডিগবয় তেল শ্রমিকদের ধর্মঘট, বাঙলায় বার্ণপুর ও কুলটিতে ইন্ডিয়ান আয়রণ ও স্টীল কোম্পানীর শ্রমিকদের ধর্মঘট (জুন-জুলাই, ১৯৩৮) এবং বিহারের কয়লাখনিগুলিতে শ্রমিকদের ব্যাপক তৎপরতা. ১৯৩৭-৩৯ সময়কালে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে বিগত বছরগুলির তুলনায় শ্রমবিরোধের সংখ্যা; ধর্মঘটে লিপ্ত শ্রমিক কর্মচারীর সংখ্যা এবং তার ফলে নষ্ট মোট শ্রমদিবসের সংখ্যা ছিল অনেকগুলি বেশী। ১৯৩৫ সাল থেকে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত তথ্য অনুসন্ধান করলে শ্রমিক আন্দোলনের তীব্রতা বৃদ্ধির চিত্রটি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে :[১৮]

বৎসর	শ্রমবিরোধের সংখ্যা	লিপ্ত শ্রমিকের সংখ্যা	মোট শ্রমদিবস নষ্টের সংখ্যা
১৯৩৫	১৪৫	১,১৪,২১৭	৯,৭৩,৪৫৭
১৯৩৬	১৫৭	১,৬৯,০২৯	২,৩৫৮,৬৬২
১৯৩৭	৩৭৯	৬,৪৭,৮০০	৮,৯৮২,২৫৭
১৯৩৮	৩৯৯	৪,০১,০৭৫	৯,০৯৮,৭০৮
১৯৩৯	৪০৬	৪,০৯,০৭৫	৪,৯৯২,৭৯৫
১৯৪০	৩২২	৪,৫২,৫৩৯	৭,৫৭৭,২৮১

সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলনের এই গতিবেগ ও তীব্রতা দেশীয় শিল্পপতিদের পাশাপাশি ব্রিটিশ সরকারকেও উদ্বিগ্ন করে তুলেছিল। প্রকৃতপক্ষে ব্রিটিশ প্রশাসনের সঙ্গে এক্ষেত্রে প্রাদেশিক সরকারগুলিরও দৃষ্টিভঙ্গী ও পার্থক্য খুব কমই চোখে পড়ে। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ পরিচালিত সরকারগুলি ব্রিটিশ প্রশাসনের সঙ্গে যৌথভাবে বিশেষত বামপন্থীদের দ্বারা পরিচালিত শ্রমিক ধর্মঘট ও আন্দোলন ভেঙে দেওয়াব জন্য দমনপীড়নে পিছপা ছিল না।

১৯৩৯ সালের প্রথমদিকে জামসেদপুরের ওয়্যার প্রোডাক্ট কোম্পানির ধর্মঘটেব সময় কারখানার গেটে পিকেটিংরত হাজারা সিং-এব শরীরের উপর দিয়ে কোম্পানী লরি চালিয়ে রাণীগঞ্জ পেপার মিলের শ্রমিক নেতা সুকুমার ব্যানার্জির মতো হত্যা (১৫ নভেম্বর ১৯৩৮) করে। পরপর দুবছর পৃথক জায়গায় একইভাবে ধর্মঘটী শ্রমিক নেতাদের এইভাবে হত্যা করে ধর্মঘটী শ্রমিকদের মনোবল নষ্ট করার চেষ্টা করা হয়। এই সময়কার আরও বিশেষ উল্লেখযোগ্য ধর্মঘট হয় ডিগবয়ের তৈলখনিতে। ১৯৩৭ সালে সেখানকার শ্রমিকদের অবস্থা সমীক্ষার জন্য একটি বেসরকারী কমিটি গঠিত হয়ছিল। এই কমিটির সামনে সাক্ষী দেবার অপরাধে ষাটজন শ্রমিককে ছাঁটাই করা হয়। তার প্রতিবাদে এবং এই কমিটির সুপারিশগুলি কার্যকরী করার দাবিতে ডিগবয়ের দশ হাজার শ্রমিক ধর্মঘট শুরু করেন। তাঁরা অসম্ভব দুঃখ কষ্ট সহ্য করেও এই ধর্মঘট চালিয়ে যান। ১৮ই এপ্রিল সশস্ত্র-বাহিনীগুলি চালিয়ে তিনজন শ্রমিককে হত্যা ও বহু শ্রমিককে পঙ্গু করে দেয়। সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি ১৯৩৮ সালে ৬ই আগষ্ট ভারতব্যাপী ডিগবয় দিবস পালন করার জন্য শ্রমিকশ্রেণীর কাছে আহ্বান জানায় এবং সমস্ত ইউনিয়নের কাছে ডিগবয়ের ধর্মঘটী শ্রমিকদের সাহায্য পাঠানার আবেদন করে। এই ধর্মঘট সারা দেশব্যাপী শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে এক আলোড়ন সৃষ্টি করে।

১৯৩৯ সালের ২৩শে জুলাই এ. আই টি. ইউ. সি-র ওয়ার্কিং কমিটির একটি সভা হয়। সেই সভা থেকে সূতাকলগুলিতে র‍্যাশনালাইজেশনের তীব্র প্রতিবাদ করা হয়। ঐ সময় বস্ত্র শিল্পের মালিকরা সারা দেশে ব্যাপক শ্রমিক ছাঁটাই-এর পরিকল্পনা গ্রহণ করে। বিশেষত বোম্বে, আহমেদাবাদ প্রভৃতি স্থানে নাইট শিফ্‌ট বন্ধ করা ছাড়াও ব্যাপক র‍্যাশনালাইজেশন করা হয়। ইতিমধ্যেই বাঙলার চটকলগুলিতে দুলক্ষ শ্রমিক ছাঁটাই হয়ে গিয়েছিল এবং অন্যদেরও কাজের দিন কমিয়ে দেওয়া হচ্ছিল। ওয়ার্কিং কমিটির এই সভা থেকেই চটকল, সুতাকল, জাহাজ ও সাধারণভাবে অন্যান্য শিল্পে যে ক্রমশ বেকারী বাড়ছিল সেদিকে লক্ষ্য রেখে সমস্ত প্রাদেশিক সরকারের কাছে দাবি করা হয়, "বেকারীর ফলে অনশনে যে ব্যাপক মানুষ থাকতে বাধ্য হচ্ছে, তার প্রতিবিধানের জন্য অনতিবিলম্বে বেকারী বিমা চালু করতে ও তাকে চালিয়ে যেতে হবে।" তাছাড়া এ. আই. টি. ইউ. সি-র সঙ্গে যুক্ত ইউনিয়নগুলির কাছে আহ্বান জানানো হয়েছিল যাতে "বেকারদের সংগঠিত করে বিক্ষোভ, সমাবেশ ও অন্যান্য প্রচার মাধ্যমেব দ্বারা দেশের জনসাধারণ ও তাদের দাবিগুলির উপর রাষ্ট্রের কাছে চাপ সৃষ্টি

করা যায়।" ওয়ার্কিং কমিটির এই সভাতেই উত্তরপ্রদেশ সরকার শ্রমিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে যে যথেচ্ছ ও ব্যাপকভাবে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৪ ও ১০৭ ধারা প্রয়োগ করত তার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানানো ছাড়াও শ্রমিক আন্দোলনের উপর দানবীয় আক্রমণের নিন্দা করে এই আইনগুলি প্রয়োগ না করার দাবি জানানো হয়। উল্লেখযোগ্য যে ঐ সময়ই বোম্বে সরকার ভারতীয় ফৌজদারী আইনের ১৫৩ ধারা শ্রমিকদের দাবি দাওযার আন্দোলনের উপর ব্যাপক হারে প্রয়োগ করেছিল। এর বিরুদ্ধেও এ. আই. টি. ইউ. সি তীব্র প্রতিবাদ জানায়।[১১]

সর্বভারতীয় শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল ১৯৩৮-এর এপ্রিল মাসে নাগপুরে অনুষ্ঠিত যৌথ অধিবেশন থেকে অল ইন্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস এবং ন্যাশনাল ফেডারেশন অফ ট্রেড ইউনিয়ন্‌স-এর সংযুক্তিকরণ। AITUC এই সময় একটি শক্তিশালী শ্রমিক সংগঠন রূপে আত্মপ্রকাশ করে এবং সংগঠনিক প্রভাব বিস্তৃত হয়। সোস্যালিস্ট ও কমিউনিস্টরা সেই সময় শ্রমিক আন্দোলনের প্রধান চালিকাশক্তি হয়ে উঠেছিল। দিল্লীতে ১-২ জানুয়ারী, ১৯৩৮ সালে AITUC-র ষোড়শ অধিবেশন যখন অনুষ্ঠিত হয় তখন তার অনুমোদিত ৯৮টি ইউনিয়নের মোট সদস্য সংখ্যা ছিল ১,২২,০৫০ জন। এই অধিবেশন থেকে শিবনাথ ব্যানার্জী সভাপতি এবং কমিউনিস্ট নেতা বঙ্কিম মুখার্জী সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন। দুজন সহ-সভাপতি হন এস. এ. ডাঙ্গে এবং এস. ভি. ঘাটে। অন্যান্য দাবি-দাওয়ার সঙ্গে দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব যা এই অধিবেশন থেকে গৃহীত হয় তা ছিল ৬-ই মার্চ (১৯৩৮) রাজবন্দীদের মুক্তির 'প্রতিবাদ দিবস' পালন এবং ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের জন্য ২০শে মার্চ 'সর্বভারতীয় দাবি দিবস' উদ্‌যাপন ও দাবিপত্র পেশ যাতে ব্যাপক অংশের বুদ্ধিজীবি, শ্রমিকনেতা ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা স্বাক্ষর দিয়েছিলেন।

নাগপুরে ১৯৩৮-এর এপ্রিল AITUC ও NFTU-এর সংযুক্তির ফলে সর্বভারতীয় শ্রমিক আন্দোলনে AITUC বৃহত্তম শক্তিতে পরিণত হয়েছিল। এই সংযুক্তিকরণের শর্তগুলি ছিল যথাক্রমে—১) NAITUC মেনে নেবে। ৩) NFTU অন্ততঃ একবছর AITUC-র অনুমোদিত শাখারূপে থাকবে। ৪) AITUC কোন আন্তর্জাতিক সংস্থার অধীনস্থ হবে না। ৫) সমস্ত রাজনৈতিক বিতর্কের নিষ্পত্তি এবং ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত ৩/৪ অংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় গৃহীত হতে হবে। ৬) সংগঠনের পতাকার রং হবে লাল এবং তাতে 'TUC' শব্দটি অঙ্কিত থাকবে।

এই চুক্তির ফলে উভয় শ্রমিক সংগঠনের ৪৪ জন করে মোট ৮৮ জনের সাধারণ পরিষদ গঠিত হয়েছিল এবং দুটি সংগঠন মিলে মোট ১৮৮টি ইউনিয়ন AITUC-র অধীনস্থ হয়। যার সম্মিলিত সদস্য সংখ্যা ছিল ৩,৬৬,৪৫৬ জন। প্রসঙ্গত প্রায় আড়াই লক্ষ সদস্য সংখ্যাব NFTU রেলপথ, বন্দর ও নৌশিল্পে সব থেকে শক্তিশালী সংগঠিত ট্রেড ইউনিয়নরূপে সেই সময় কাজ করত। সুতরাং এই সংযুক্তিকরণ নিঃসন্দেহে ভারতে শ্রমিক আন্দোলনে বামপন্থীদের

প্রভাব বিস্তারে অত্যন্ত সহায়ক হয়ে ওঠে। অবশ্য এর জন্য কমিউনিস্ট ও সোস্যালিস্ট নেতৃত্বকে NFTU-এর মডারেট কার্যক্রম বহুলাংশে স্বীকার করে নিতে হয়েছিল। সংযুক্ত AITUC যে কর্মসমিতির নেতৃত্বভার গ্রহণ করে তাদের মধ্যে জাতীয়তাবাদী, সমাজবাদী এবং কমিউনিস্ট সকল পক্ষই ছিল।[৮০] তবে সভাপতি সুরেশচন্দ্র ব্যানার্জী এবং সম্পাদক আর. আর. বাখালে উভয়ই ছিলেন মডারেট ও NFTU নেতা। অন্যান্যরা ছিলেন সহ-সভাপতি ঃ আফতাব আলী (NFTU), যমুনা দাস (NFTU) এবং মুকুন্দলাল সরকার (AITUC)। সহ সম্পাদক ঃ বঙ্কিম মুখার্জী (AITUC) এস. ভি. পারুলেকর (AITUC)। কোষাধ্যক্ষ হন আর. এস. নিম্বকর (AITUC)।

দেশের এই দুটি সর্ববৃহৎ শ্রমিক সংগঠনের সংযুক্তি যেমন কমিউনিস্টদের যুক্ত ফ্রন্ট তত্ত্বের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল তেমনি তা জাতীয় আন্দোলনকেও শক্তিশালী করে। ১৯৩৯-এর জুলাই মাসে সারা ভারত কৃষকসভা AITUC-র কাছে প্রস্তাব রেখেছিল যে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে কৃষক ও শ্রমিক সংগঠনের একটি যুক্ত কমিটি গঠন করা হোক। যে কমিটি জমিদার ও পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে যুক্ত আন্দোলন গড়ে তুলবে। AITUC এই প্রস্তাব গ্রহণ করে ও যুক্তকমিটি গঠনে উদ্যোগী হয়।[৮১] রজনীপাম দত্ত সঠিকভাবেই জাতীয় সংগ্রামে শ্রেণী আন্দোলনের ভূমিকাটিকে নির্দেশ করে লিখেছেন ঃ

"The working class through its powerful political protest actions against imperialist misdeeds, in support of national demands and by its daily battles against imperialist repression, already stood out as a strong, organised section of the anti-imperialist forces."[৮২]

জাতীয় আন্দোলনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে AITUC তার প্রভাব ও ভূমিকা বিস্তাব করেছিল বিশেষ করে শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি র আন্দোলনের পাশাপাশি রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির দাবি এবং কমিউনিস্ট পার্টির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের প্রশ্নটি ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কংগ্রেসী রাজনীতি এবং জাতীয় আন্দোলনের বাইরে থাকা বৃহত্তর অংশের শ্রমজীবি মানুষকে সংগঠিত করার ক্ষেত্রে বামপন্থীদের দ্বারা পরিচালিত নিখিল ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের (AITUC) ভূমিকা ছিল সর্বপ্রধান।

সুমিত সরকারের মন্তব্য এক্ষেত্রে স্বীকার্য ঃ

"Despite some congress efforts to rally the working class (as when Nehru and Bose appealed to workers to 'unite, organies and join hands with the congress a big labour rally in Calcutta in October 1937, or a Hindustan Majdur Sabha was set up 1938 by leaders like Patel, Rajendra Pasad and J. B. Kripalani), the bulk of the trade union

movement remained under either Liberal or Leftist (mostly communist) leadership."[৬১]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ১৯৩৭-এর নভেম্বর আমেদাবাদের সূতাকলগুলিতে যে ধর্মঘট হয়েছিল তাতে কমিউনিস্টদের প্রভাব ও অনুপ্রবেশ ছিল গুরুত্বপূর্ণ—যা প্রমাণ করে গান্ধীর নিজের প্রদেশেও শ্রমিক আন্দোলনে কমিউনিস্ট প্রভাব কতটা শক্তিশালী হয়ে উঠতে শুরু করেছে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে দেশের বিভিন্ন প্রদেশে ১৯৩৭ সালে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা গঠন জনগণের মধ্যে FTU এখন থেকে AITUC-র অনুমোদিত শাখারূপে কাজ করবে। ২) NFTU-এর গঠনতন্ত্র রূপে বিপুল উদ্দীপনা ও আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করেছিল। কিষাণ সভার পাশাপাশি ট্রেড ইউনিয়ন কার্যকলাপ ও শ্রমিকদের দাবি আন্দোলন এই সময় তীব্র রূপ নেয়। বে-আইনী অবস্থায় থাকলেও কমিউনিস্টদের সাংগঠনিক ক্ষমতা এই সময় গণআন্দোলনগুলির মাধ্যমে বহুগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছিল। বে-আইনী CPI-এর সাপ্তাহিক মুখপত্র রূপে *'National Front'* বোম্বাই থেকে প্রকাশিত হতে থাকে। সেখানে মারাঠী ভাষায় প্রকাশিত হয় *'ক্রান্তি' নামক পত্রিকা, মাদ্রাজ থেকে 'New Age'* এবং বাংলায় প্রকাশিত হয় 'গণশক্তি' পত্রিকা। পাঞ্জাবের কীর্তি-কমিউনিস্টরা মীরাট থেকে প্রকাশ করেন পাঞ্জাবী ভাষায় 'কীর্তি লহর' পত্রিকা। এইসব পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত প্রকাশিত হত সর্বভারতীয় শ্রমিক আন্দোলনগুলির সংবাদ।

শ্রমবিরোধ আইন পাশের বিরুদ্ধে ১৯৩৮-এর ৭ই নভেম্বর বোম্বাই-এর ৭৭টি বস্ত্রকলের মধ্যে ১৭টিতে ধর্মঘট সংগঠিত করলেন এ. আই. টি. ইউ. সি., কমিউনিস্ট ও ড. বি. আর. আম্বেদকারের অনুগামীরা। ফলে কিছু 'বিশৃঙ্খলা' দেখা দেয় এবং দুটি কারখানায় ব্যাপকভাবে ইষ্টক বর্ষণের ফলে কয়েকজন পুলিশ আহত হয়। পুলিশ গুলি চালালে দুজন নিহত হন, আহত হন ৭০ জনেরও বেশী। মাদ্রাজ সরকারও (এবং প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিও) ধর্মঘটের বিরুদ্ধে কঠোর নীতি গ্রহণ করেছেন। কখনো কখনো তা হিংস্রাশ্রয়ী রূপ পর্যন্ত নিয়েছে। কানপুরের শ্রমিকরাও বারবার ধর্মঘট করেছেন, কখনো কখনো হিংসার আশ্রয় নিয়ে আক্রমণও তারা করেছে পুলিসের বিরুদ্ধে। আবার তারা কংগ্রেসের সমর্থন পেতেও চেষ্টা করেছে। যাহোক, যে পরিস্থিতিতে নিজেদের গণভিত্তিই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সেই পরিস্থিতি কি ভাবে সামাল দেবেন কংগ্রেস মন্ত্রীরা তা বুঝে উঠতে পারেন নি; তারা মধ্যস্থের ভূমিকা পালন করতে চেষ্টা করেছিলেন। উত্তরপ্রদেশ ও বিহারে এবং কিছুটা পরিমাণে মাদ্রাজে তা সফল হলেও, বোম্বাইতে হয়নি, তবে সাধারণভাবে তারা বামপন্থী সমালোচকদের খুশী করতে পারেন নি। মন্ত্রিসভাগুলো প্রায়শই জঙ্গী প্রতিবাদ, বিশেষ করে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে আইন-শৃঙ্খলার সমস্যা হিসেবে দেখেছে। আন্দোলনরত শ্রমিকদের বিরুদ্ধে তারা ফৌজদারী দণ্ডবিধির ১৪৪ ধারা প্রয়োগ করেছে, কানপুরে কৃষক ও ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের গ্রেপ্তার পর্যন্ত করেছে।

কংগ্রেস সরকারগুলো যেভাবে গণপ্রতিবাদের মোকাবিলা করছিলেন তার তীব্র সমালোচনা করেছিলেন বামপন্থীরা। তারাই অভিযোগ করেন এসব সরকার কৃষক ও শ্রমিকদের সংগঠনগুলোকে দমন করার চেষ্টা করেছেন। কমিউনিস্টরা কংগ্রেস মন্ত্রিসভাগুলোর যে সমালোচনা করেন পরবর্তীকালে তারই সারসংক্ষেপ পাওয়া যায় রজনীপাম দত্তের রচনাতে,

"আপসকামী নেতাদের সাম্রাজ্যবাদী প্রশাসনের ফাঁদে আটকে যাওয়ার অন্তর্নিহিত বিপদ প্রকট হয়ে উঠেছে কংগ্রেস মন্ত্রিসভাগুলোর দুবছরের অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে। প্রভাবশালী দক্ষিণপন্থী নেতৃত্ব আসলে কংগ্রেস সংগঠনমাত্র ও মন্ত্রিসভাগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করেছেন এবং বাস্তবে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সহযোগিতা বাড়িয়ে চলেছেন, আরো বেশী খোলাখুলিভাবে ভূস্বামী ও শিল্পপতিদের মতো উচ্চশ্রেণীগুলোর স্বার্থে কাজ করেছেন সব রকমের জঙ্গী গণ-আন্দোলনের বিরুদ্ধে তাদের বিদ্বেষ প্রকট হয়ে উঠেছে।......সুতরাং জাতীয় আন্দোলনে এক নতুন সঙ্কট সৃষ্টি হতে চলেছে।"[৫৪] (বঙ্গানুবাদ)

জাতীয় আন্দোলনের এই সংকটই ১৯৩৯ থেকে ১৯৪২ সাল পর্যন্ত ভারতীয় রাজনীতির দুর্ভাগ্যজনক বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছিল।

বাঙলায় শ্রমিক-আন্দোলনের বহুমাত্রিকতা ও কমিউনিস্ট পার্টি

অবিভক্ত বাঙলায় ১৯৩৭-৩৯ কালপর্বে বেআইনী ঘোষিত কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাব বিস্তারের অন্যতম ক্ষেত্র ছিল শ্রমিক আন্দোলন। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ শ্রমিক সংগঠনরূপে AITUC-র সাংগঠনিক বিস্তার ও জাতীয় আন্দোলনে শ্রেণী-রাজনীতির ভূমিকা সম্পর্কে পূর্বের অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। বোম্বাই প্রদেশ ব্যতীত বাঙলাই ছিল বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের প্রধান ক্ষেত্র। নানা ধারা, লক্ষ্য, নীতি ও শিল্পক্ষেত্রে এই সময়কালের শ্রমিক আন্দোলনগুলি বহুমাত্রিক রূপে বাঙলায় পরিচালিত হয়েছিল। ১৯৩৭-এর বঙ্গীয় প্রাদেশিক আইনসভা নির্বাচনে আটটি শ্রমিক কেন্দ্রের ৫টি আসনেই জয়ী হয়েছিলেন কংগ্রেস সমর্থিত AITUC প্রার্থীরা। এর মধ্যে আসানসোল কয়লাখনি শ্রমিক অঞ্চল এবং ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চল থেকে জয়ী হন দুজন কমিউনিস্ট শ্রমিক নেতা বঙ্কিম মুখার্জী ও নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার। নীহারেন্দুবাবুর জয়ের ব্যবধান ছিল বিশাল। অপর তিনটি আসন ছিল হাওড়া, হুগলী, এবং কলকাতার শিল্পাঞ্চলে। সেখান থেকে অকমিউনিস্ট ৩ জন শ্রমিক নেতা নির্বাচিত হয়েছিলেন। এঁরা ছিলেন যথাক্রমে শিবনাথ ব্যানার্জী, এ. এম. এ. জামান এবং সুরেশচন্দ্র ব্যানার্জী। এ ছাড়া রেলপথ এবং জলপথ শ্রমিক সংস্থার পক্ষ থেকে যে দুজন শ্রমিক নেতা জয়ী হন তাঁরা যথাক্রমে জে. এন. গুপ্ত ও আফতাব আলী। এঁরা দুজনেই ছিলেন NFTU-যুক্ত। চা বাগান শ্রমিককেন্দ্র থেকে লিন্ডা মুণ্ডা সর্দার নামে একজন নির্দলীয় নির্বাচিত হন। ৫টি শ্রমিক আসনে মুসলিম লিগের বিরোধিতা সত্ত্বেও AITUC র জয়লাভ ১৯৩৭-এর পরবর্তীকালে বাঙলার শ্রমিক আন্দোলন নিঃসন্দেহে নতুন মাত্রা সংযোজন করেছিল। এক

বছরের মধ্যে ১৯৩৮ সালে NFTU-র AITUC-তে সংযুক্তি ঘটে এবং প্রায় সকলপ্রকার বামপন্থী শক্তি ঐক্যবদ্ধ ভাবে AITUC-তে সামিল হওয়ার ফলে[২৫] এই সংগঠনটির কার্যকারিতা পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পায়। কমিউনিস্ট শ্রমিক নেতাদের এই সময় তিন প্রকারের সমস্যার মুখে দাঁড়িয়ে কাজ করতে হয়েছিল। প্রথমত, বিভিন্ন প্রকারের বামপন্থী, উদারপন্থী ও জাতীয়তাবাদী শ্রমিক সংগঠকদের মধ্যে একটা সংহতি বজায় রেখে চলা; দ্বিতীয়ত, শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িকতা প্রচার ও সাম্প্রদায়িক বিভেদনীতির বিরুদ্ধে নিজেদের প্রভাব ধরে রাখা ও বিস্তার ঘটানো; তৃতীয়ত, জাতীয় রাজনীতির সঙ্গে AITUC পরিচালিত শ্রমিক আন্দোলনের যোগসূত্র স্থাপন।

প্রথম বিষয়টির ক্ষেত্রে কমিউনিস্টদের এই সময়কালে নানা জটিলতা ও প্রতিকূলতার মধ্যে কাজ করতে হয়। 'ন্যাশনাল ফেডারেশন অফ ট্রেড ইউনিয়ন' ১৯৩৮-এ AITUC-র সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে যুক্ত হওয়ার ফলে বামপন্থী প্রভাবিত এই শ্রমিক সংগঠনে মধ্যপন্থী, উদারনৈতিক ঝোঁক আত্মপ্রকাশ করেছিল। বিশেষ করে বন্দর, রেলপথ ও জলপথ পরিবহণ শ্রমিকদের মধ্যে NFTU-র উল্লেখযোগ্য প্রভাব ছিল। ফলে BPTUC র মধ্যে কমিউনিস্টরা ছাড়াও অপর যে বামপন্থী অংশ সক্রিয় ছিল তার মধ্যে যেগুলি উল্লেখযোগ্যভাবে সে সময় বাঙলার শ্রমিক আন্দোলনে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করে সেগুলি হল 'কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি', 'বেঙ্গল লেবার পার্টি', সৌমেন ঠাকুরপন্থী 'ওয়ার্কার্স লীগ' এবং এম. এন. রায়পন্থী 'লীগ অফ র‍্যাডিক্যাল কংগ্রেসমেন' প্রভৃতি। বাঙলায় CSP-র কিছু সীমিত প্রভাব ছিল চটকল এবং সূতাকল শিল্পে। হাওড়ায় শিবনাথ ব্যানার্জীর প্রভাবে।

চটকল ও ইঞ্জিনিয়ারীং শিল্পেও CSP-র প্রভাব দেখা গেছে, হুগলীর সুতাকল শিল্পেও এর প্রভাব ছিল লক্ষ্যণীয়।[২৬] কিন্তু BPTUC-র অন্যতম প্রধান শক্তি ছিল বেঙ্গল লেবার পার্টি। অবিভক্ত বাঙলায় লেবার পার্টি BLP ১৯৩৪ সালে CPI বেআইনী ঘোষিত হওয়ার পর কমিউনিস্টদের আইনী প্ল্যাটফর্মরূপে কাজ করতে থাকে। ১৯৩৩ সালে বেশ কয়েকজন কমিউনিজমের আদর্শে বিশ্বাসী মার্কসবাদী উচ্চশিক্ষিত তরুণ BLP-তে যোগ দিয়ে সংগঠিত শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে কাজ শুরু করেছিলেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন সদ্য বিলেত-ফেরত ব্যারিস্টার নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার, নির্মল সেনগুপ্ত ও বীরেশ গুহ। এছাড়া ছিলেন কিরণ বসাক, প্রমোদ সেন, কমল সরকার, বিশ্বনাথ দুবের মতন ছাত্র নেতারা (মার্কসবাদী 'ছাত্রদল' গোষ্ঠী)। এছাড়া নিত্যানন্দ চৌধুরী, শিশির রায়, সাধু রায়, নন্দলাল বসু, অনন্ত মুখার্জী, এ. এম. এ. জামান প্রমুখ ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠকরা'ও ছিলেন উল্লেখযোগ্য। এমনকি রায়পন্থীরা ও 'সাম্যরাজ পার্টি' ভুক্ত ব্যক্তিরাও কিছুদিনের জন্য হলেও লেবার পার্টির সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করে। যদিও ১৯৩২-৩৪ সময়কালে BLP-র অভ্যন্তরে দত্ত মজুমদারপন্থী কমিউনিস্ট গোষ্ঠীর সঙ্গে নরেশ সেনগুপ্ত, অতুল গুপ্ত ও জামানপন্থী অকমিউনিস্ট গোষ্ঠীর তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্ব চলেছিল, তথাপি এই সময় কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার বিভিন্ন শিল্পে

কমিউনিস্ট-প্রভাবিত BLP শ্রমিকদের সংগঠিত করার ক্ষেত্রে বঙ্গীয় প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের (BPTUC) মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।[৫৭]

কমিন্টার্নের নির্দেশানুসারে তখন কমিউনিস্ট পার্টি 'যুক্তফ্রন্টের' তত্ত্ব রূপায়ণের উদ্দেশ্যে অন্যান্য ক্ষেত্রের মতন শ্রমিক আন্দোলনেও ব্যাপক বাম ঐক্যের পন্থা অনুসরণ করেছিল এরই সূত্র ধরে লেবার পার্টির কমিউনিস্টরা ও কমিউনিস্ট পার্টি উভয়েই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, দেশে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য একটিই কমিউনিস্ট পার্টি থাকা উচিত। এই সিদ্ধান্তের আলোকে মিলনের প্রচেষ্টা উভয় দলই শুরু করে, যদিও মিলনের আগ্রহ মূলত এসেছিল লেবার পার্টির কমিউনিস্টদের তরফ থেকেই।

এই মিলন প্রচেষ্টার পরিণতি হিসাবে ১৯৩৬ সালের গোড়ার দিকে লেবার পার্টির সমস্ত কমিউনিস্ট ব্যক্তিগতভাবে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। স্থির হয় বেঙ্গল লেবার পার্টি হবে বে-আইনী কমিউনিস্ট পার্টির প্রকাশ্য মঞ্চ—নিষিদ্ধ CPI-এর সদস্যরা লেবার পার্টিকেই প্রকাশ্য রাজনৈতিক সংগঠন হিসাবে ব্যবহার করবেন। এই মিলনের ফলে লেবার পার্টির নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হন। প্রমোদ সেন ও কমল সরকার হন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির সদস্য এবং নন্দলাল বসু হন কলকাতা জেলা কমিটির সদস্য।[৫৮]

সাম্প্রতিক গবেষণায় ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে অত্যন্ত শক্তিশালী শাখা রূপে 'বেঙ্গল লেবার পার্টি'-র সঙ্গে বাঙলার কমিউনিস্টদের দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের একটি সুস্পষ্ট চিত্র উন্মোচিত হয়েছে।[৫৯] ১৯৩৪-৩৬ সালে BLP-র সঙ্গে CPI-এর মিলন দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। লেবার পার্টির কমিউনিস্টদের সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির মূল রাজনৈতিক মতাদর্শগত পার্থক্য দূরীভূত হয়নি, ঐক্যের স্বার্থে উভয়পক্ষই কিছুটা রক্ষা করেন। কিন্তু তার সঙ্গে যোগ হয় উভয়পক্ষের মধ্যে খুঁটিনাটি সাংগঠনিক বিরোধ। কমিউনিস্ট পার্টির আদি সদস্যরা অভিযোগ করতে থাকে, লেবার পার্টির কমিউনিস্টরা পার্টির মধ্যে নিজেদের গোষ্ঠী অক্ষুণ্ণ রেখে এবং উপদলীয় কার্যকলাপ চালিয়ে পার্টিকে দুর্বল করে ফেলেছেন। অপর দিকে লেবার পার্টি থেকে যে কমিউনিস্টরা কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছেন তাঁরা অভিযোগ করতে থাকেন যে তাঁরা সাংগঠনিকভাবে ও কাজের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে অবহেলিত হচ্ছেন। মূল রাজনৈতিক মতাদর্শগত পার্থক্যও এক্ষেত্রে ক্রমশ ব্যাপক আকার ধারণ করতে থাকে।

১৯৩৮ সালের নভেম্বর মাসে চন্দননগরে অনুষ্ঠিত কমিউনিস্ট পার্টির বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির দ্বিতীয় (গোপন) সম্মেলনের সময় থেকেই লেবার পার্টি গ্রুপের সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির (CPI) সদস্যদের সাংগঠনিক ও রাজনৈতিক বিরোধ ক্রমশই কিভাবে মীমাংসার অতীত হয়ে যেতে থাকে তার বিবরণ ইতোপূর্বে দেওয়া হয়েছে। ১৯৩৯ সালের মার্চ মাসে ত্রিপুরীতে অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনের পরেই একথা উভয়গ্রুপের কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়

যে বিরোধ এমন জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে যখন আর কোন মতেই একসঙ্গে চলা সম্ভবপর নয়। পরিণতিতে নীহারেন্দু দত্ত মজুমদারের নেতৃত্বাধীন সমগ্র 'লেবার পার্টি' গ্রুপটিই (নিত্যানন্দ চৌধুরী বাদে, ১৯৩৯ সালের জুলাই মাসে কমিউনিস্ট পার্টি ছেড়ে বেরিয়ে আসেন। অপরদিকে কমিউনিস্ট পার্টির ভাষ্য অনুযায়ী তাঁদের পার্টি থেকে বিতাড়িত হয় করা।[২৯ক] কমিউনিস্ট পার্টি ছেড়ে বেরিয়ে আসার পরে নীহারেন্দু দত্ত মজুমদারের নেতৃত্বাধীন লেবার পার্টি গ্রুপ, 'বলশেভিক পার্টি' নামে গোপন সংগঠন হিসাবে গড়ে ওঠে, যার প্রকাশ্য ও আইনসঙ্গত মঞ্চ ছিল পুরাতন 'বেঙ্গল লেবার পার্টি।'[৩০]

অপর যে বামপন্থী গোষ্ঠী শ্রমিক আন্দোলনে কমিউনিস্টদের সঙ্গে সাময়িকভাবে কাজ করতে শুরু করে দিল তা হল সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত 'কমিউনিস্ট লীগ অফ ইন্ডিয়া' (CLI) — যা ১৯৩৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। 'গণবাণী গ্রুপ' নামে সাধারণভাবে পরিচিত CLI-এর প্রভাব অধিক সংখ্যক শ্রমিকদের মধ্যে যথেষ্ট ছিল না। কলকাতার পূর্বপ্রান্তে ট্যাংরা ও ধাপা অঞ্চলে চর্ম ও রবার শিল্পে শ্রমিকদের মধ্যে এদের কিছু সংগঠন ছিল, এ ছাড়া জেশপ সহ কয়েকটি ইঞ্জিনিয়ারিং সংস্থায় নিজস্ব ইউনিয়ন ছিল। ১৯৩৮ সালে এদের উদ্যোগে শ্রমিকদের মধ্যে শ্রেণী-চেতনার বিস্তার ঘটানোর উদ্দেশ্যে একটি 'মজদুর কাউন্সিল' গঠিত হয়। ১৯৩৯ সালে বাটা ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন গঠন এবং একটি সফল ধর্মঘট পরিচালনায় এরা সক্ষম হয়েছিল। এই সময় প্রায় ২০টি ইউনিয়ন এই সংগঠনের অধীনস্থ ও অনুমোদিত ছিল বলে জানা যায়। BPTUC-র অভ্যন্তরে অবশ্য CLI-এর উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব ছিল না এবং CPI-BLP গোষ্ঠীও এদের খুব ভাল নজরে দেখেনি। ক্রমশ নেতৃত্বের দ্বন্দ্বও তীব্র হয়ে ওঠে।[৩১] অপর একটি বামপন্থী শ্রমিক সংগঠন 'ওয়ার্কার্স লীগ' (WL) ১৯৩৬-এর এপ্রিলে গঠিত হয়েছিল তথাকথিত 'টেরোকমিউনিস্ট'দের উদ্যোগে। প্রধানত 'ইয়ং কমিউনিস্ট লীগ' নামক একটি বিপ্লববাদী গোষ্ঠী ছিল এর পরিচালনায়। WL-এর সভাপতি ছিলেন অজিত দাশগুপ্ত। কিছুদিনের জন্য সভাপতি হন বন্দর শ্রমিক নেতা নেপাল ভট্টাচার্য। শ্রমিক নেত্রী প্রভাবতী দাশগুপ্ত WL-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকলেও পরে সংশ্রব ছিন্ন করেন। নেপাল ভট্টাচার্যের মাধ্যমে ক্যালকাটা পোর্ট ট্রাস্ট এমপ্লইজ এ্যাসোসিয়েশন এই গোষ্ঠীর দ্বারা পরিচালিত হত। এছাড়াও ইঞ্জিনিয়ারিং, মোটর ওয়ার্কার্স, মুদ্রণশিল্প ও রিক্সাচালকদের ইউনিয়নের সঙ্গে WL কিছুটা যুক্ত ছিল। যদিও এই সংগঠন আনুষ্ঠানিকভাবে AITUC-র অনুমোদিত ছিল না তথাপি ১৯৩৭-এর চটকল শ্রমিক ধর্মঘটে BPTUC-র পাশাপাশি ওয়ার্কার্স লীগও সংগঠকের ভূমিকা পালন করে।[৩২]

এছাড়া ছিল রায়পন্থীরা। একদা ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মানবেন্দ্রনাথ রায় কমিণ্টার্ন থেকে তাঁর বহিষ্কারের (১৯২৮) পর ১৯৩০-এর ডিসেম্বরে দেশে ফিরে আসেন এবং কানপুর ষড়যন্ত্র মামলায় (১৯২৪) আসামী রূপে ১৯৩১-এর

জুলাইতে গ্রেপ্তার হন। ১৯৩৬ সালের নভেম্বরে কারামুক্তির পর তিনি কংগ্রেসে যোগদান করে তাঁর অনুগামীদের নিয়ে একটি ক্ষুদ্র মার্কসবাদী গোষ্ঠী গঠন করেন। CPI ও BLP যখন শ্রমিক সংগঠনে কংগ্রেসের সাংগঠনিক অনুমোদনের দাবীতে সোচ্চার, সেই সময় রায় বিপরীত অবস্থান গ্রহণ করে শ্রমিক সংগঠনের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রক্ষার নীতি ঘোষণা করেন এবং কংগ্রেস সদস্যদের ব্যক্তিগতভাবে শ্রমিক সংগঠনে যোগদানের আহ্বান জানান। বলা বাহুল্য এই অভিমত AITUC-র কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না।[৩৩] ফলে রায়পন্থীরা 'লীগ অফ র‍্যাডিক্যাল কংগ্রেসমেন' (মে, ১৯৩৯) গঠন করে পৃথকভাবে শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করতে শুরু করে। বোম্বে ও বাংলা ছিল তাদের দুটি প্রধান ক্ষেত্র। ইতিপূর্বে ১৯৩৯-এর ফেব্রুয়ারীতে রায়পন্থীরা BPTUC-র নেতৃত্বের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করেন যে TUC নেতৃত্ব শ্রমিকদের প্রকৃত সমস্যা অপেক্ষা দলীয় রাজনীতিতেই অধিকতর আগ্রহী। তারা প্রতি শিল্পে একটি মাত্র শ্রমিক ইউনিয়নের দাবী জানায়।[৩৪] অবশ্য BPTUC সহ অপরাপর ট্রেড ইউনিয়নগুলি রায়পন্থীদের দাবীতে কর্ণপাত করেন নি। বিশেষত কমিউনিস্টদের সঙ্গে রায়ের সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত তিক্ত এবং শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রেও তার প্রতিক্রিয়া পড়েছিল।[৩৫]

তুলনামূলকভাবে বরং 'কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলের' সঙ্গে কমিউনিস্টদের মতপার্থক্য ও তিক্ততা বৃদ্ধি সত্ত্বেও BPTUC-র মাধ্যমে শ্রমিক আন্দোলনের বিস্তারের ক্ষেত্রে তারা বহুলাংশে ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচীর ভিত্তিতেই চলেছিল। হাওড়ার ফ্যাক্টরী শ্রমিকদের পক্ষ থেকে বঙ্গীয় আইনসভার নির্বাচিত CSP নেতা শিবনাথ ব্যানার্জী, হুগলী শিল্পাঞ্চলে ডাক্তার চারুচন্দ্র ব্যানার্জী এবং তাঁর পত্নী বিমলপ্রতিভা দেবী BPTUC-র নেতৃত্বরূপে কমিউনিস্টদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধভাবেই কাজ করতেন। এমনকি আইনসভায় অপর একজন শ্রমিককেন্দ্র থেকে নির্বাচিত সদস্য এ. এম. এ. জামান ঘনঘন গোষ্ঠী বদল করলেও BPTUC-র সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করেই চলতেন। ১৯৩৭-এর চটকল শ্রমিক আন্দোলনে এদের বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল।

কমিউনিস্ট শ্রমিক সংগঠন ও আন্দোলনের সম্মুখে বাধা

দ্বিতীয় ও গুরুত্বপূর্ণ যে সমস্যার সম্মুখীন AITUC-র বামপন্থী ও কমিউনিস্ট নেতৃত্বকে হতে হয়েছিল তা হল বাংলার বিশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে মুসলিম লীগের তীব্র বিরোধিতা ও শ্রমিক আন্দোলনকে সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে বিভক্ত করার ষড়যন্ত্র। ১৯৩৭ সালে অবিভক্ত বাঙলায় মুসলিম লীগ ও কৃষক প্রজা পার্টি সরকারী ক্ষমতায় আসীন হবার পর ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ক্ষেত্রে একটি নতুন মাত্রা সংযোজিত হয়েছিল—তা হল মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িক রাজনীতির সঙ্গে শ্রমিক আন্দোলনের সংযোগ। ইতিমধ্যে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের মত বাঙলাতেও বিভিন্ন শিল্পের শ্রমিকরা প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন লাভকে নিজেদের দাবী আদায়ের অনুকূল বলে মনে করে এবং ১৯৩৭ সাল থেকে অর্থনৈতিক, পেশাগত ও রাজনৈতিক নানা দাবীতে আন্দোলন-ধর্মঘট প্রভৃতি শুরু করে। ১৯৩৭-এর চটকল শ্রমিক

ধর্মঘট ছিল এক্ষেত্রে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য একটি আন্দোলন। কয়েক সপ্তাহ ধরে দুই লক্ষাধিক শ্রমিক কর্মচারী চটকল ধর্মঘটে সামিল হয়। ফলে লীগ-প্রজা পার্টির সরকারের শ্রমমন্ত্রীরূপে সুহ্‌রাবর্দী চটকল ও অন্যান্য শিল্পে ক্রমবর্দ্ধমান শ্রমবিরোধ ও শ্রমিক ধর্মঘটের ফলে বেশ কিছুটা সমস্যার মধ্যে পড়েছিলেন। যেহেতু এই সময়কার শ্রমিক ধর্মঘটগুলি প্রধানত পরিচালিত হচ্ছিল বামপন্থী কংগ্রেসী, সোশ্যালিস্ট ও কমিউনিস্টদের দ্বারা—সেই হেতু এই শ্রমবিরোধগুলিতে সরকার পক্ষের নিয়ন্ত্রণকারী ক্ষমতা ছিল গৌণ। ফলে ক্রমশই মুসলিম লীগের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে শ্রমিক সংগঠন গড়ে তোলা ও তার মাধ্যমে বাঙলার শ্রমিক কর্মচারীদের (বিশেষত মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত শ্রমিকদের) উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার বিষয়টি সুহ্‌রাবর্দীর উদ্যোগে লীগের মধ্যে গুরুত্ব পেয়েছিল। মুসলিম লীগের পৃষ্ঠপোষকতায় সরকার সমর্থক ট্রেড ইউনিয়ন ইতিমধ্যে সক্রিয় হয়েছিল 'সমুদ্র পথ' ও নাবিক সংগঠনে (Mariners' Organisation)। লীগপন্থী মুসলমান ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা এই সময় থেকে অন্যান্য শিল্পেও আধিপত্য বিস্তারের কাজ শুরু করে। বিশেষ করে কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বন্দর শ্রমিক, চটকল শ্রমিক এবং অন্যত্র যেখানে মুসলিম শ্রমিকরা সংখ্যায় অধিক সেই সকল শিল্পাঞ্চলে লীগপন্থী ট্রেড ইউনিয়ন সমূহ প্রশাসন এবং সুহ্‌রাবর্দীর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে গড়ে উঠতে থাকে। এইভাবে সরকারপন্থী 'বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অফ লেবার' (BNCL) সক্রিয় হয়ে ওঠে— যার সাধারণ সম্পাদক ছিলেন শাফতুল্লাহ খান এবং সাংগঠনিক সম্পাদক ছিলেন আবু তালেব। শ্রমমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত থেকেও সুহ্‌রাবর্দী BNCL সম্পর্কে শুধু উৎসাহই প্রদর্শন করেন নি অর্থনৈতিক সাহায্যও এই সংগঠন চালানোর জন্য তিনি করে যেতেন।[৮]

AITUC এবং বামপন্থীদের দ্বারা পরিচালিত অন্যান্য শ্রমিক ইউনিয়ন এবং আন্দোলনগুলি সম্পর্কে সুহ্‌রাবর্দী ও লীগ সরকারের দু-ধরণের দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পেত। ১৯৩৭ থেকে BPTUC পরিচালিত শ্রমিক ধর্মঘট ও আন্দোলনগুলি সম্পর্কে সরকারী দৃষ্টিভঙ্গি ছিল যে এগুলি মূলত কমিউনিস্ট ও কংগ্রেসের ষড়যন্ত্র। এরা শ্রমিকদের নিজস্ব অর্থনৈতিক দাবী-দাওয়ার বিষয়টিও গুরুত্ব না দিয়ে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যকেই অধিক গুরুত্ব দিচ্ছে এবং লীগ সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে শ্রমিকশ্রেণীকে বিক্ষুব্ধ করে তুলছে। এই কারণে সুহ্‌রাবর্দী যে দুটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেন তা ছিল—প্রথমত, যাতে কারখানা কর্তৃপক্ষ এবং শ্রমিকদের মধ্যে কোনো বিরোধ বা দ্বন্দ্ব সৃষ্টি না হয় সে বিষয়ে প্রচেষ্টা চালান এবং দ্বিতীয়ত, এমন কিছু বশংবদ ও অনুগত ট্রেড ইউনিয়নকে স্বীকৃতি দেওয়া বা শ্রমিকদের প্রতিনিধি গ্রহণ করা যারা সরকারের প্রতি মিত্রভাবাপন্ন হবে। এইভাবে লীগ সরকার সুহ্‌রাবর্দীর নেতৃত্বে বামপন্থীদের প্রভাব ট্রেড ইউনিয়ন পরিচালনার ক্ষেত্রে নষ্ট করতে তৎপর হয়েছিল। এই সময় শ্রমিকদের উদ্দেশ্য করে সুহ্‌রাবর্দীর পরামর্শ বা সতর্কবাণী ছিল এই রকম : *"...to establish genuine trade union organisations that will concern themselves only with labour disputes*

and problems, that will look after the welfare of the labour members and see that they get benefits of such acts as the Workmen's Compensation Act or the Payment of Wages Act, and which will lead labour along the constitutional paths, deverted of any revolutionary mentality or slogan."[৩৭]

সুহ্‌রাবর্দীর অভিযোগ ছিল যে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের নামে কমিউনিস্টরা শ্রেণী-ঘৃণা ও শ্রেণী-সংঘাতের পরিবেশ সৃষ্টি করে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটাচ্ছে। তিনি এই জাতীয় কর্মকাণ্ডকে প্রকৃত শ্রমিক আন্দোলন বলে স্বীকার করেননি। এই প্রসঙ্গে সুহ্‌রাবর্দীর বক্তব্য ছিল : *'I do not consider the so called trade unions at all, I would welcome the flag of the labour whether it is red, white or blue, so long as it is the flag of genuine labour movement (and) its sponsors enter the field as responsible labour leaders and not as politicians exploiting labour for personal, political and revolutionary motives."*[৩৮]

'প্রকৃত' বা 'Genuine' ট্রেড ইউনিয়ন কার্যধারা বলতে সুহ্‌রাবর্দীরা বোঝাতেন শ্রমিকদের পরিচ্ছন্নতাবোধ ও শৃঙ্খলাপরায়ণতা বৃদ্ধি, তাদের সন্তানদের শিক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা, গ্রন্থাগার পরিষেবা ও সমবায়ের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি, বীমা প্রকল্প চালু ও অন্যান্য আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা সংক্রান্ত বিষয়াবলীকে। অর্থাৎ শ্রমিক আন্দোলনের প্রধান জঙ্গী পদ্ধতিগুলি যথা, বিক্ষোভ-সমাবেশ, মিছিল, ধর্ণা, ধর্মঘট প্রভৃতি লীগ সরকারের শ্রমমন্ত্রকের কাছে পরিত্যাজ্য ছিল—কারণ তা বিপ্লবী মতাদর্শ প্রচারের সহায়ক। এই নীতির দ্বারা পরিচালিত হয়ে যে সকল শ্রমিক ইউনিয়ন শেষোক্ত কর্মপন্থা গ্রহণ করত তাদের 'রেড ফ্ল্যাগ ইউনিয়ন' রূপে সরকারের পক্ষ থেকে চিহ্নিত করা হয়েছিল এবং সরকারের অনুগত ও সুহ্‌রাবর্দীর প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত শ্রমিক ইউনিয়নগুলি 'হোয়াইট ফ্ল্যাগ ইউনিয়ন' নামে পরিচিত হত। এর ফলে দেখা গেছে যে ১৯৩৯ সালে ট্রেড ইউনিয়ন কন্‌স্টিটিউশন ট্রাইবুনালে ৬১টি শ্রমিক ইউনিয়ন অনুমোদনলাভে আবেদন করলেও মাত্র ২৭টিকে অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল।[৩৯]

সুহ্‌রাবর্দী তথা লীগ মন্ত্রিসভা তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন 'শ্বেত ইউনিয়ন'গুলির মাধ্যমে এবং মুসলিম লীগের রক্ষণশীল ও ধর্মান্ধ সংগঠকদের সাহায্যে অপর যে পদ্ধতি বামপন্থী প্রভাবিত শ্রমিক ইউনিয়নগুলির প্রভাব খর্ব করার জন্য গ্রহণ করেছিল তা হল শ্রমিকদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি। এটা সত্য যে সুহ্‌রাবর্দী নিজে কখনও প্রকাশ্য সভায় শ্রমিকদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক প্রচারমূলক বক্তব্য রাখেন নি। বরং কখনও কখনও তিনি শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার উপর গুরুত্বই দিয়েছিলেন।[৪০] দেখা গেছে BNCL-এর অনেক কর্মকর্তাই ছিলেন জন্মসূত্রে হিন্দু যেমন রিষড়ার রামমোহন উপাধ্যায়। কিন্তু বাস্তবে

মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে শ্রমিক ইউনিয়নগুলি ও আন্দোলনে বিভেদ সৃষ্টির প্রচেষ্টা ঐ সময়কালে অব্যাহত ছিল। যেমন চটকল, ইলেকট্রিক সাপ্লাই বা বন্দর শ্রমিক যাদের অধিকাংশই ছিল মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত, তাদের IPTUC প্রভৃতির মূল ধারার ইউনিয়ন থেকে পৃথক করে শুধুমাত্র মুসলমান শ্রমিকদের নিয়ে পৃথক ইউনিয়ন গঠনের প্রক্রিয়া এই সময় শুরু হয়। এইভাবেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল লীগ প্রভাবিত 'বেঙ্গল ন্যাশনাল জুট ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন'—যার সম্পাদক ছিলেন মহম্মদ শাফাতুল্লাহ খান। ১৯৩৮ সালের আগস্টে হক-লীগ মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে আনীত অনাস্থা প্রস্তাব আলোচনাকালে শ্রমমন্ত্রী সুহ্‌রাবর্দীর বিরুদ্ধেই সব থেকে অধিক অভিযোগ উত্থাপিত হয় কংগ্রেস ও বামপন্থীদের পক্ষ থেকে। এই অভিযোগগুলিতে বলা হয়, ১) সুহ্‌রাবর্দী ট্রেড ইউনিয়ন ফান্ডের অপপ্রয়োগ ঘটিয়ে নিজস্ব এজেন্টদের মাধ্যমে বিরোধী ট্রেড ইউনিয়নগুলিতে (Commualisation of Trade Unions) যে কিভাবে সাম্প্রদায়িকতার প্রসার ঘটিয়েছিলেন তা বোঝা যায় মাত্র দুই বছরের মধ্যে সদ্য প্রতিষ্ঠিত 'বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অফ লেবরস্'-এর প্রতিপত্তি বৃদ্ধিতে যারা AITUC-র মতন একটি ব্যাপক ভিত্তিক, সুসংগঠিত প্রাচীন শ্রমিক সংস্থার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে বাঙলায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে নিতে সক্ষম হয়েছিল।

এর আর একটি প্রমাণ পাওয়া যায় ১৯৩৮ সালের ৮ আগস্ট যখন বঙ্গীয় আইনসভায় হক-লীগ মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে কংগ্রেস আনীত অনাস্থা প্রস্তাব আলোচিত হচ্ছে, সেদিন হা... হুগলী, গার্ডেনরীচ, খিদিরপুর, মেটিয়াবুরুজ, টিটাগড়, খড়দা, কামারহাটি এবং বিষড়া (এখানে কংগ্রেস বিধায়ক শ্রমিক নেতা এ. এম. এ. জামানের প্রভাব ছিল) প্রভৃতি অঞ্চলের হাজার হাজার মুসলিম চটকল ও অন্যান্য শ্রমিক ব্যারাকপুর, শ্রীরামপুর এবং বজবজের নানা কারখানার মুসলমান শ্রমিকদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধভাবে লীগ সরকারের সমর্থনে ধর্মঘট ও হরতাল করে এবং কলকাতায় লক্ষাধিক মানুষের বিক্ষোভ সমাবেশে অংশ নেয়। এই শ্রমিকদের একটা বড় অংশের মধ্যে এই প্রচার ছিল এবং তারা অনেকেই বিশ্বাস করত যে লীগ সরকারের বিরুদ্ধে কংগ্রেসসহ বিরোধীদের অনাস্থা প্রস্তাব আসলে প্রত্যক্ষভাবে ইসলামের ওপর আঘাত।[৪১] বাঙলার শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার এই প্রসার বিস্তার নিঃসন্দেহে কমিউনিস্টদের শ্রেণী-রাজনীতি ও শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্যরক্ষার মূলে আঘাত করেছিল। কমিউনিস্ট মুখপত্র *গণশক্তিতে* লীগ সরকারের সমর্থনে ওই গণ সমাবেশের উপর অত্যন্ত গুরুত্ব প্রদান করে কংগ্রেস নেতৃত্বের ব্যর্থতা ও নেতিবাচক ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করা হয়।[৪২]

অপর যে সমস্যাটি অবিভক্ত বাঙলার শ্রমিক আন্দোলনে BPTUC-র নেতৃত্ব বিশেষ করে কমিউনিস্টদের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়রূপে উপস্থিত হয়, তা হল ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন ও শ্রমিকশ্রেণীর রাজনীতিকে জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করা ও তাদের মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণ। ১৯৩৭-এর নির্বাচনের পর যখন ১১টি প্রদেশের মধ্যে ৭টিতে (পরে আরো ২টি) জাতীয় কংগ্রেস মন্ত্রিসভা ও সরকার গঠন করেছিল তখন থেকেই বিতর্কের সূত্রপাত। কংগ্রেসের

পক্ষে শ্রমিক কল্যাণের যে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় তা রক্ষা করতে নেতৃত্বের পক্ষে তেমন উদ্যোগ দেখা যায়নি। ১৯৩৮ সালের শেষে যখন জওহরলাল নেহরু সহ বামপন্থী কংগ্রেসের নেতৃত্বের একাশের উৎসাহে জাতীয় কংগ্রেস শ্রমিক কল্যাণমূলক কর্মসূচী রূপায়ণের উদ্যোগ গ্রহণ করে তখন তা বিশেষ ফলবতী হয়নি। কারণ কংগ্রেসের পরিচালনাধীন সকল মন্ত্রিসভাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৩৯-এর শেষে পদত্যাগ করে।

বস্তুত নেহেরু ছাড়া কংগ্রেসের উচ্চস্তরের আব কোন নেতারই নৈতিক সমর্থন ট্রেড ইউনিয়ন সংক্রান্ত ক্ষেত্রে বামপন্থী শ্রমিক নেতাবা পায়নি। কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতৃত্ব কৃষক বা শ্রমিক আন্দোলনের মত শ্রেণী-রাজনীতির ছিলেন ঘোরতর বিরোধী। এমনকি তারা কৃষকসভার ও AITUC-র মতন প্রতিষ্ঠানের গোষ্ঠীগতভাবে কংগ্রেসের প্রবেশেরও (Collective Affiliation) চরম বিরোধী ছিল। কার্যত কংগ্রেসের এই রক্ষণশীল নেতৃত্বের দৃষ্টিভঙ্গীর ফলেই দেশের কৃষক ও শ্রমিক বিক্ষোভ বা শ্রেণী আন্দোলনগুলিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী পথে পরিচালিত করা সেভাবে যায়নি। প্রকৃতপক্ষে এক্ষেত্রে তাদের যথেষ্ট আতঙ্কই ছিল। এই (আতঙ্ক কমিউনিস্ট প্রভাব বিস্তারের এবং ক্ষমতা হস্তচ্যুত হওয়ার) জন্য সুভাষচন্দ্র বসু ছাড়া উচ্চপর্যায়ের আর কোনো কংগ্রেস নেতাই শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে নিজেদের প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত করেননি। গান্ধীজি স্বয়ং শ্রমিক-মালিকের সংঘাতের ছিলেন তীব্র বিরোধী এবং তিনি 'গান্ধী সেবা সংঘ' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শ্রমিকশ্রেণীকে জঙ্গী আন্দোলন পরিত্যাগ করে গঠনমূলক ও উন্নয়নমূলক কাজে লিপ্ত হতে পরামর্শ দেন।[৪৩]

১৯৩৯-এর মার্চ থেকে যখন CPI ও CSP-র ভাঙ্গন একপ্রকার অনিবার্য এবং AITUC প্রায় সম্পূর্ণত পরিচালিত হচ্ছে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে, তখন কংগ্রেসের একটি অংশের পক্ষ থেকে 'হিন্দুস্থান মজদুর সংঘ' নামক একটি শ্রমিক সংস্থা স্বতন্ত্রভাবে কাজ শুরু করে। কিন্তু সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে তার প্রভাব ছিল খুব কম। বিশেষত বাঙলায় এর কোনো অস্তিত্ব ছিল না।

১৯৩০-এর দশকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলায় গান্ধীবাদীদের দ্বারা (অভয় আশ্রম গ্রুপ) যে সংস্থাটি শ্রমিকদের মধ্যে জাতীয়তাবাদ ও দেশপ্রেমের সঞ্চারে কিছুটা গঠনমূলক ভূমিকা ১৯৩৩-৩৪ সাল থেকে গ্রহণ করে আসছিল তা হল বেঙ্গল লেবার এ্যাসোসিয়েশন (BLA)। ড. সুরেশচন্দ্র ব্যানার্জী, প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ ছিলেন এর নেতৃত্বে। কিন্তু এই গোষ্ঠীর সঙ্গে আমেদাবাদের 'গান্ধী সেবা সংঘ' বা 'হিন্দু মজদুর সংঘে'র কোনো সম্পর্কই ছিল না। মূলত, AITUC-র মাধ্যমেই এরা কাজ করত। এমনকি BLA-এর কোনো কোনো গুরুত্বপূর্ণ নেতা পরবর্তীকালে কমিউনিস্ট পার্টিতেও যোগদান করেন—যেমন নৃপেন চক্রবর্তী।[৪৪]

যাই হোক সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে যদিও বোম্বাই প্রদেশ ব্যতীত কংগ্রেসের এক বড় অংশের নেতৃত্ব (মূলত দক্ষিণপন্থী) যদিও মনে করতেন যে সংগঠিত শ্রমিক-কৃষকশ্রেণীর আন্দোলন

এবং রাজনীতি ব্রিটিশ-বিরোধী বৃহত্তর জাতীয় ঐক্যকে খর্ব করবে, তথাপি বাঙলা প্রদেশে দেখা যায় বামপন্থী প্রভাবিত BPTUC-র দ্বারা সংগঠিত বিভিন্ন শিল্পের শ্রমিক ধর্মঘটগুলির প্রতি বাঙলার কংগ্রেস নেতৃত্ব যথা শরৎচন্দ্র বসু, সুভাষচন্দ্র প্রমুখ যথেষ্ট সহানুভূতি ও সমর্থন প্রদর্শন করেছেন। অবশ্য এর পশ্চাতে বাঙলায় মুসলিম লীগ সরকারের বিরোধিতার নীতিটিও অন্যতম কারণরূপে কেউ কেউ মনে করেন।[১৪] তবে নানাবিধ সমস্যা ও বাধার সম্মুখীন হয়েও বাঙলায় ১৯৩৭-৩৯ কালপর্বে চটকল, বস্ত্র শিল্প, পরিবহনশিল্প এবং অন্যান্য শিল্প ক্ষেত্রে শ্রমিক আন্দোলনের যে জোয়ার সৃষ্টি হয়েছিল—তার অন্যতম চালিকাশক্তি ছিল বামপন্থী ও কমিউনিস্টরা[১৫] এবং বহু ক্ষেত্রেই তা সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয় আন্দোলনের নানা বিন্দুকে বহুমাত্রিকতায় স্পর্শ করতে সক্ষম হয়েছিল।

বিভিন্ন শিল্পক্ষেত্রে শ্রমিক আন্দোলনে কমিউনিস্ট দের অবস্থান ঃ

১. চটকল শ্রমিক আন্দোলন ও ধর্মঘট

বাঙলায় সংগঠিত শ্রমিকদের বড় ক্ষেত্রটি ছিল চটকল শিল্প। মূলত গঙ্গা বা হুগলী নদীর দুই পারে ২৪ পরগণা ও হুগলী জেলার ৬০ মাইল দীর্ঘ এবং প্রায় ৩ মাইল চওড়া একটি ঘন সন্নিবিষ্ট অঞ্চলে ৩ লক্ষ চটকল মজদুর বসবাস করত। এদের অধিকাংশই বিহার বা যুক্ত প্রদেশ থেকে আগত হিন্দু ভাষাভাষী শ্রমিক। দেশের গ্রামীণ কৃষি কাঠামোর সঙ্গে এদের সম্পর্ক ছিল অচ্ছেদ্য। উত্তর ভারতের কংগ্রেসী রাজনীতির প্রভাব এদের ওপর যথেষ্টই ছিল। তা সত্ত্বেও বাঙলার কমিউনিস্ট তথা বামপন্থী রাজনীতির প্রভাবও চটকল শ্রমিকদের উপর ভালোরকমই ছিল। কারণ 'লালঝাণ্ডার ইউনিয়ন' যে তাদের রুটিরুজির ও অর্থনৈতিক সংগ্রামের প্রধান সহায়ক শক্তি এই বোধ তাদের মধ্যে ১৯২৯ সালে চটকল শ্রমিকদের প্রথম সাধারণ ধর্মঘটের সময় থেকেই গড়ে উঠেছিল। তা ছাড়া কমিউনিস্টরা ৩০-এর দশকের দ্বিতীয়ার্ধে জাতীয় কংগ্রেসের অভ্যন্তরে সক্রিয় থাকায় এবং AITUC-তে কংগ্রেস-কমিউনিস্ট-সোশালিস্ট সকল রাজনৈতিক মতাদর্শের অংশীদারিত্ব থাকার ফলে চটকল শ্রমিক ধর্মঘটে CPI-র নেতৃত্বে চটকল শ্রমিকরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে দ্বিধা করেনি।

১৯২৯ সালের চটকল ধর্মঘটে একটি পরিসংখ্যান অনুযায়ী সর্বমোট ৩,১৩,০৬৯ ধর্মঘটী শ্রমিক অংশ নিয়েছিলেন এবং শ্রমদিবস নষ্টের সংখ্যা ছিল ৩৩,৪৫,০৬৭। সেই হিসাবে ৮ বছর পর ১৯৩৭ সালের ধর্মঘটে ৩,৫৪,২০০ জন শ্রমিক অংশ নেয় এবং মোট শ্রম দিবস নষ্টের সংখ্যা ছিল ৪৯,৪৫,০০০। এর মধ্যবর্তী বছরগুলিতে বিচ্ছিন্নভাবে ছোটখাটো শ্রমিক বিক্ষোভ ও ধর্মঘটের ঘটনা অব্যাহত ছিল। ১৯৩৭ সালে ১লা ফেব্রুয়ারী প্রথম ধর্মঘট শুরু হয় ৪০০০ শ্রমিকের কারখানা ফোর্ট উইলিয়াম জুটমিলে। ফেব্রুয়ারীর প্রথম সপ্তাহেই হাওড়ায় তিনটি জুটমিলে ধর্মঘট ছড়িয়ে পড়ে। মার্চের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে বজবজ এলাকার ৫টি মিলে এবং মার্চের মধ্যবর্তী সময় হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া মহকুমার মিলগুলিতে ধর্মঘট বিস্তারলাভ করে।

পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষের ঘটনাও ঘটে। এপ্রিল মাসের প্রথম দিকে 'অল বেঙ্গল সেন্ট্রাল জুট স্ট্রাইক কমিটি' গঠিত না হওয়া পর্যন্ত এই ক্রম প্রসারিত চটকল শ্রমিক ধর্মঘটগুলির মধ্যে সংগঠিত সমন্বয় প্রয়াস সেভাবে গড়ে ওঠেনি। এপ্রিল মাস থেকে ২৪ পরগণার ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চল সহ হুগলী জেলার চটকলগুলিতে এই ধর্মঘট প্রসারিত হয়। ১৯৩৭-এর ফেব্রুয়ারী থেকে এপ্রিল এই তিনমাসের ধর্মঘটে সামিল হয়েছিল প্রায় ২,২৫০০০ শ্রমিক।[৪৭]

এভাবে ক্রমশ চটকল শ্রমিকদের এই ঐতিহাসিক ধর্মঘটে কমিউনিস্ট ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী ও সংগঠকরাই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে থাকে।[৪৮] এর আর একটি প্রধান ইতিবাচক দিক ছিল জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে এই শ্রমিক ধর্মঘটের যোগসূত্র স্থাপন। যেমন ৬ এপ্রিল (১৯৩৭) শ্রদ্ধানন্দ পার্কে সদ্য কারামুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুকে জাতীয় সংবর্ধনা জানাবার পর বঙ্কিম মুখার্জী, নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার, শিবনাথ ব্যানার্জী (তিনজনেই আইনসভার সদস্য) এবং সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুধীন প্রামাণিক, রজনী মুখার্জী প্রমুখ শ্রমিক নেতাদের নেতৃত্বে ধর্মঘটী শ্রমিকরা প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হকের বাসভবনে গিয়ে দেখা করার চেষ্টা করে পুলিসের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হন এবং রাত পর্যন্ত পার্কেই অবস্থান করতে থাকেন। যতক্ষণ না পর্যন্ত ফজলুল হক শ্রমিক সমাবেশ উপস্থিত হয়ে চটকল ধর্মঘটের সাধারণ বিষয়ে কোনো প্রতিশ্রুতি না দিয়েছেন, ততক্ষণ তারা অবস্থান চলিয়েছিলেন। ফজলুল হক অবশেষে শ্রমিকদের দাবী অনুযায়ী সমাবেশে বক্তব্য রাখেন এবং তাঁর সঙ্গে আলোচনা করার জন্য প্রতিনিধি দল নির্বাচিত করার প্রস্তাব রাখেন।[৪৯]

বঙ্গীয় আইনসভায় ৮ এপ্রিল চটকল ধর্মঘট সম্পর্কিত একটি মুলতুবি প্রস্তাব উত্থাপনের চেষ্টা করে তা ব্যর্থ হলেও বিরোধীরা ঐক্যবদ্ধভাবে শ্রমিক নেতাদের ওপর সরকারী নিষেধাজ্ঞা ও দমননীতির তীব্র সমালোচনা করে। ৯ই এপ্রিল এবং ১২ এপ্রিল শ্রমিক নেতৃত্ব (কমিউনিস্টসহ যাঁরা ছিলেন সকলেই বামপন্থী) শ্রমমন্ত্রী ও পরে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে দাবীসনদ পেশ করেন ও বিরোধের মীমাংসা দাবী করেন। সরকার পক্ষ তাদের জানিয়ে দেয় যে—প্রথমত, শ্রমিকরা বিনাশর্তে কাজে যোগ দিলে পরে সবকার তাদের দাবী পূরণে সচেষ্ট হবেন, দ্বিতীয়ত চটকল মালিক সমিতির বক্তব্য অনুসারে শ্রমিকরা কাজে যোগদানের পরেই কেবলমাত্র তাদের দাবী-দাওয়া সম্পর্কে মালিকপক্ষ উদ্যোগ নেবে। এছাড়া আরো কিছু শর্ত ছিল যা মেনে নেওয়া ধর্মঘটী শ্রমিক নেতাদের পক্ষে সম্ভবপর না হওয়ায় ধর্মঘট অব্যাহত থাকে।[৫০]

এই পর্যায়ে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি ও সর্বভারতীয় কংগ্রেস নেতৃত্ব 'রিলিফ কমিটি' গঠনের মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে ধর্মঘটী শ্রমিকদেব সমর্থনে এগিয়ে আসতে বাধ্য হয়। সুভাষচন্দ্র ও জওহরলাল নেহরু বিবৃতি দেন। ছাত্র ফেডারেশনের পক্ষ থেকে ত্রাণ তহবিল গঠন করা হয়। মাদ্রাজের কংগ্রেস কমিটির পক্ষ থেকেও সহায়তা ও সমর্থন আসে। এমনকি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও এক প্রেস বিবৃতিতে ধর্মঘটী শ্রমিকদের আন্দোলনকে পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করেন। রবীন্দ্রনাথের বিবৃতির এই অংশটি ছিল গভীর তাৎপর্যপূর্ণ ঃ

"যারা সমাজের বোঝা বয়, সমাজ তাদের প্রতিপালন করবে এটাই মানবিকতার দাবী। ধর্মঘটকে সাম্প্রদায়িকতার দিকে ঘুরিয়ে দেবার জন্য কুৎসিত সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টিকে প্রতিটি ন্যায়-পরায়ণ লোকেরই নিন্দা করা উচিত।"[৫১]

প্রকৃতপক্ষে প্রায় তিনমাস ধরে চলা এই ধর্মঘট ভাঙ্গার জন্য চটকল মালিকদের (এরা অধিকাংশই ছিলেন ব্রিটিশ ও ইউরোপীয়) সংগঠন 'ইন্ডিয়ান জুট মিল অ্যাসোসিয়েশন (IJMA) এবং শ্রমমন্ত্রী সুহ্‌রাবর্দীর উদ্যোগে যৌথ প্রচেষ্টা নানাভাবে চালানো হয়। একদিকে যেমন এই আন্দোলনকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিতরূপে চিহ্নিত করা হয়েছিল, তেমনি অপর দিকে মুসলিম লীগ শ্রমিকদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়িয়ে দিতে সক্রিয় হয়। এর বিরুদ্ধে বাঙলায় অসংখ্য সভা-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য দুটি ছিল ২১ এপ্রিল কলকাতার প্রাক্তন মেয়র সন্তোষ কুমার বসু এবং ৩০ এপ্রিল শরৎচন্দ্র বসুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত দুটি সর্বদলীয় নাগরিক সভা। প্রথম সভাটিতে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কমিউনিস্ট নেতা মুজফ্‌ফর আহমেদ, নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার, ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, সুধীন প্রামাণিক এবং সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ।[৫২] দ্বিতীয় সভাটিতে বক্তব্য রাখেন উত্তর প্রদেশের সুপরিচিত কংগ্রেস নেতা পুরুষোত্তম দাস ট্যান্ডন প্রমুখ।[৫৩]

এপ্রিলের শেষ দিকে ও মে মাসের প্রথমে বাঙলার এই ঐতিহাসিক শ্রমিক ধর্মঘট— যাতে সরকারী হিসেবেই ২,২৫,০০০ শ্রমিক অংশ নিয়েছে তা জাতীয় আন্দোলনের অন্যতম ইস্যুতে পরিণত হয়। ২৬ এপ্রিল (১৯৩৭) এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে চটকল শ্রমিকদের ধর্মঘটকে সমর্থন জানিয়ে সরকারী দমন পীড়নের ও পুলিশী নির্যাতনের তীব্র নিন্দা করা হয়।[৫৪] অবশ্য দেশের অন্যান্য প্রদেশে কংগ্রেস সরকারগুলি শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনগুলি যে নির্মমভাবে দমন করে চলেছিল সে বিষয়ে অবশ্য এই বৈঠকে নীরবতাই অবলম্বন করা হয়েছিল। যাহোক ৩মে কলকাতার টাউন হলে প্রদেশ কংগ্রেস ও AITUC-র যৌথসভায় প্রধান বক্তার ভাষণে জওহরলাল নেহরু এই শ্রমিক আন্দোলনকে স্বাধীনতা সংগ্রামেরই গুরুত্বপূর্ণ অংশ রূপে উল্লেখ করেন।[৫৫] এর দু'দিন পর অবশেষে গান্ধীজিও তাঁর দীর্ঘ নীরবতা ভেঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে ধর্মঘটকে সমর্থন না জানালেও মালিক পক্ষ যেভাবে ধর্মঘট ভাঙ্গার জন্য তাঁর নাম ব্যবহার করেছে তার তীব্র নিন্দা ও বিরোধিতা করেছিলেন।[৫৬]

অবশেষে ধর্মঘটী চটকল শ্রমিকদের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে ফজলুল হকের আলোচনা কিছুটা ফলপ্রসূ হয়। শ্রমিকদের দাবী-দাওয়ার অধিকাংশই আপাতভাবে অপূর্ণ থাকলেও সরকার ও মালিক সংগঠন (IJMA) চটকল শ্রমিকদের অভাব অভিযোগের যথার্থতা পরোক্ষে স্বীকার করে নিতে ও পরবর্তী পর্যায়ে আলোচনা অব্যাহত রাখার প্রতিশ্রুতি প্রদানে বাধ্য হয়েছিল। ৭মে বাঙলা সরকারের প্রাধনমন্ত্রীরূপে ফজলুল হক এক বিবৃতিতে ঘোষণা করেন যে, *"শ্রমিকদের অভিযোগগুলির অনেকগুলিকেই সঠিক বলে ধরে নেওয়া যায় এবং এই সব*

অভিযোগের সমাধান কল্পে সরকারের সদিচ্ছার অভাব নেই।"[২৭] এছাড়া এই বিবৃতিতে ধর্মঘটী শ্রমিকদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক কোনও ব্যবস্থা গৃহীত হবে না বলেও জানানো হয়েছিল।

যাহোক ফজলুল হকের বিবৃতি বিবেচনা করে 'সারা বাংলা কেন্দ্রীয় ধর্মঘট কমিটি' ১০মে ধর্মঘট তুলে নেবার আহ্বান জানিয়ে বিবৃতি প্রচার করে, দীর্ঘস্থায়ী চটকল শ্রমিক ধর্মঘট সম্পর্কে বাঙলার প্রধানমন্ত্রী এ.কে. ফজলুল হক-এর ৭ মে র বিবৃতি যত্নের সঙ্গে বিবেচনা করে 'সারা বাঙলা চটকল শ্রমিক ধর্মঘট কমিটি' এই অভিমত পোষণ করে যে, শ্রমমন্ত্রীর সম্মতিক্রমে এবং মালিকদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি ভিত্তিতে নীচের শর্তগুলি প্রস্তুত হয়েছে : ১) ধর্মঘট বা ট্রেড ইউনিয়নের কার্যকলাপের জন্য কোনো শাস্তি দেওয়া হবে না। ২) শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়নের স্বীকৃতি। ৩) ধর্মঘট থেকে উদ্ভূত মামলাগুলি সম্পর্কে নমনীয় নীতি গ্রহণ করা হবে। ৪) শ্রমিকদের মজুরি আর সর্দার ও ওভারসিয়ার নিয়োগ ও ছাঁটাই প্রশ্নে যে ক্ষমতার অপব্যবহার হয় বলে চটকল শ্রমিকরা অভিযোগ করে থাকে সেই সম্পর্কে শ্রমিকদের পক্ষে সন্তোষজনক বিস্তৃত তদন্ত হবে এবং ৫) মুখ্যমন্ত্রীর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রমিক নেতাদের উপর থেকে ১৪৪ ধারা অনুসারে আরোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হবে। কেন্দ্রীয় ধর্মঘট কমিটি এই পরিস্থিতিতে ধর্মঘট তুলে নেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ও শ্রমিকদের ১০মে, ১৯৩৭ থেকে কাজে যোগ দেবার আদেশ দিয়েছে।[২৮]

১৯৩৭ সালের চটকল ধর্মঘট এইভাবে 'শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ যুক্ত ইউনিয়ন' বঙ্গীয় চটকল মজদুর ইউনিয়নের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করল। এই ইউনিয়নই পরবর্তীকালে উন্নত বেতন ও কাজের অবস্থার জন্য আন্দোলনে গৌরবজনক ভূমিকা পালন করেছিল। ১৯৩৭ সালের চটকল ধর্মঘট সম্পর্কে এক মন্তব্য অমৃতবাজার পত্রিকা লিখেছিলো *"শ্রমিকরা প্রতিদিনই তাদের অবস্থা ও অধিকার সম্পর্কে অধিকতর সচেতন হচ্ছে।"*[২৯]

কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বিভাগও "ভারতে সাম্প্রতিক কমিউনিস্ট কার্যকলাপ" সম্পর্কিত পর্যালোচনায় বাঙলার চটকল শ্রমিকদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা ও কমিউনিস্টদের ক্রমবর্দ্ধমান প্রভাবের কথা স্বীকার করেছিল। ১৯৩৭ সালের চটকল সম্পর্কিত বিবরণে বলা হয় : "ছয় সপ্তাহ স্থায়ী ১,৭০,০০০ চটকল শ্রমিকের ধর্মঘট সৃষ্টিতে শুধু কমিউনিস্ট উত্তেজনাকারীরা ক্ষমতা ও কৌশলই দেখায়নি। ধর্মঘটের নতুন কৌশল ও উপায় প্রদর্শন করেছে। শ্রমিকদের হাতে ছেড়ে দিলে তারা দাবী পূরণে অন্য পথ গ্রহণ করত। গুরুত্বপূর্ণপদে অবস্থিতদের জোর দেওয়া হয়েছিল যাতে তারা কাজে যোগ না দিলে সমগ্র কারখানা অচল হয়ে যায়। সমগ্র শিল্পাঞ্চলে কমিউনিস্ট সংগঠকদের এজেন্ট ও ঘাঁটি আছে। শ্রমিকদের মধ্যে এইভাবেই এক সাধারণ অসন্তোষ ও আত্মস্বার্থ সম্বন্ধে ধারণা জেগে উঠেছে।"[৩০]

চটকল শ্রমিক-আন্দোলনকে কেন্দ্র করে তৎকালীন বৃটিশ প্রশাসন কমিউনিস্টদের প্রভাব বৃদ্ধি সম্পর্কে যে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ও আতঙ্কিত হয়েছিল তার বিবরণ পাওয়া যায় ১৯৩৭ সালে

বিভিন্ন মাসে স্বরাষ্ট্র বিভাগের পাক্ষিক গোপন রিপোর্টগুলির (Fortnightly Report) মধ্যে। ১৯৩৭-এর অক্টোবরে বিভাগীয় কমিশনারদের দার্জিলিং-এ অনুষ্ঠিত সভার প্রতিবেদনেও দেখা গেছে যে হকলীগ সরকার এবং বৃটিশ কর্তৃপক্ষ শিল্পাঞ্চলে কমিউনিস্টদের 'বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি' সম্পর্কে হুশিয়ারী দিচ্ছেন। ইতিমধ্যে উক্ত বছরের ফেব্রুয়ারী মাস থেকেই বাঙলায় কমিউনিস্ট তৎপরতা' (Communist Activity and Action) সম্পর্কিত একটি নতুন গোপন ফাইল ব্রিটিশ প্রশাসন শুরু করে। এই সময় L. H. Colson, R. N. Reid, H. J. Twynam, G. P. Hoog. J. Anderson,J. R. Blair এবং M. J. Carritt প্রভৃতি উচ্চপদস্থ বৃটিশ সরকারী ও পুলিস অফিসারদের মধ্যে যে যে গোপন নোট চালাচালি হত তা এই ফাইলে লিপিবদ্ধ আছে। তা থেকে দেখা যায় যে ৯ ফেব্রুয়ারী তার নোটে কলসন হাওড়া ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় চটকল শ্রমিকদের বিক্ষোভ ও ধর্মঘট সৃষ্টির জন্য প্রধানত দায়ী করেছেন কমিউনিস্টদের। তাঁর প্রস্তাব ছিল, "I Feel that a constant display of communist banners, the shouting of communist slogans and a circulation of communist literature and propaganda generally should now be definitely stopped." এই জন্যই কলসন Public Security Act নামক দমনমূলক আইন জারী করার কথাও বলেন। সরকারের মুখ্য সচিব ট্যুইনাম ১৯ ফেব্রুয়ারী তাঁর নোটে উল্লেখ করেন—*"It is true that the flag with the insignia of the hammer, sickle and star and revolutionary slogans are now a common feature of most labour demonstrations in Calcutta and most of the speeches which are made at these labour demonstrations advocate communism."* অবশ্য ট্যুইনাম এই মন্তব্যের পরেও মনে করেছেন যে, তখনই কমিউনিস্টদের এ সকল কার্যাবলী চূড়ান্তভাবে দমন করার জন্য কোনো বিশেষ আইনের সাহায্য নেবার প্রয়োজন নেই। অত্যন্ত সুচতুরভাবে ট্যুইনাম তার বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে এজাতীয় দমনপীড়নমূলক ব্যবস্থা কমিউনিস্ট মতবাদেরই প্রসার ঘটাতে পারে। তাঁর ২৭ ফেব্রুয়ারীর নোটে এই মন্তব্য করা হয়। অবশ্য স্বরাষ্ট্র দপ্তরের Under Secretary মাইকেল ক্যারিট যিনি গোপনে ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনি তাঁর নোটে যাতে কমিউনিস্ট শ্রমিক নেতাদের উপর দমনমূলক আইনী ব্যবস্থা গৃহীত না হয় তার জন্য যথেষ্ট তৎপরতা দেখিয়েছিলেন।[৬১]

১৯৩৭ সালের এই চটকল মজদুরদের সাধারণ ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে কমিউনিস্ট পার্টি বাঙলার শ্রমিকদের মধ্যে তাদের প্রভাব বৃদ্ধি করতে সমর্থ হয়েছিল সন্দেহ নেই। অবশ্য চটকল শ্রমিকদের এই বৃহত্তম ধর্মঘটে কমিউনিস্ট পার্টি ছাড়া অন্যান্য নানা রাজনৈতিক দল ও গোষ্ঠীই প্রথমদিকে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিল। শিবনাথ ব্যানার্জীর নেতৃত্বাধীন সি. এস. পি গোষ্ঠী সুরেশচন্দ্র ব্যানার্জীর নেতৃত্বাধীন গোঁড়া কংগ্রেসীদের সংগঠন বেঙ্গল লেবার

অ্যাসোসিয়েশন, সৌম্যেন ঠাকুর ও এম. এন. রায়পন্থী বামপন্থী সংগঠনগুলিও ঐক্যবদ্ধভাবে এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে (১৯৩৭) 'সারা বাঙলা কেন্দ্রীয় চটকল ধর্মঘট কমিটি' গঠন করে কাজ শুরু করলেও দেখা যায় শেষ পর্যন্ত কমিউনিস্টরাই এই ধর্মঘটকে রাজনৈতিক সংগ্রামের রূপ দিতে সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং আন্দোলনের প্রধান চালিকা শক্তিতে পরিণত হয়।[৬২] এপ্রিল মাসের শেষার্ধে মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভার সমর্থকরা শ্রমিক অঞ্চলে ধর্মঘটের বিপক্ষে প্রচার শুরু করে। অনেক সময় এই প্রচার সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ সৃষ্টির পথে পরিচালিত হয়। ধর্মঘটী শ্রমিকদের মধ্যে বিভেদ-নীতি ছড়িয়ে দেওয়াই ছিল এর উদ্দেশ্য।[৬৩]

২. বেঙ্গল-নাগপুর রেল শ্রমিক ধর্মঘট (১৯৩৬-৩৭)

চটকল সাধারণ ধর্মঘটের পূর্বে বাঙলার সংগঠিত শ্রমিকশ্রেণীর সবথেকে উল্লেখযোগ্য বৃহৎ আন্দোলন বস্তুত ছিল বেঙ্গল-নাগপুর রেল শ্রমিক ধর্মঘট (১৯৩৬-৩৭)। বেঙ্গল-নাগপুর, রেলওয়ের সাধারণ ধর্মঘট সম্পর্কে এই প্রসঙ্গে কিছু বলা প্রয়োজন। কারণ সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে সংগঠিত দীর্ঘ দুমাস স্থায়ী এই ধর্মঘট রেলশ্রমিকদের অভূতপূর্ব সংহতি ও শ্রেণী চেতনার প্রকাশ ঘটিয়েছিল (১৩ ডিসেম্বর ১৯৩৬ থেকে ১৩ ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৭)। ধর্মঘটের প্রধান কারণ ছিল আদ্রার কাছে ভুজুদুদি ক্যারেজ শেডের ২৭ জন শ্রমিকের পদাবনতি এবং এর প্রতিবাদে আদ্রার ১,১০০ রেল শ্রমিকের সত্যাগ্রহ। রেলকর্মচারী ইউনিয়নের পক্ষ থেকে দাবী জানানো হয়েছিল যে বিরোধটি কোনও অনুসন্ধান কোর্ট বা সালিশী বোর্ডের কাছে পাঠানো হোক। রেলওয়ে এজেন্ট বা সরকার পক্ষ শ্রমিকদের এ দাবী তো মানেইনি। উপরন্তু আদ্রার ১,১০০ সত্যাগ্রহী শ্রমিককে ছাঁটাই করা হয়। এর প্রতিবাদে খড়্গপুর সহ সমগ্র বি. এন. রেলওয়েতে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। ইউনিয়নের দাবী অনুযায়ী মোট ৬০ হাজার শ্রমিকের মধ্যে অন্তত ৫০ হাজার শ্রমিক শেষপর্যন্ত ধর্মঘটের শরিক হয়েছিল।[৬৪] মূলত কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট নেতৃত্বের প্রত্যক্ষ পরিচালনায় চলা এই ধর্মঘট জাতীয় কংগ্রেস সহ দেশের প্রায় সমস্ত রাজনৈতিক দল ও গোষ্ঠীর সমর্থন লাভ করে ঔপনিবেশিকতা বিরোধী জাতীয় আন্দোলনের রূপ পায়। কমিউনিস্ট পার্টির কর্মী ও নেতৃত্বও সর্বশক্তি নিয়ে রেল শ্রমিকদের এই ঐতিহাসিক আন্দোলনে যুক্ত হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত আপস রফার মাধ্যমে এই ধর্মঘটের পরিসমাপ্তি ঘটলেও[৬৫]—জাতীয় ক্ষেত্রে শ্রমিক সংহতি বোধের এটা ছিল এক বলিষ্ঠ প্রয়াস। এছাড়া ধারাবাহিকভাবে ১৯৩৭-৩৮ সালে যে শিল্পক্ষেত্রগুলিতে শ্রমিক ধর্মঘট ঘটে ও কমিউনিস্টরা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেয় সেগুলি ছিল নদীয়া (বর্তমান বাঙলাদেশের কুষ্টিয়া) জেলার মোহিনী মিলের শ্রমিক ধর্মঘট, ঢাকা নারায়ণগঞ্জের ঢাকেশ্বরী কটন মিলের ধর্মঘট, রাণীগঞ্জ কাগজ মিলের ধর্মঘট, কুলটি-বার্ণপুর-হীরাপুর প্রভৃতি ইঞ্জিনিয়ারীং ও ইস্পাত শিল্পের ধর্মঘট, বাটা শিল্পের ধর্মঘট. ট্রাম বা পরিবহণ শিল্পের ধর্মঘট,আসানসোল কয়লাখনি এলাকায় ও উত্তরবঙ্গের চা-বাগিচা শ্রমিকদের আন্দোলন- ধর্মঘট প্রভৃতি। এই আন্দোলন সংগ্রামগুলিতে অবশ্য শুধুমাত্র কমিউনিস্ট বা বামপন্থী নয় ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের শরিক জাতীয়তাবাদী

মধ্যপন্থী অংশের নেতৃত্বও অংশ নেন—তবে শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে সংগঠিত শ্রেণী চেতনা ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার উদ্বোধনে স্যোশালিস্ট-কমিউনিস্ট নেতৃত্বের ভূমিকাই ছিল প্রধান। উক্ত শ্রমিক আন্দোলন ও ধর্মঘটগুলির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করা হল ঃ

৩. কুষ্টিয়ার মোহিনী সূতো-কলের আন্দোলন ঃ

নদীয়ার কুষ্টিয়া মহকুমায় প্রধানত ধনী বাঙালী শিল্পদ্যোগী ও অংশীদারদের দ্বারা স্বদেশী আন্দোলনের যুগে স্থাপিত মোহিনী কটন মিল ক্রমশ একটি প্রতিষ্ঠিত ও বৃহৎ শিল্প সংস্থায় পরিণত কিন্তু দেশীয় শিল্পোদ্যোগ হওয়া সত্ত্বেও এই সংস্থায় ইউরোপীয়দের দ্বারা পরিচালিত সংস্থাসমূহের মতনই শ্রমিক অসন্তোষ ছিল যথেষ্টই প্রবল। তাই শ্রমিক ধর্মঘটের প্রভাবমুক্ত তো এই সংস্থা ছিলই না উপরন্তু ১৯৩৭ থেকে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত পরপর চার বছরে চারটি শ্রমিক ধর্মঘটের ঘটনা ঘটে। দুটি ধর্মঘট হয় ১৯৩৭ সালের মধ্যেই, তৃতীয়টি ১৯৩৯ এবং চতুর্থটি ১৯৪০ সালে ঘটে। এই চারটি ধর্মঘটের মধ্যে তিনটি ধর্মঘটের কারণ ছিল প্রায় একই—তা হল রাত্রিকালীন সময়ে ("C" Shift) মিল কর্তৃপক্ষের উৎপাদন প্রক্রিয়া বন্ধ করে দেওয়ার ফলে প্রভূত সংখ্যায় কর্মী ছাঁটাই জনিত বিক্ষোভ। শুধুমাত্র দ্বিতীয় ধর্মঘটের (জুলাই-সেপ্টে ম্বর, ১৯৩৭) প্রত্যক্ষ কারণ ছিল শ্রমিক ইউনিয়নের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন ও মালিকপক্ষের অনুগত এক ব্যক্তির দায়িত্বশীল পদে নিয়োগের (Worker's Superviser) প্রতিবাদ।[৬৬]

১৭ ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৭ তারিখে মিল কর্তৃপক্ষ কারখানার যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণের ও মেরামত্তির অজুহাতে মিলের তৃতীয় শিফ্‌টের উৎপাদন বন্ধ করে দেয়। এর ফলে প্রায় ১০০০ শ্রমিক কর্মচ্যুত হয়েছিল। এর প্রতিবাদে মিলের শ্রমিক ইউনিয়ন (TUC) বিক্ষোভ দেখায় এবং কয়েকটি বিভাগে কর্মবিরতি পালিত হয়। ইউনিয়নের পক্ষ থেকে কর্তৃপক্ষের কাছে একটি দাবীসনদ পেশ করা হয়েছিল। মিল কর্তৃপক্ষ এর প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিল ২৬শে ফেব্রুয়ারী থেকে লক আউট ঘোষণা করে। যার ফলে ৪০০০ শ্রমিক কর্মহীন হয়ে পড়ে।[৬৭] সরকারী মধ্যস্থতায় মালিক পক্ষ ২৯ মার্চ মিলের দরজা খোলে এবং প্রাথমিকভাবে ৩টি শিফ্‌টেই ৬ ঘণ্টা করে কাজের সুযোগ দেওয়া হয়। সরকারী সূত্র অনুযায়ী দেখা গেছে যে ধর্মঘট ও লক আউটের ফলে বহু শ্রমিক তাদের গ্রামের বাড়ীতে চলে গিয়েছিল ফলে ৩১শে মার্চ পর্যন্ত মাত্র এক তৃতীয়াংশ শ্রমিক কাজে যোগদান করে। ফলে মিল কর্তৃপক্ষ তৃতীয় শিফ্‌টের (Shift) কাজ বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়। ফলে শ্রমিক বিক্ষোভ অব্যাহত থাকে।[৬৮]

বাঙলার কংগ্রেস নেতৃত্বের ভূমিকা কুষ্টিয়ার মোহিনী মিলের এই ধর্মঘট বিষয়ে তেমন ইতিবাচক ছিল না। কংগ্রেস সভাপতি সুভাষচন্দ্র বসু মিল শ্রমিকদের অবস্থা সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করে অনতিবিলম্বে শ্রমিক-মালিকের এই সংঘাতের অবসান চেয়েছিলেন।

এটা সত্য, কিন্তু কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে মধ্যস্থতাকারীর কোন ভূমিকা গ্রহণ করা হয়নি এবং শ্রমিকদের পক্ষও অবলম্বন তারা করেননি। বস্তুত এই জাতীয় তথাকথিত 'স্বদেশী'

প্রতিষ্ঠানগুলির কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কংগ্রেসের স্থানীয় নেতৃত্বের ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল। শ্রমিকদের পক্ষ নিয়ে সেই সংযোগ তারা ছিন্ন করতে চাননি।[৬৯] কুষ্টিয়ার মোহিনী মিলের শ্রমিক-মালিক এই বিরোধ নিস্পত্তির এবং কৃষক-প্রজা পার্টির স্থানীয় এম. এল. এ. মৌলভী সামসুদ্দিন আহম্মদেব উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। শেষ পর্যন্ত সরকারী মধ্যস্থতার ফলেই মোহিনী মিলের প্রথম পর্যায়ের (ফেব্রুয়ারী-মে, ১৯৩৭) শ্রম বিরোধের অবসান ঘটে। মিল কর্তৃপক্ষ তিনটি শিফটের উৎপাদন ব্যবস্থাই বহাল রাখেন। যদিও তৃতীয়টির সময়সীমা হ্রাস করা হয়। এছাড়া কর্তৃপক্ষ শ্রমিক ইউনিয়নাকে (T.W.U.) স্বীকৃতি প্রদানের বিষয়টিও বিবেচনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। ৭ মে এ সংক্রান্ত বোঝাপড়া অনুষ্ঠিত হয় এবং মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে মোহিনী মিলে স্বাভাবিক কাজ পুনরায় শুরু হয়।[৭০]

কুষ্টিয়ার মোহিনী মিলে শ্রমিক অসন্তোষ এরপরেও অব্যাহত ছিল। প্রধানত শ্রমিক ইউনিয়নের অস্তিত্ব ও মর্যাদা রক্ষার বিষয়কে কেন্দ্র করেই পুনরায় মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে বিরোধ দ্বিতীয় পর্যায়ে শুরু হয় (জুলাই-সেপ্টেম্বর, ১৯৩৭)। মে মাসে মিল চালু হবার পরে শ্রমিক ইউনিয়নের আধিপত্য খর্ব করার প্রচেষ্টা কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে শুরু হয়। পূর্বেই বলা হয়েছে মালিকদের অনুগত ও ইউনিয়ন-বিরোধী একজন কর্মচারীকে তত্ত্বাবধায়ক পদে নিযুক্ত করার প্রতিবাদে শ্রমিক ইউনিয়নের (TWU) পক্ষে ৫ জুলাই থেকে মিলের বিভিন্ন বিভাগে ধর্মঘট শুরু হয়। ৬ জুলাই থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য কর্তৃপক্ষ লক-আউট ঘোষণা করে। সরকারী পর্যায় নদীয়ার জেলাশাসকের উদ্যোগে যখন এই শ্রম-বিরোধের নিস্পত্তির প্রচেষ্টা করা হয় তখন মিল কর্তৃপক্ষের ভূমিকা ছিল খুবই আক্রমণাত্মক। শ্রমিক ইউনিয়নের ক্ষমতা ও প্রভাব খর্ব করা এবং কর্তৃপক্ষেব চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রণ শ্রমিকদের ওপর প্রতিষ্ঠা করাই ছিল তাদের লক্ষ্য। বিশেষত মিল কর্তৃপক্ষের যে শর্তটি সর্বাপেক্ষা বিবাদের বিষয় হয়ে উঠেছিল তা হল শ্রমিক ইউনিয়নের কর্মসমিতিতে একজনের বেশী বহিরাগতের অন্তর্ভূক্তি সম্পর্কে আপত্তি। শ্রমিকরা তা মানতে অস্বীকৃত হয়।[৭১] তাছাড়া মালিকপক্ষ হিন্দু-মুসলিম এই সাম্প্রদায়িক বিরোধ সৃষ্টির মাধ্যমেও শ্রমিব ঐক্য ভাঙ্গতে সচেষ্ট হয়েছিল। এই অবস্থায় শ্রমিক ইউনিয়নের বেঙ্গল লেবার পার্টির প্রভাব ক্রমশঃ হ্রাস পেতে শুরু করে। স্থানীয় কমিউনিস্ট ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীরা অবশ্য এই শ্রমিক বিরোধ শ্রমিকদের পক্ষে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। শ্রমিকদের পক্ষে পরিস্থিতি আরও ক্ষতিকর হয়ে ওঠে যখন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এই বিরোধের জন্য শ্রমিক ইউনিয়ন ও তার নেতাদের দায়ী করা হয়। বস্তুত কংগ্রেস এক্ষেত্রে মোহিনী মিলের মালিকদেরই পক্ষ অবলম্বন করেছিল এবং সাংগঠনিক স্বার্থেই তা করতে তারা বাধ্য হয়েছিল।[৭২]

কুষ্টিয়ার মোহিনী মিলের এই ধর্মঘটকে কেউ কেউ অপ্রয়োজনীয় ও অনাবশ্যক বলেছেন। প্রদেশ কংগ্রেসের একাংশ শ্রমিকদের এই হঠকারিতার নিন্দাও করেছিলেন। মধ্যবিত্ত জনসাধারণের মধ্যে শ্রমিকদের প্রতি সহানুভূতির কোনো জোয়ার সৃষ্টি হয়নি। বরঞ্চ কোনো

কোনো মহলে বিরূপতাই ছিল। অনেকের মতে মালিক বা কর্তৃপক্ষ তার সংস্থায় পছন্দের ব্যক্তিকে যে কোন পদে নিযুক্ত করতে পারে। সেক্ষেত্রে শ্রমিক ইউনিয়নেব হস্তক্ষেপ অবাঞ্ছিত। মোহিনী মিলের শ্রমিক নেতৃত্ব সে কাজই করেছিল। ফলে এই ধর্মঘট কোন সহানুভূতি লাভ করতে পারেনি।

৪. বস্ত্রশিল্পে শ্রমিক আন্দোলন (১৯৩৭-৩৯)

১৯৩৮-৩৯ সময়কালে কমিউনিস্ট পার্টি যে শিল্পক্ষেত্রগুলিতে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিলেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল নারায়ণগঞ্জেব হোসিয়ারী শিল্প, লক্ষ্মীনারায়ণ টেক্সটাইল মিল, ঢাকেশ্বরী ও চিত্তরঞ্জন মিল প্রভৃতি। এই শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি গড়ে উঠেছিল বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে স্বদেশী আন্দোলনের ভাবধারায়। ইউরোপীয়দের দ্বারা পরিচালিত শিল্প সংস্থার সঙ্গে দেশীয় মালিকদের দ্বারা পরিচালিত এই শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির পার্থক্য ছিল এখানেই যে জনসাধারণের মধ্যে এই জাতীয় ও স্বদেশী ভাবধারার আদর্শে গড়ে ওঠা প্রতিষ্ঠানগুলি সম্পর্কে যথেষ্ট ভাবাবেগ, সহানুভূতি ও সমর্থন প্রকাশ পেত।

সুতরাং এই সকল সংস্থায় শ্রমিকদের উপরে শোষণ ও অবিচার যাই হোক না কেন মালিকপক্ষ জনসাধারণের এই স্বদেশী ভাবাবেগের পুঁজিকে ব্যবহার করে নিশ্চিন্তবোধ করত। বস্তুত এই সংস্থাগুলিতে বড় ধরণের কোনো শ্রমিক অসন্তোষ, বিক্ষোভ বা শ্রমবিরোধের ঘটনা প্রায় অনুপস্থিত ছিল। যে শ্রমিক ইউনিয়নগুলি এই সংস্থাগুলিতে প্রতিষ্ঠিত ছিল সেগুলি মূলত জাতীয়তাবাদী বিপ্লবীদের বা বামপন্থী কংগ্রেসীদের দ্বারা পরিচালিত হত। ঢাকার অনুশীলন সমিতি (পরবর্তীকালে RSP) এই ইউনিয়নগুলির পরিচালনায় প্রধান ভূমিকায় ছিল। কিন্তু ১৯৩৭-৩৮ কালপর্বে যখন বিভিন্ন বিপ্লববাদী গোষ্ঠীর গুরুত্বপূর্ণ কর্মীরা কারাগারে কমিউনিস্ট মতাদর্শে দীক্ষিত হয়ে মুক্তিলাভ করেন তখন থেকেই কমিউনিস্ট কর্মীরূপে এঁরা বিভিন্ন শিল্পক্ষেত্রে শ্রমিক সংগঠকের ভূমিকা গ্রহণ করতে শুরু করেন।[৭৩] ক্রমশ উক্ত হোসিয়ারী ও বস্ত্রমিলগুলিতে কমিউনিস্ট প্রভাবিত শ্রমিক ইউনিয়ন সক্রিয় হয়ে উঠতে শুরু করে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন জিতেন ঘোষ (পূর্ণ দাস গ্রুপ), সত্যেন সেন, প্রবোধ গুপ্ত, সুশীল ঘোষ (জীবন চ্যাটার্জী গ্রুপ), নেপাল নাগ, বঙ্গেশ্বর রায় (শ্রী সংঘ), তপন চক্রবর্তী (যুগান্তর), অনিল মুখার্জী, ব্রজেন দাস, সুবোধ সেন, বারীন দত্ত (নারায়ণগঞ্জ অনুশীলন সমিতি) প্রমুখ। এছাড়াও সতীশ পাকড়াশী, কৃষ্ণপদ চক্রবর্তী, গোপাল গুপ্ত, সমর ঘোষ প্রমুখের নামও উল্লেখযোগ্য।[৭৪] লক্ষ্মীনারায়ণ কটন মিলে গোপাল বসাক ও অনিল মুখার্জীর নেতৃত্বে শ্রমিকদের অর্থনৈতিক ও পেশাগত বিভিন্ন দাবীর ভিত্তিতে ১৯৩৯ সূচনায় ধর্মঘট সফল হয়েছিল এবং প্রায় ১০০০ শ্রমিকের এই মিলটিতে কমিউনিস্ট পরিচালিত শ্রমিক ইউনিয়নই প্রভাবশালী হয়ে ওঠে। নারায়ণগঞ্জের হোসিয়ারী মিলগুলিতে শ্রমিক-ইউনিয়নে শ্রমিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

কিন্তু ঢাকেশ্বরী কটন মিলে দুটি কারখানায় কমিউনিস্টদের প্রভাব বিস্তার তুলনামূলকভাবে ছিল অত্যন্ত কঠিন কাজ। কারণ প্রথমত এই বিশাল বস্ত্র কারখানার পরিচালকদের অনেকেই ছিলেন জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ও সমাজের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবি শ্রেণীভুক্ত। দ্বিতীয়ত, পূর্ব থেকেই এই শিল্পসংস্থায় শ্রমিক ইউনিয়নের পরিচালন ভার ছিল কমিউনিস্ট-বিরোধী অনুশীলন সমিতির নেতৃত্বের হাতে। তাদের রাজনৈতিক প্রভাব ছিল যথেষ্ট শক্তিশালী। এছাড়াও মালিকপক্ষের সহায়তাও তারা পেত। তৃতীয়ত, কমিউনিস্টদের সম্পর্কে নানা প্রকার অপপ্রচার ও বিভ্রান্তি সে সময় সৃষ্টি করা হত। কমিউনিস্টরা জাতীয়তাবিরোধী, স্বদেশী সম্পত্তি তারা ধ্বংস করতে চায় ইত্যাদি প্রচার ঢাকেশ্বরী মিলে শ্রমিক ইউনিয়ন গড়ার ক্ষেত্রেও স্থানীয় কমিউনিস্ট ট্রেড ইউনিয়নের সামনেও বাধার সৃষ্টি করেছিল।[৭৫] তথাপি ঢাকেশ্বরী কটন মিলে শ্রমিক ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠা এবং শ্রমিকদের সংগঠিত করার উপর গোপাল বসাক, অনিল মুখার্জী, নেপাল নাগ নেতৃবৃন্দ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন।

ঢাকেশ্বরী কটন মিলে ১৮ জুলাই ১৯৩৯ থেকে দুটি ইউনিটেই মোট প্রায় ৪৫০০ শ্রমিক কর্মচারী ধর্মঘটে সামিল হয়েছিল। এর প্রাথমিক কারণ ছিল শ্রমিক ইউনিয়নের একজন সক্রিয় কর্মী ননী চৌধুরীর যান্ত্রিক দুর্ঘটনায় হাতের আঙুল কাটা যাওয়ার ফলে মিল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তাঁকে কর্মচ্যুত করা, এছাড়া দুই নম্বর মিলে তিনজন বাঙালী উচ্চপদস্থ কর্মচারীকে অকর্মণ্যতার অভিযোগে ছাঁটাই করে সেই স্থলে ইউরোপীয় অফিসারদের নিয়োগ করা।[৭৬] এর সঙ্গে শ্রমিক কর্মচারীদের অন্যান্য পেশাগত অর্থনৈতিক দাবীসমূহ অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। ২৬ জুলাই এই ধর্মঘটের নিষ্পত্তি হয় এবং মিল কর্তৃপক্ষ শ্রমিক কর্মচারীদের কিছু সুবিধা প্রদান কবে এবং ছাঁটাই কর্মীরা পুনর্বহাল হয়। যদিও এই ধর্মঘটের প্রধান উদ্যোক্তা ছিল কমিউনিস্ট ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃত্ব এবং নেপাল নাগ, অনিল মুখার্জী প্রমুখ পরিচিত কমিউনিস্টদের দ্বারাই আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল—তথাপি মিল কর্তৃপক্ষ স্থানীয় কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে আপোস রফা করেই এই শ্রমিক বিরোধের নিষ্পত্তি ঘটিয়েছিলেন।

স্থানীয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকেও ধর্মঘট অবিলম্বে তুলে নেওয়ার জন্য মিলের ইউনিয়নের ওপর চাপ সৃষ্টি করা হয়। ঢাকেশ্বরী কটন মিলের ধর্মঘটের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল যে সাধারণ শ্রমিক এবং মিলেব কেবানি ও অফিসাররা যুক্তভাবে এতে সামিল হয়েছিলেন। কিন্তু সাধারণ শ্রমিকদের উপর কমিউনিস্টদের যে প্রভাব ছিল তা 'বাবু' কর্মচারীদের ওপর ছিল না। এদের উপর কমিউনিস্ট-বিরোধী কংগ্রেস ও অনুশীলন গ্রুপের প্রভাবই ছিল বেশী। যার ফলে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও এই ধর্মঘটকে দীর্ঘমেয়াদী রূপ দিয়ে শ্রমিকদের সকল দাবী আদায় করা ইউনিয়নের পক্ষে সম্ভবপর হয়নি।[৭৭]

এই ধর্মঘটে অনুপ্রাণিত হয়ে লক্ষ্মীনারায়ণ কটন মিলের শ্রমিক কর্মচারীরা ১৬আগস্ট ১৯৩৯ থেকে বিভিন্ন দাবীর ভিত্তিতে ধর্মঘট শুরু করে। এটিও শেষ পর্যন্ত আংশিক সাফল্য

পেয়েছিল। ১৯৪০-এর দশকে নানাসময় কমিউনিস্ট প্রভাবিত ইউনিয়ন এই মিলগুলিতে বিভিন্ন দাবীতে ধর্মঘট ও আন্দোলনে লিপ্ত হয়।

৫. রাণীগঞ্জ কাগজ কলের ধর্মঘট (১৯৩৮)

আলোচ্য সময়কালে রাণীগঞ্জ পেপার মিলের শ্রমিক আন্দোলন ও ধর্মঘট নানা কারণে উল্লেখযোগ্য প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। ঢাকার বস্ত্র শিল্পের মত এই পেপার মিলের মালিকানা অবশ্য দেশীয় শিল্পোদ্যোগীদের হাতে ছিল না। ইউরোপীয় বামার লরি অ্যাণ্ড কোং-এর হাতে মালিকানা। ম্যানেজারসহ সকল উচ্চপদস্থ কর্মচারীই ছিলেন ইংরেজ। ফলে এই মিলের শ্রমিক আন্দোলন অনেক অধিক পরিমাণে জাতীয় নেতৃত্বের সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে এবং ঔপনিবেশিকতা বিরোধী চরিত্র অর্জন করতে সক্ষম হয়। দীর্ঘ কয়েক মাস ধরে চলার পরেও এবং একজন প্রথম সারির কমিউনিস্ট ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীর মৃত্যু হওয়া সত্ত্বেও এই ধর্মঘটও শেষ পর্যন্ত সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। কিন্তু এর তাৎপর্য ছিল অসীম।

১৯৩৮ সালের ১৩ নভেম্বর থেকে রাণীগঞ্জ পেপার মিলের ১,৫০০ শ্রমিক তাদের সহকর্মীদের ছাঁটাই-এর প্রতিবাদে একযোগে ধর্মঘট শুরু করে। অবশ্য তাদের অন্যান্য দাবী দাওযাও ছিল। ধর্মঘটকে বানচাল করার জন্য মিল কর্তৃপক্ষ সরকারের শরণাপন্ন হল। সরকারী সাহায্য তারা প্রচুর পরিমাণেই পেলেন শান্তিরক্ষার অজুহাতে এক বিরাট পুলিস বাহিনী প্রেরিত হল। পুলিশের সাহায্যে দালাল শ্রমিকদের দিয়ে কাজ করানই ছিল কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্য। শ্রমিক ইউনিয়ন কর্তৃপক্ষের এই ষড়যন্ত্রকে বানচাল করার জন্য কারখানার গেটে পিকেটিং-এর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ১৫ নভেম্বর ইউনিয়নের তরুণ সহ-সম্পাদক সুকুমার ব্যানার্জী পিকেটিংরত অবস্থায় মালিকের লরিতে পিষ্ট হয়ে শহীদের মৃত্যুবরণ করেন। মালিকপক্ষ লরি করে দালালদের কারখানার অভ্যন্তরে প্রবেশ করাচ্ছিল। স্বভাবতই সুকুমার ব্যানার্জী কারখানা গেট থেকে সরে দাঁড়ায়নি, প্রবেশ পথে পিকেটিং করছিলেন।[৭৮]

রাণীগঞ্জ বেঙ্গল পেপার মিলের দীর্ঘস্থায়ী শ্রমিক ধর্মঘট শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হলেও প্রধানত তরুণ কমিউনিস্ট কর্মী সুকুমার ব্যানার্জীর মৃত্যুবরণের ঘটনা বাঙলার শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ স্থান করে নিয়েছিল। সাধারণ মানুষের মধ্যে বিশেষত বর্ধমানে এই ঘটনা শ্রমিকদের পরবর্তী পর্যায়ের আন্দোলন সংগ্রামের প্রতি সহানুভূতি সৃষ্টিতে সহায়ক হয়েছিল। সদ্য বিবাহিত তরুণ সুকুমারের আত্মত্যাগ জেলার মহিলাদের মধ্যে সহানুভূতির সৃষ্টি করেছিল বলে সৈয়দ সাহেদুল্লাহ মন্তব্য করেছেন।[৭৯] শ্রমিক আন্দোলনের নেতৃত্ব (নিত্যানন্দ চৌধুরীও ছিলেন এই ধর্মঘটের অন্যতম সংগঠক) এর থেকে দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন পরিচালনা সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে।

৬. বাটা কোম্পানীর শ্রমিক ধর্মঘট

১৯৩৯ সালের ৪ জানুয়ারী থেকে অপর একটি ইউরোপীয় (চেকোশ্লোভাকিয়া) প্রতিষ্ঠান বাটা জুতো কোম্পানীর দু-সপ্তাহব্যাপী শ্রমিক ধর্মঘট শুরু হয়। এই ধর্মঘটে সংশ্লিষ্ট প্রায় ৪০০০ শ্রমিকদের চাকুরীর স্থায়িত্ব, প্রভিডেন্ট ফাণ্ড প্রবর্তন, বিনা খরচে চিকিৎসার সুযোগ, বেতন-বৃদ্ধি, ন্যূনতম বেতন সপ্তাহে ২৫ টাকা ধার্য করা, শ্রমিক ইউনিয়নের স্বীকৃতি প্রভৃতি দাবীতে ধর্মঘট শুরু হয়। যথারীতি ধর্মঘটী শ্রমিকদের উপর সরকারী দমন-পীড়ন শুরু হয়। ৯ জানুয়ারী সকালে বাটা শ্রমিক ইউনিয়নের সম্পাদক ও সৌমেন ঠাকুরপন্থী নেতা বিনয় চ্যাটার্জীকে বক্তৃতারত অবস্থায় পুলিশ গ্রেপ্তার করার প্রচেষ্টা করলে শ্রমিকদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। শ্রমিকরা তাঁকে জোর করে পুলিশ হেফাজত থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করলে পুলিশের গুলি চালনায় তিনজন শ্রমিক আহত হয় এবং বাটানগরে সান্ধ্য আইন জারী করা হয়। এই গুলি চালনার প্রতিবাদে ১১ জানুয়ারী কলকাতার হাজরা পার্কে BPTUC-র উদ্যোগে জনসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। শ্রমিক ইউনিয়নের পক্ষ থেকে জনগণের কাছে বাটার পণ্য সামগ্রী বর্জনের আহ্বান জানান হয়েছিল এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের সভাপতি কে. এম. আহমেদ তা সমর্থন করেন। শেষ পর্যন্ত ১৬ জানুয়ারী এই শিল্প সংস্থার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে শ্রমিকদের আপোস মীমাংসা হয়। শ্রমিকদের অভিযোগ ও দাবীসমূহ সুবিবেচনা পাবে এবং ধর্মঘটীদের কাউকে শাস্তি দেওয়া হবে না বলে মালিকপক্ষ প্রতিশ্রুতি প্রদান করে। মুসলিম শ্রমিকদের সংখ্যাধিক্যের কারণে মুসলিম লীগ এই বাটা-কোম্পানীতে ইউনিয়ন গড়ার চেষ্টা করেও সফল হয়নি—বামপন্থীদের হাতেই তা ছিল।[৮০]

৭. কয়লাখনি শ্রমিক আন্দোলন

আসানসোল ও রাণীগঞ্জ কয়লাখনি অঞ্চলে খনি শ্রমিকরা সুদীর্ঘকাল থেকেই মজুরি, কাজের শর্ত এবং অন্যবিধ সামাজিক ও অর্থনৈতিক শোষণে জর্জরিত ছিল। জাতীয় আন্দোলনে তথা ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃত্বের তরফে কয়লাখনি শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে খুব কম উদ্যোগই গ্রহণ করা হয়। ১৯৩৭ সালে খনি অঞ্চল থেকে কমিউনিস্ট নেতা বঙ্কিম মুখার্জী বঙ্গীয় প্রাদেশিক আইনসভায় নির্বাচিত হবার পর কমিউনিস্ট ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠকরা কংগ্রেসের সাহায্যে কয়লাখনি অঞ্চলে শ্রমিক সংগঠন ও আন্দোলন গড়ে তুলতে অগ্রসর হন। ১৯৩৭-এর ফেব্রুয়ারী থেকে এপ্রিলের মধ্যে জামুরিয়ার কয়েকটি খনিতে কমিউনিস্টদের উদ্যোগে শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির দাবীতে ছোট আকারে ধর্মঘট সংগঠিত হয়। জামুরিয়ার দুটি খনিতে ৮-১০ ফেব্রুয়ারী ধর্মঘটে প্রায় ১১৫০ জন খাদান শ্রমিক যোগদান করেছিল।[৮১]

রাণীগঞ্জ এলাকায় এম. এন. রায় পন্থী কয়লাখনি শ্রমিকদের একটি সংগঠন Miners Association কাজ করত। কিছুদিনের মধ্যেই জগৎ বসুর নেতৃত্বে একটি BPTUC অনুমোদিত ও কমিউনিস্ট প্রভাবিত ইউনিয়ন আসানসোল-রাণীগঞ্জ খনি অঞ্চলে গড়ে ওঠে। পরবর্তীকালে

১৯৩৮-এর প্রথমদিকে বঙ্কিম মুখার্জীকে সভাপতি, আব্দুল মোমিনকে কার্যকরী সভাপতি ও নিত্যানন্দ চৌধুরীকে সাধারণ সম্পাদক করে 'বেঙ্গল কোলিয়ারী ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন' প্রতিষ্ঠিত হয়।[৮০] অল্পদিনের মধ্যেই BCWU কয়লাখনি শ্রমিকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল। নিঃসন্দেহে এম. এল. এ রূপে বঙ্কিম মুখার্জীর প্রভাব অনেকটাই সহায়ক হয়েছিল। বস্তুত ১৭৭৪ সালে ভারতে কয়লাখনি চালু হলেও ১৮৯৪ পর্যন্ত খনি শ্রমিকদের জন্য কোনোরূপ আইন-কানুন, বেতন কাঠামো বা নিরাপত্তাবিধি ছিল না। ১৯০১ সালে আন্তর্জাতিক চাপে একটি মাইনস্ অ্যাক্ট এবং ১৯০৪ সালে মাইনস্ রেগুলেশন বলবৎ হয়ও ১৯২৩ সালে তা সংশোধিত হয়। কিন্তু ১৯৩৭-৩৮ সালেও কয়লা খনি শ্রমিকদের পেশাগত, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার উল্লেখযোগ্য কোনো উন্নতি ঘটেনি। সুতরাং বাঙলার কমিউনিস্ট শ্রমিক নেতৃত্বের পক্ষ থেকে হাজার হাজার কোলিয়ারী শ্রমিককে সংগঠিত করা এবং তাদের দাবী আদায়ের আন্দোলনে সামিল করা ট্রেড ইউনিয়ন কর্মসূচীর অন্যতম লক্ষ্যে পরিণত হয়। এর মাধ্যমে কমিউনিস্টরা কয়লাখনি-শ্রমিকদের নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও কিছুটা সংগঠিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন।[৮১] ইউনিয়নের কেন্দ্র ছিল আসানসোল। এছাড়া মানবেড়িয়া, সীতারামপুর ও রাণীগঞ্জে তিনটি শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। জেলার কয়েকজন কমিউনিস্ট সদস্য যেমন বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরী, শিবপ্রসাদ দত্ত প্রমুখ কোলিয়ারী শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করতেন। কমিউনিস্ট পার্টিকে এখানে রায়পন্থীদের এবং সৌম্যেন ঠাকুর-পন্থী ওয়ার্কার্স লীগের ও অন্যান্য আরও কয়েকটি বামপন্থী গোষ্ঠীর মোকাবিলা করে কাজ করতে হত। ওয়ার্কার্স লীগের পক্ষে আসানসোলের কাছে নিয়ামতপুরে 'অল বেঙ্গল মাইন ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন' নাম একটি সংগঠন গঠিত হয়েছিল। কিন্তু তাদের শক্তি ছিল খুবই কম।[৮৪]

কমিউনিস্ট পার্টি প্রভাবিত বেঙ্গল কোলিয়ারী ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সামনে সবচেয়ে বড় বাধা ছিল অবশ্য কোলিয়ারীর মালিক কর্তৃপক্ষ। কর্তৃপক্ষের লোকেদের নজর এড়িয়ে কোনো বহিরাগতর পক্ষে খনি অঞ্চলে প্রবেশ করা ছিল দুরূহ। শ্রমিক ইউনিয়নের কোন অফিসও খনি এলাকায় স্থাপন করতে দেওয়া হত না। খনি শ্রমিকরাও ছিল তুলনামূলকভাবে অন্য শিল্পক্ষেত্রের তুলনায় অসংগঠিত, নিরক্ষর ও শ্রেণী চেতনাহীন। সাধারণত পার্শ্ববর্তী আদিবাসী এলাকা থেকেই তারা আসতেন। ১৯৪০-এর দশকের পূর্বে এই কারণে নানা অভিযোগ ও অসন্তোষ থাকা সত্ত্বেও বড় কোনো আন্দোলন বা ধর্মঘটে বাঙলার কয়লাখনি শ্রমিকরা নিজেদের যুক্ত করতে পারেনি। ১৯৩৮-এর জুনে কুলটি থানা এলাকার সাঁওতাল শ্রমিকরা মজুরি বৃদ্ধির দাবীতে বিচ্ছিন্নভাবে কয়েকদিনের জন্য (৬-১১ জুন) ধর্মঘটে লিপ্ত হয়েছিল। এছাড়া ১৯৩৯ সালে বিক্ষিপ্ত কয়েকটি বিক্ষোভের ঘটনা ছাড়া আর কোনো শ্রমিক ধর্মঘটের তথ্য পাওয়া যায় না।[৮৫]

৮. লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে শ্রমিক আন্দোলন

বিহারের জামসেদপুর অপেক্ষা কুলটি বার্ণপুর অঞ্চলের লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে শ্রমিক

আন্দোলনের প্রভাব কিছুটা বিলম্বে এসেছিল। টাটাদের পরিচালনাধীন TISCO-কর্তৃপক্ষ বাঙলার প্রধানতম শিল্পসংস্থা IISCO-র (Indian Iron and Steel Company) বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠানরূপে শিল্প অসন্তোষ সৃষ্টির প্রচেষ্টা অনেক ক্ষেত্রেই করে এসেছে। এই দুই ইস্পাত প্রতিষ্ঠানের বিরোধ সর্বজনবিদিত। কুলটি-বার্ণপুর অঞ্চলে প্রথম শ্রমিক ধর্মঘট হয় ১৯৩৭-এর জুন মাসে (১৯-২৬ জুন), যার নেতৃত্ব প্রদান করেন TISCO-র শ্রমিক ইউনিয়নের প্রখ্যাত ট্রেড ইউনিয়নের নেতা মানেক হোমি। পুনরায় ডিসেম্বরে কুলটি আয়রণ ওয়ার্কসের একটি ইউনিটে আংশিক ধর্মঘট হয়েছিল কর্তৃপক্ষের অনুগত একজন ফোরম্যানের অপসারণের দাবীতে। ১৯৩৮-এর ফেব্রুয়ারীতে বার্ণপুরের ইণ্ডিয়ান স্ট্যাণ্ডার্ড ওয়াগান কোম্পানীতে শ্রমিক ছাঁটাই-এর প্রতিবাদ ও অন্যান্য দাবীতে প্রায় দেড় হাজার শ্রমিক ধর্মঘট শুরু করে।[৮৬] এই সময়েই মানেক হোমির নেতৃত্বের লেবার ফেডারেশনের শাখা কুলটি বার্ণপুর ও হীরাপুর এলাকায় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৩৮-এর মে মাসে TISCO-র কুলটি ও হীরাপুর ফ্যাক্টরিতে বিভিন্ন দাবীতে পুনরায় ধর্মঘট শুরু হয় হয় এবং জুন মাসে হোমির নেতৃত্বাধীন লেবার ফেডারেশনের পরিচালনায় কুলটি হীরাপুরের ফ্যাক্টরিগুলিতে মোট প্রায় চোদ্দ হাজার ইস্পাত শ্রমিক মজুরি বৃদ্ধি, প্রভিডেন্ট ফাণ্ড এবং পেশাগত অন্যান্য দাবীর ভিত্তিতে (যার মধ্যে কেরানিদের ইউনিয়নের দাবীও ছিল) ধর্মঘট শুরু করে।[৮৭] ১০ জুন (১৯৩৮) মানেক হোমি CSP নেতা শিবনাথ ব্যানার্জীকে সঙ্গে নিয়ে হীরাপুর ময়দানে বিশাল শ্রমিক সমাবেশে ভাষণ দেন। শিবনাথ ব্যানার্জী BPTUC-র পক্ষে পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করেছিল, এটাই ছিল ইস্পাত শিল্পের শ্রমিকদের সঙ্গে BPTUC-র প্রথম সংযোগ প্রয়াস।[৮৮] এই ধর্মঘটের আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক ছিল সাধারণ শ্রমিকদের সঙ্গে কেরানিবাবু বা বাঙ্গালী 'ভদ্রলোক' শ্রেণী ধর্মঘটে যোগদান করেন।

এই সময় থেকেই হোমি পরিচালিত লেবার ফেডারেশনের সঙ্গে BPTUC-র কমিউনিস্ট শ্রমিক নেতৃত্বের প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়। কমিউনিস্ট প্রভাবিত বেঙ্গল লেবার পার্টি শ্রমিক নেতা নিত্যানন্দ চৌধুরীকে এই সময় নির্দেশ দিয়েছিল লেবার ফেডারেশনের প্রভাব থেকে মুক্ত করে শ্রমিকদের মধ্যে সংগঠন ও রাজনৈতিক শাখা প্রতিষ্ঠা করতে, কিন্তু চৌধুরী তা করতে সমর্থ হননি।[৮৯] ফলে জুলাই মাসে আব্দুল মোমিন হোমি পরিচালিত লেবার ফেডারেশনের সঙ্গে যুক্তভাবে কাজ করার প্রস্তাব রাখেন। CSP-র পক্ষে শিবনাথ ব্যানার্জী অনুরূপ প্রস্তাব হোমির কাছে রেখেছিলেন কিন্তু কারোর প্রস্তাবে মানেক হোমি খুব উৎসাহ দেখাননি। ফলে লেবার ফেডারেশনের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ কুলটি-বার্ণপুর-হীরাপুরে ইস্পাত শ্রমিকদের মধ্যে অব্যাহত থাকে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত হোমির লেবার ফেডারেশনই ঐ অঞ্চলের আরো কয়েকটি ধর্মঘটের নেতৃত্ব দেন। যদিও হীরাপুর এলাকায় হোমির প্রভাব হ্রাস পেতে শুরু করেছিল। কারণ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ফেডারেশনের সমঝোতা বহু শ্রমিকের মনঃপুত ছিল না।[৯০] যুদ্ধ-মধ্যবর্তীকালে অবশ্য আসানসোল লৌহ কারখানায় বঙ্কিম মুখার্জীর উদ্যোগে CPI-এর প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

৯. ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে শ্রমিক-আন্দোলন

বাঙলার উল্লেখযোগ্য একটি শিল্পক্ষেত্র ছিল ইঞ্জিনিয়ারিং প্রতিষ্ঠানগুলি। মূলত কলকাতার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে হাওড়া এবং উত্তর চব্বিশ পরগণায় ছোট বড় মাঝারি নানা ধরণের ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পপ্রতিষ্ঠান প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে দ্রুত বিস্তারলাভ করে। তবে এর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল দক্ষ-অদক্ষ শ্রমিকদের অধিকাংশই ছিলেন অবাঙ্গালী, প্রধানত হিন্দী ভাষী। স্বদেশী আন্দোলনের সময় থেকে ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিতে বিভিন্ন দাবী ভিত্তিক শ্রমিক ধর্মঘটের বিষয় জানা যায়। অসহযোগ আন্দোলনের সময়েও ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে শ্রমিক ধর্মঘটের তথ্য আছে।[৯১]

১৯৩৭ সাল থেকেই অবশ্য সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলন ও ধর্মঘটের ধারাবাহিক তথ্য ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের ক্ষেত্রে পাওয়া যায়। এই শ্রমিক আন্দোলনগুলির পরিচালনায় যেমন কংগ্রেস স্যোস্যালিস্ট পার্টির নেতৃত্বের সক্রিয় ছিলেন, এইরকম সক্রিয়তা কমিউনিস্ট পার্টি প্রভাবিত বেঙ্গল লেবার পার্টির ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীদেরও ছিল। সৌমেন ঠাকুরপন্থী ওয়ার্কার্স লীগেরও কিছু ভূমিকা এক্ষেত্রে দেখা যায়। ১৯৩৭-এর এপ্রিল মাসে চটকল শ্রমিক ধর্মঘট চলাকালীন সময় উত্তর চব্বিশ পরগণার টিটাগড়ের ব্রিটানিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপে প্রায় ১০০০ কর্মী তাদের দীর্ঘদিনের দাবীসমূহের সমর্থনে ২০ এপ্রিল থেকে ৫ মে পর্যন্ত ধর্মঘট করে। এই কারখানাতেই জুলাই মাসে শ্রমিক ছাঁটাই এর প্রতিবাদে পুনরায় কিছুদিনের জন্য ধর্মঘট করা হয়।[৯২] ১৯৩৮-এর ২১ এপ্রিল ব্রিটানিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানীর হাওড়াস্থিত লিলুয়া কারখানার প্রায় ২০০ শ্রমিক কয়েকজন সহকর্মীর বরখাস্তের বিরুদ্ধে ধর্মঘট করে। শ্রমিকনেতা ও বিধায়ক শিবনাথ ব্যানার্জীর মধ্যস্থতায় ৩ মে বরখাস্ত শ্রমিকদের ভবিষ্যতে কাজে ফিরিয়ে নেবার প্রতিশ্রুতি মালিকদের কাছ থেকে পেয়ে শ্রমিকরা কাজে ফিরে যায়। ঐ বছরই নভেম্বরে হাওড়ার ইঞ্জিনিয়ারিং শ্রমিকদের ধর্মঘট ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। একটি কারখানায় কাজের সময় শ্লোগান দেবার অভিযোগে ৪০ জন শ্রমিককে বরখাস্ত করা হয়। এর প্রতিবাদে পার্শ্ববর্তী প্রায় ১৫টি ছোট কারখানার প্রায় ৭০০ শ্রমিক ধর্মঘটে সামিল হয়, শিবনাথ ব্যানার্জীর পরিচালনাধীন 'হাওড়া আয়রণ ফ্যাক্টরী ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন' এই ধর্মঘটের নেতৃত্ব দিয়ে এর সঙ্গে বার্ষিক সবেতন ছুটি, রবিবার ছুটির দিন, স্বেচ্ছাচারী ছাঁটাই বন্ধ করা প্রভৃতি দাবী যুক্ত করে আন্দোলন জোরদার করলে সরকার ১৪৪ধারা জারী করে। ১৫ নভেম্বর কলকাতার এ্যালবার্ট হলে হাওড়ার ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে ধর্মঘটী শ্রমিকদের সমর্থনে BPTUC-র উদ্যোগে মৃণালকান্তি বসুর সভাপতিত্বে একটি সভা হয় যাতে সরকার ও মালিকপক্ষের দমননীতির তীব্র নিন্দা করা হয়েছিল।[৯৩] অবশ্য কিছুকালের মধ্যেই এই ধর্মঘটের অবসান ঘটে। হাওড়ার ১৯৩৯-এর সেপ্টেম্বরে অপর একটি স্বল্পস্থায়ী কিন্তু উল্লেখযোগ্য ধর্মঘট হয়েছিল বার্ণ কোম্পানীতে। কলকাতায় ১৯৩৯-এর মার্চ মাসে ইন্টালীর স্যা ভী ফারমার কারখানায় ৯ জুন শ্রমিকের বরখাস্তের প্রতিবাদে প্রায় ৬০০ শ্রমিক ধর্মঘট করে।[৯৪]

বস্তুতপক্ষে ১৯৩৯-এর সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ার পরে সামরিক গুরুত্বপূর্ণ ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে যাতে কোন শ্রমিক অসন্তোষ দেখা না দেয় সেদিকে সরকারের তীক্ষ্ণ নজর ছিল। তা সত্ত্বেও যুদ্ধের প্রথম দিকে বেশ কিছু ধর্মঘট ঘটেছিল। ডিসেম্বরে বালীগঞ্জের [illegible] আয়রণ ও স্টীল ফ্যাক্টরীতে এবং ব্রিটিশ ইন্ডিয়া আয়রণ স্টিল ওয়ার্কস্-এ শ্রমিক ধর্মঘট হয়। এই সময় কমিউনিস্ট পার্টির নীতি ছিল সরকারের যুদ্ধ প্রচেষ্টায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করা। তবে সমস্ত ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের শ্রমিকদের একটি কেন্দ্রীয় ইউনিয়নের অধীনে এনে কেন্দ্রীয় ভাবে শ্রমিক ধর্মঘট বিভিন্ন দাবীর ভিত্তিতে শুরু করার পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু যেহেতু ১৯৪২ সালের পূর্বে ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে কমিউনিস্ট প্রভাব ছিল খুবই কম সেহেতু ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে কমিউনিস্ট প্রচেষ্টা শেষ পর্যন্ত সফল হয়নি। এছাড়া কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে তাদের সংগঠন থেকে বেরিয়ে আসা নীহারেন্দু দত্ত মজুমদারের লেবার পার্টি এবং শিবনাথ ব্যানার্জীর নেতৃত্বাধীন ইউনিয়নগুলির অসহযোগিতাও কমিউনিস্ট প্রয়াসে বাধার সৃষ্টি করেছিল।

১০. রেলশ্রমিক আন্দোলন

দেশের একটি প্রধানতম সংগঠিত শ্রমিকদের প্রতিষ্ঠানরূপে রেলশ্রমিকরা প্রথমাবধি জাতীয়তাবাদী, অকমিউনিস্ট বাম এবং কমিউনিস্ট দলসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক গোষ্ঠীরই মনযোগের কেন্দ্রবিন্দু ছিল। ফলে বাঙলার বিভিন্ন রেলপথে শুধু বিভিন্ন ইউনিয়নই গড়ে ওঠেনি, ইউনিয়নগুলির ওপর আধিপত্য বিস্তারের সংঘাতও নানা ক্ষেত্রে তীব্র হয়ে উঠেছিল। যেমন ১৯৩০ এর সূচনাতে 'আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ে এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশনের' প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে কমিউনিস্টদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 'ইস্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ে ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন'।

ইতিপূর্বে ১৯৩৬-৩৭ সালে সংগঠিত বেঙ্গল নাগপুর রেলপথের শ্রমিকদের ধর্মঘটের উল্লেখ করা হয়েছে। ১৯৩৯ সালের মাঝামাঝি থেকে আসাম বেঙ্গল রেলপথে বিরাট বিরাট শ্রমিক সংগ্রাম সংগঠিত হয়েছিল। আসাম-বেঙ্গল রেললাইনের শ্রমিকরা তের ঘণ্টা কাজ করতেন। তাঁদের ছুটি বাসস্থান কিছুই ছিল না। স্টেশন মাস্টার, পয়েন্টসম্যান, রেল ইয়ার্ডের শ্রমিক—সকলের উপরেই জুলুম চলছিল, রেলে বিভিন্ন দলের ইউনিয়ন থাকায় ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের অসুবিধা হয়। ১৯৩৮ সালের অক্টোবর মাসেই জে. এন. গুপ্তর (এম. এল. এ.) বেঙ্গল-আসাম রেলরোড ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন এবং এ. বি. আর. ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন ঐক্যবদ্ধ হয়ে যায়। কিন্তু ময়মনসিংহের এ. বি. আর. এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন কোনোমতেই এক হতে চাইল না। এ. বি. রেলের শ্রমিকরা ইউনিয়নের মাধ্যমে পাহাড়তলা, আখাউড়া, বদরপুর প্রভৃতি স্থানে সভা করেন। আট ঘণ্টা কাজের দিন, একদিন ছুটি, কোয়ার্টার, বেতন পাশ, প্রভিডেন্ট ফাণ্ড, চিকিৎসা প্রভৃতি দাবীতে প্রচার শুরু হয়। এই আন্দোলনে সঙ্গে সঙ্গে স্বভাবতই এই ইউনিয়ন 'অল ইণ্ডিয়া রেলওয়েমেন্স ফেডারেশনের' অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। এর সঙ্গে ই. বি. রেলওয়ে ওয়ার্কার্স ইউনিয়নও যুক্ত হয়। ১৯৩৯ সালে শেষ তিনমাস রেলের সমস্ত

কেন্দ্রে শিয়ালদহ, কাঁচরাপাড়া, সৈয়দপুর, লালমনির হাট, মাল, দোমহনী, পাণ্ডু, লামডিং প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে ইউনিয়নের কাজ শুরু হয়।[৩৬]

বাঙলার অন্যান্য শিল্প ধর্মঘট ও শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে রেলশ্রমিক আন্দোলনের একটি বিশেষ পার্থক্য ছিল যে বাঙলার রেলশ্রমিকদের সংগঠনসমূহ এবং আন্দোলনগুলির সঙ্গে সর্বভারতীয় রেলশ্রমিক সংগঠনের নিবিড় যোগসূত্র ছিল। ফলে তা একটি জাতীয় চরিত্র অর্জন করতে সমর্থ হয়। ১৯৩৯-এর ২১শে আগস্ট 'অল ইন্ডিয়ার রেলওয়েমেন্স ফেডারেশনের ডাকে' সারাভারত জুড়ে রেলকর্মচারীদের দাবী দিবস পলিত হয়। রেলওয়ে বোর্ডের কাছে বেতন বৃদ্ধি, ছাঁটাই বন্ধ, ছুটি, কাজের সময় কমানো প্রভৃতি ৭ দফা দাবী পেশ করা হয় এবং সর্বভারতীয় ক্ষেত্রসহ বাঙলাতেও এর সপক্ষে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। কংগ্রেস সভাপতিরূপে সুভাষ রেলওয়ে শ্রমিকদের দাবীর সমর্থনে বিবৃতি দেন।[৩৭] এইভাবে কার্যত রেলশ্রমিক আন্দোলন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সংযুক্ত হয়ে ওঠে।

১১. কলকাতা ট্রাম-শ্রমিক আন্দোলন

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরুর প্রাক্কালে কলকাতায় নিষিদ্ধ কমিউনিস্ট পার্টির ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠকদের প্রভাব যে দুটি ক্ষেত্রে বিশেষভাবে ছিল তা হল ব্রিটিশ কোম্পানী পরিচালিত ট্রাম পরিবহণ সংস্থা এবং কলকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন (CESC)। এর মধ্যে ১৯৩০-এর দশকের সূচনা থেকেই কমিউনিস্টদের প্রভাব ট্রাম শ্রমিকদের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। তৎকালীন সরকারী নথিপত্র থেকে জানা যায় যে কলকাতা ট্রাম-শ্রমিক ইউনিয়নকে নিয়ন্ত্রণ করতো ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কলকাতা কমিটি। রেড ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সঙ্গে এই ইউনিয়নের ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র ছিল।[৩৮] এই সময় ট্রাম শ্রমিকদের মধ্যে সংগঠন করতেন সোমনাথ লাহিড়ী ও মহম্মদ ইসমাইল। এদের নেতৃত্বে ১৯৩৪-এর ডিসেম্বরে ট্রাম শ্রমিকদের একটি ধর্মঘট হয়েছিল। এরপর ১৯৩৭ সালের নভেম্বর থেকে যখন আন্দামান সহ বিভিন্ন কারাগার থেকে সশস্ত্র বিপ্লববাদী রাজবন্দীরা মুক্তি পেয়ে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগাদান করেন তখন থেকে ট্রাম শ্রমিকদের মধ্যেও নতুন করে সংগঠন করার উদ্যোগ শুরু হয়।

১৯৩৯-এর ফেব্রুয়ারী মাসে ট্রাম কোম্পানীর মেরামতি বিভাগের অস্থায়ী বিভাগের ৫০ জনকে কোম্পানী অকস্মিকভাবে ছাঁটাই করে। এর প্রতিবাদে সকল অস্থায়ী শ্রমিকই (PWD বিভাগ) ১৪ ফেব্রুয়ারী থেকে ধর্মঘট শুরু করে। কলকাতা ট্রাম শ্রমিক ইউনিয়নের পক্ষ থেকে তৎক্ষণাৎ এই ধর্মঘটকে সমর্থন জানানো হয়, কারণ ছাঁটাই হওয়া এই ৫০ জন অস্থায়ী শ্রমিক ট্রাম ইউনিয়ন গড়ার কাজে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিল বলেই তাদের বিরুদ্ধে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। শ্রমিক নেতা অধ্যাপক মৃণালকান্তি বসুর বিবরণ থেকে জানা যায় যে ট্রাম শ্রমিকদের এই অন্দোলনকে BPTUC সহ বাঙলার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির পক্ষে সুভাষচন্দ্র

বসু সক্রিয় সমর্থন করেছিলেন। বেশ কিছুদিন ধরে ধর্মঘট চলার পর, ৩রা মার্চ কলকাতায় নাগরিক কমিটি একটি সভায় মিলিত হয়ে সিদ্ধান্ত নেয় যে ট্রাম কোম্পানী যদি PWD শ্রমিকদের দাবীগুলি উপেক্ষা করতে থাকে তবে কলকাতার জনসাধারণ ট্রাম বয়কট করবে। ৪মার্চ ট্রাম ইউনিয়ন একটি সভায় সিদ্ধান্ত নেয়, কোম্পানী যদি শ্রমিকদের দাবীগুলি মেনে না নেয় তবে সমস্ত বিভাগের ট্রাম শ্রমিক লাগাতার ধর্মঘট শুরু করবে।

শ্রমিকদের এবং জনসাধারণের চাপের মুখে কোম্পানী নীতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়। ৭ মার্চ ঘোষণা করে যে ৫০ জন ছাঁটাই শ্রমিককে কাজে ফিরিয়ে নেওয়া হবে এবং শীঘ্রই সমস্ত PWD শ্রমিককে চাকুরীতে বহাল করা হবে। ৮ মার্চ PWD শ্রমিকরা ধর্মঘট তুলে নেন ও কাজে যোগ দেন। এই ধর্মঘটের ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ এর সাফল্য ইউনিয়নের নেতা, কর্মী এবং সাধারণ শ্রমিকদের মধ্যে একটা আত্মবিশ্বাস এনে দিয়েছিল। এই আত্মবিশ্বাসকে পুঁজি করে তাঁরা চল্লিশের দশকে ট্রাম শ্রমিক ইউনিয়নকে কলকাতা তথা বাঙলার সব থেকে সংগঠিত ও সচেতন শ্রমিক ইউনিয়নে পরিণত করতে পেরেছিলেন।[৯৯] কমিউনিস্টদের দ্বারা পরিচালিত ট্রাম শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে জাতীয় আন্দোলনের যোগসূত্র এইভাবেই একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরিণত হয়। যে সময় বিভিন্ন ওয়ার্কশপের শ্রমিক কর্মচারীরা কাজের সময় ইউনিয়নের নেতাদের সঙ্গে পর্যন্ত বাক্যালাপে ভীত হতেন, সেই কঠিন সময় কমিউনিস্ট সংগঠকরা নোনাপুকুর ওয়ার্কশপে বা বেহালার ব্রাহ্মসমাজ রোড কিংবা বালিগঞ্জের ডোভার লেনের শ্রমিক মেসে গিয়ে ট্রাম শ্রমিকদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করতেন, তাদের সঙ্গে বিভিন্ন অভাব-অভিযোগ নিয়ে আলাপ-আলোচনা সংগঠিত করতেন এবং তাদেরকে নিয়ে ওয়ার্কশপ কমিটি, ডিপো কমিটি প্রভৃতি গঠন করতেন। এর ফলে দেখা যায় মাত্র চার মাসের মধ্যে (অক্টোবর ১৯৩৮) থেকে জানুয়ারী ১৯৩৯ খ্রীঃ ট্রাম শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্য সংখ্যা ২৩৫ থেকে বেড়ে ২০০০ হয়েছিল।[১০০]

১২. অসংগঠিত শিল্পক্ষেত্র ও নানা আন্দোলন প্রচেষ্টা

সংগঠিত এই সকল শিল্পক্ষেত্রের বাইরে বিভিন্ন স্থানে কর্মরত বহু অসংগঠিত শ্রমিক ছিল, যেমন বড়বাজারের মুটিয়া মজদুর বা পুস্তক ব্যবসায়ে শ্রমিক কর্মচারী কিংবা বিভিন্ন ছাপাখানায় কর্মরত প্রেস কর্মচারী এবং সওদাগরী অফিসের মেধাশ্রমে নিযুক্ত কর্মচারীবৃন্দ (White colar labour)। ১৯৩৭-৩৯ সময়কালে বিভিন্ন প্রকার ধর্মঘট ও দাবীভিত্তিক শ্রমিক আন্দোলনের একটা জোয়ার সৃষ্টি হয়েছিল। বিভিন্ন পেশার সঙ্গে যুক্ত শ্রমজীবি মানুষ এই সময় অধিকার অর্জনের দাবীতে নিজ নিজ ক্ষেত্রে আন্দোলন সংগ্রাম শুরু করে। কিন্তু দেখা গেছে যেহেতু এই সকল শ্রমিকদের মধ্যে বামপন্থী বা কমিউনিস্ট প্রভাব ছিল অকিঞ্চিৎকর এবং সুরেশচন্দ্র ব্যানার্জীর নেতৃত্বাধীন গোড়া গান্ধীবাদী BLA-র প্রভাবই ছিল অধিক, সেইহেতু এই সকল ক্ষেত্রে শ্রমিক আন্দোলন আশানুরূপ সাফল্যে পৌছাতে পারেনি। তৎকালীন সময়ের অন্যতম

শ্রমিক নেতা অধ্যাপক মৃণালকান্তি বসুর স্মৃতিকথা থেকে প্রতীয়মান হয় যে অসংগঠিত শ্রমিকদের আন্দোলনে নেতৃবৃন্দ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতার কারণে মালিকদের সঙ্গে (প্রধানত ধনী দেশীয় ব্যবসায়ী গোষ্ঠী) আপোস-রফার পথ ধরেছিল এবং অসংগঠিত অংশের শ্রমিক কর্মচারীদের রুটি রুজির আন্দোলনে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছিল।[১০১] বড়বাজার এলাকার মুটে মজদুরদের আন্দোলন সংক্রান্ত এক গবেষণা থেকে দেখা যায় BLA প্রথমে এই মজদুরদের সংগঠিত করে আন্দোলনের প্রক্রিয়া শুরু করলেও পরবর্তী ক্ষেত্রে মালিক পক্ষ অর্থাৎ 'মাড়ওয়ারী' ব্যবসায়ীদের কাছে আত্মসমর্পণ করে এবং আপোস রফায় আসে।[১০২] এর ফলে মজদুরদের কোনো লাভ বা প্রাপ্তি তো হয়ই না, বরঞ্চ মালিকদের দমন-পীড়নের সম্মুখীন তাদের হতে হয়। তথাপি অসংগঠিত শ্রমিক কর্মচারীদেব এই আন্দোলন প্রচেষ্টাগুলি ছিল সে সময়কার শ্রমিক আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য সংযোজন। বিচ্ছিন্নভাবে কোথাও কোথাও কমিউনিস্ট কর্মীরা এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও সংগঠনগতভাবে তাদের প্রভাব এই সকল ক্ষেত্রে স্বাধীনতার পূর্বে সেরকম দৃষ্টিগোচর হয়নি।

এগুলি ছাড়া শ্রমিক আন্দোলনের আরো দুটি ক্ষেত্র ছিল ডক বা বন্দর শ্রমিক এবং চা বাগিচার শ্রমিক। উত্তরবঙ্গের চা বাগিচা শ্রমিকরা ১৯৪০-এর দশকের পূর্বে সংগঠিত হয়ে উঠতে পারেনি। কিন্তু আসামের শ্রীহট্ট বা সুরমা উপত্যকা এলাকায় ১৯৩৫-এর ডিসেম্বরে শ্রীহট্ট জেলা কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হবার কিছু কালের মধ্যেই ঐ অঞ্চলের লক্ষাধিক চা শ্রমিকদের সংগঠিত করে বিভিন্ন দাবীর ভিত্তিতে আন্দোলনের কাজ কমিউনিস্টরা শুরু করেছিল। ১৯৩৮ সালে বারীন দত্তকে সম্পাদক করে সিলেট-কাছাড় চা বাগানে 'মজদুর ইউনিয়ন' গঠন করা হয়। প্রধানত মজুরি বৃদ্ধি, কাজের সময় হ্রাস, নারী শ্রমিকদের মর্যাদা রক্ষা, জবরদস্তি শ্রমিক ছাঁটাই রোধ, চিকিৎসার সুব্যবস্থা প্রভৃতি দাবীগুলি অগ্রাধিকার পায়। ১৯৩৮-৩৯ সময়কালে এই অঞ্চলের হাইলাকান্দির মনছহারা বাগানে, শিলচরের নিকটবর্তী ভরখাই চা বাগানে এবং অরুণাবন্দ চা বাগানে (এখানে ৪৫ দিন লাগাতার ধর্মঘট হয়েছিল ১৯৩৯-এর ১০ এপ্রিল থেকে) চা-বাগিচা শ্রমিক ধর্মঘট হয়।

তবে কলকাতা বন্দর শ্রমিকদের মধ্যে শ্রমিক সংগঠন থাকলেও তাতে কমিউনিস্টদের প্রভাব তুলনামূলকভাবে কম ছিল। বন্দর শ্রমিকদের মধ্যে খিদিরপুর ও গার্ডেনরীচ এলাকায় মুসলিম লীগ বিশেষত সুহ্‌রাবর্দীর পৃষ্ঠপোষকতায় লীগ সরকার সমর্থক অমুসলিম শ্রমিকদের নিয়ে যে 'কালো ঝাণ্ডা' ইউনিয়ন গড়ে উঠেছিল কমিউনিস্ট শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্যদের প্রায়শই তাদের হিংসাত্মক আক্রমণ প্রতিরোধ করে কাজ করতে হত। এই সময় বন্দর শ্রমিকদের মধ্যে প্রায় ৯ হাজার মুসলমান (প্রধানত বিহার ও যুক্তপ্রদেশের) ও প্রায় ৫ হাজার হিন্দু শ্রমিক (প্রধানত উড়িষ্যাবাসী) ছিল। উর্দুভাষী অধিকাংশ মুসলমান শ্রমিকদের মধ্যেই লীগ-ইউনিয়নের প্রভাব ছিল। তা সত্ত্বেও মনোরঞ্জন রায়, সত্য গুপ্ত (চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহ খ্যাত),

মহম্মদ ইউসুফ, অন্ধ্রনিবাসী শ্রীনারায়ণ, আব্দুল রহমান খান, বিশ্বনাথ দুবে প্রমুখ কমিউনিস্ট কর্মীরা বন্দর শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করতেন। এদের অধিকাংশই বেঙ্গল লেবার পার্টির সদস্য ছিলেন; কিন্তু তখন কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যরূপেই তাঁরা ডক শ্রমিকদের মধ্যে সক্রিয়ভাবে কাজ করতেন। মনোরঞ্জন রায় লিখেছেন, ডক শ্রমিকদের মধ্যে কমিউনিস্টদের নানা প্রতিকূলতার মধ্যে শক্তি বৃদ্ধি র একটি উদাহরণ ছিল নাবিকদের সংগঠন Sea-mens Union-এর সভাপতি আখতার আলীকে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে খিদিরপুরের তক্তাঘাটে ১৯৩৮-এর ১২ জুন প্রায় ২০ হাজার বন্দর শ্রমিকের বৃহত্তম সমাবেশ।[১০৩]

উপসংহার

বাঙলার শ্রমিক আন্দোলন ছিল সেইসময় সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রদেশে বিশেষত বোম্বাই এবং মাদ্রাজে যে সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলন বিভিন্ন শিল্পক্ষেত্রে চলছিল—তারই অংশ। AITUC-র উদ্যোগে ১৯৩৭-৩৯ সময়কালে কানপুর, বোম্বাই ও আমেদাবাদের বস্ত্রশিল্প ও সূতাকল শিল্প, বিহারের জামসেদপুরের ইস্পাতশিল্পসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে শ্রমিক ধর্মঘটের জোয়ার সৃষ্টি হয়েছিল। বাঙলায় হক-লীগ সরকার প্রধানত কমিউনিস্ট-সোশ্যালিস্ট-বামপন্থীদের নেতৃত্বে পরিচালিত শ্রমিক আন্দোলন ও ধর্মঘটগুলির প্রতি যে কঠোর মনোভাব গ্রহণ করেছিল, কংগ্রেসের মন্ত্রিসভা শাসিত অন্যান্য প্রদেশগুলিতে বিভিন্ন শ্রমিক বিক্ষোভ আন্দোলন ও ধর্মঘটের প্রতি কংগ্রেস সরকার তার থেকে কম কিছু দমনমূলক নীতি গ্রহণ করেননি। তথাপি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণী বিশেষত যারা সংগঠিত শিল্পে নিযুক্ত ছিল—তারা তাদের শ্রেণীচেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছিল এই সময়পর্বের সংগ্রামগুলির মধ্যে দিয়ে। নিঃসন্দেহে বাঙলা ছিল এই শ্রমিক জাগরণের শীর্ষে। এরপরেই স্থান দেওয়া যায় বোম্বাইকে। বোম্বাইতে শুধুমাত্র ১৯৩৭ সালে মোট ৮৮টি ধর্মঘট সংগঠিত হয়। যাতে যুক্ত ছিল ১,০৯,৮৫৮ জন শ্রমিক। মোট শ্রমদিবস নষ্ট হয়েছিল ৮,৭৭,২১১টি। এর পরেই ছিল মাদ্রাজের স্থান যেখানে ৬০, ৯৮০ জন শ্রমিক ৬১টি ধর্মঘটে ঐ বছর অংশ নিয়েছিল। শ্রমিকদিবস নষ্ট হয়েছিল ৬,৫৬,৪০৪টি। যুক্তপ্রদেশ (UP) ১৫টি ঘর্মঘটে ৬৩,৩৫০ জন শ্রমিক, বিহারে ১৪টি, পাঞ্জাবে ১৪টি এবং মধ্যপ্রদেশে ৫টি ধর্মঘটে মোট প্রায় ২,৫০,০০০ শ্রমদিবস নষ্ট হয়। এছাড়াও দক্ষিণ ভারতে ব্যাঙ্গালোর, পণ্ডিচারী কোয়েম্বাটুর, এবং মাদুরাইতেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে শ্রমিকরা ধর্মঘট করে।[১০৪]

১৯৩৯ সালে সারা ভারতে শ্রমিক অসন্তোষ ও ধর্মঘটের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল। বিশেষ করে বোম্বাইতে প্রস্তাবিত শিল্পবিরোধ আইন (Industrial Disputes Bill) যা কংগ্রেস মন্ত্রিসভা চালু করেছিল তার বিরুদ্ধে ৯০,০০০ শ্রমিক ঐতিহাসিক ধর্মঘটে যোগ দেয়। দেশের অন্যত্র এই শ্রমিক আন্দোলনের গতি অব্যাহত থাকে। শুধুমাত্র সংগঠিত শিল্পে নয় ক্ষুদ্র এমনকি অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকরাও এই সময় ধর্মঘটে অংশ নিয়েছিল। তার

মধ্যে হকার থেকে শুরু করে দোকান কর্মচারী, রিক্সাচালক এমনকি বিড়ি শ্রমিকরাও ছিল। দেখা গেছে যে ১৯৩৭ সালে মোট যে ৩৯৭টি ধর্মঘট হয়েছিল তার মধ্যে ১৪৩টি ধর্মঘট এই জাতীয় অসংগঠিত ক্ষেত্রে হয়।[১০৫]

যাই হোক ১৯২৮-২৯ সালে অনুষ্ঠিত শ্রমিক ধর্মঘটগুলির সঙ্গে উক্ত শ্রমিক আন্দোলনের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য ছিল এই যে দশ বছরে ভারতের শ্রমিকশ্রেণী উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক চেতনা ও শক্তি অর্জন করতে সমর্থ হয়েছিল। ১৯২৮-২৯-এ তাদের ভূমিকা ছিল মূলত আত্মরক্ষামূলক। ছাঁটাই বা মজুরি-হ্রাস রোধ করাই ছিল তাদের লক্ষ্য। কিন্তু ১৯৩৭-৩৯-এ মজুরি বৃদ্ধি ও বোনাসসহ অন্যান্য দাবীগুলি ছিল প্রধান। ১৯৩৭-৩৮ এই দুই বছরে মোট প্রায় ৪৫০টি ধর্মঘট হয়েছিল এই দাবীতে।

দ্বিতীয় পার্থক্য ছিল ১৯২৮-২৯-এ কংগ্রেস বা মুসলিম লীগের মত জাতীয় দলগুলির পূর্ণসমর্থন ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণী পেয়েছিল। কিন্তু ১৯৩৭-৩৯ সময়কালে শ্রমিকশ্রেণীকে এদের বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়। কংগ্রেস বা অকংগ্রেসী প্রাদেশিক সরকারগুলি যে এই সময় শ্রমিক আন্দোলনের প্রতি বৈরিতামূলক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেছিল তার অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে। এর অন্যতম কারণ ছিল শ্রমিকদের মধ্যে বামপন্থী ও কমিউনিস্টদের প্রভাব বৃদ্ধি। আরেকটি কারণ শ্রেণী-দৃষ্টিভঙ্গীতে এই আন্দোলনগুলির পরিচালনা।

এই কারণে জাতীয়তাবাদী, কংগ্রেস, এমনকি মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে শ্রমিক কমিউনিস্ট প্রভাব খর্ব করার উদ্যোগ দেখা যায়। কংগ্রেস চায়নি ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণীকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে একটি কার্যকরী অস্ত্ররূপে প্রয়োগ করতে। তারা শ্রেণী-সমঝোতার দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেছিল যা ব্রিটিশ-বিরোধী জাতীয় আন্দোলনকে সবল করার পরিবর্তে দুর্বল করে। গান্ধী প্রতিষ্ঠিত 'আমেদাবাদ মজদুর মহাজনের' অনুকরণে বল্লভভাই প্যাটেল AITUC-র বিকল্প কংগ্রেসী শ্রমিক সংগঠন গড়ে তুলতে উদ্যোগী হন।

১৯৩৮-এর এপ্রিলে এই কারণে গড়ে ওঠে গান্ধী সেবক সংঘ।[১০৬] বাঙলায় দীর্ঘদিন ধরে বেঙ্গল লেবার অ্যাসোসিয়েশন, অভয় আশ্রমের সঙ্গে যুক্ত থেকে এরই শরিক ছিল। এছাড়া বাঙলায় মুসলিম লীগ সরকারের শ্রমমন্ত্রী সুহ্‌রাবর্দীর উদ্যোগে লীগ অনুগত 'ন্যাশনাল চেম্বার অফ লেবার ইউনিয়ন' (White Union নামে পরিচিত) গড়ে তোলা হয়। এবং বাঙলার শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে বামপন্থী প্রভাব বিনষ্ট করার উদ্দেশ্যে সাম্প্রদায়িকতার বিভেদমূলক নীতি গ্রহণ করা হয়।

তথাপি বাঙলা তথা ভারতের এই সময়কালের শ্রমিক আন্দোলনগুলি ছিল জাতীয় আন্দোলনের অন্যতম অংশ। অতীতের মতোই বিভিন্ন জাতীয় প্রশ্নে অধিকাংশ শ্রমিক সংগঠন এবং AITUC সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী অবস্থানই গ্রহণ করত। রাজবন্দীদের মুক্তি, কমিউনিস্ট

পার্টির উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার, ব্রিটিশ প্রস্তাবিত ফেডারেশনের বিরোধিতাসহ নানা জাতীয় প্রশ্নে শ্রমিক ইউনিয়নগুলি সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেছিল। একটি ঔপনিবেশিক দেশে শোষণমূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে (যেখানে অধিকাংশ শিল্পেই বিদেশী পুঁজি নিয়োজিত ছিল) শ্রমিক জাগরণ যে দেশের মুক্তিসংগ্রামেরই একটি অন্যতম অংশ কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে অতি অল্প কয়েকজন জাতীয় নেতাই তা স্বীকার করতেন। এই কারণেই শ্রমিক আন্দোলনকে জাতীয় সংগ্রামের অংশ রূপে বিবেচনা করা হত না। মালিকপক্ষের স্বার্থরক্ষাই জাতীয় নেতৃত্বের কাছে অগ্রাধিকার পেয়েছিল। ভারতে ক্রমবর্দ্ধমান সাম্প্রদায়িকতার প্রতিষেধক রূপে শ্রমিকশ্রেণীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্পর্কে জাতীয় নেতৃত্ব কতখানি সচেতন ছিলেন সে সম্পর্কে প্রশ্ন আছে। শ্রমিক আন্দোলন তাই অনেকাংশেই উপেক্ষিত থেকে যায়। যদিও সুভাষচন্দ্র বসুর মতন কোন কোন জাতীয় নেতা শ্রমিকদের ব্যবহার করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন।

সাম্প্রতিককালে দু-একজন গবেষক শ্রমিক আন্দোলনে বহিরাগত (Outsider) নেতাদের ভূমিকা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছেন। যেমন দীপেশ চক্রবর্তী মনে করেন যে শ্রমিক আন্দোলনগুলির বৈশিষ্ট্য এই সময় (যেমন চটকল ক্ষেত্রে) ছিল অর্থনীতিবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। বৃহত্তর রাজনীতির সঙ্গে তার যোগাযোগ খুবই ক্ষীণ। এছাড়া শ্রমিক আন্দোলনগুলি অনেকাংশেই স্বতঃস্ফূর্ত নয়, উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া।[১০৭] কিন্তু এই বক্তব্যের প্রতিবাদে অন্য গবেষকরা দেখিয়েছেন যে বহিরাগত বা বুদ্ধিজীবি ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠকদের দ্বারা পরিচালিত হলেও তা শ্রমিক স্বার্থেরই অনুসারী ছিল এবং শ্রমিকশ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারাই তা পরিচালিত হয়েছিল বলে শ্রমিকরা তা গ্রহণ করতে দ্বিধা করেন।[১০৮] বস্তুত গ্রামশ্চিও শুধুমাত্র স্বতঃস্ফূর্ততাকে কোন আন্দোলনের একমাত্র চালিকা শক্তি রূপে স্বীকার করেননি। শ্রেণীচেতনার বিস্তারের সঙ্গেই বিষয়টি যুক্ত।[১০৯] এছাড়া শুধুই অর্থনীতিবাদের উপরেই বাঙলা তথা ভারতের শ্রমিক আন্দোলনগুলি এই সময় প্রতিষ্ঠিত ছিল না। জাতীয় রাজনীতির সঙ্গেও তার নিবিড় সম্পর্ক ছিল সে বিষয় পূর্বে আলোচিত হয়েছে। তবে কেউ কেউ ঐতিহ্যগত আনুগত্যের বা Primordial Loyalty-র যে চারিত্র শ্রমিকদের মধ্যে লক্ষ্য করেছেন তা সর্বাংশে অস্বীকার করা যায় না। ভারতীয় শ্রমিকরা সেই অর্থে মার্কস-কথিত ইউরোপীয় প্রোলেতারিয়েতের সমগোত্রীয় তখনও হয়ে উঠতে পারেনি—এতে কোন সন্দেহ নেই।

ফলে ধর্ম-জাতি-কৌম ইত্যাদির অস্তিত্ব শ্রমিক-আন্দোলনকে ব্যাহত করেছিল। বাঙলায় মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িক প্রচার শ্রমিকদের একেবারে প্রভাবিত করেনি এমন কথা বলা চলে না। বামপন্থী শ্রমিক আন্দোলন এবং শ্রমিকদের মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাব প্রাক-বিশ্বযুদ্ধ কালে নানাবিধ দমনপীড়ন ও প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও আরও প্রসারলাভ করতে পারত যদি মার্কসবাদী ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠকরা ঐক্যবদ্ধ ভাবে শ্রমিক আন্দোলনকে পরিচালনা

করতে পারতেন। কিন্তু বামপন্থীদের অভ্যন্তরীণ বিরোধ ১৯৩৮-এর অক্টোবরের পর তীব্র হতে শুরু হয় এবং বেঙ্গল লেবার পার্টি ও কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যেকার ঐক্য ও সংহতি ১৯৩৯ সালের মার্চে ত্রিপুরী কংগ্রেসের পর থেকে সম্পূর্ণতঃ ভেঙ্গে পড়ে।

লেবার পার্টির সদস্যরা শ্রমিকদের অর্থনৈতিক দাবী-দাওয়ার আন্দোলনকেই সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করতেন। তাদের বক্তব্য ছিল অর্থনৈতিক আন্দোলনকে রাজনৈতিক সংগ্রামের পথে নিয়ে যেতে হবে, কিন্তু তা সময় সাপেক্ষ বিষয়। যতদিন না পর্যন্ত শ্রমিকশ্রেণী নিজেরা সংগঠিত হচ্ছে ততদিন কোন রাজনৈতিক কর্মসূচী ও স্লোগান তাদের মধ্যে নিয়ে যাওয়া সঠিক হবে না। বলা বাহুল্য, CPI নেতৃত্ব কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক কোন স্তরেই লেবার পার্টির এই বক্তব্য গ্রহণ করেনি এবং তাদেরকে ক্ষতিকারক অর্থনীতিবাদী রূপেই চিহ্নিত করেছিল। তাছাড়া লেবার পার্টির সদস্যদের দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে CPI দল আদৌ শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি ছিল না। কারণ CPI-এর নেতৃত্ব পদে কোনো শ্রমিক ছিলেন না। পার্টি সদস্যদেরও অধিকাংশই ছিলেন মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে আগত। এই কারণে লেবার পার্টির পক্ষ থেকে কমিউনিস্ট পার্টিকে সংস্কারপন্থীরূপে চিহ্নিত করা হতে থাকে। অপরদিকে CPI নেতৃত্বের বক্তব্য ছিল যে তাদের নেতা ও দলীয় সদস্যরা মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবি হলেও শ্রেণীচ্যুত বা ডিক্লাসড হয়ে পার্টিতে এসেছেন, তারা যথেষ্ট বিপ্লবীচেতনা সমৃদ্ধ। অবশ্য এই বিষয়টি নিয়ে মতভেদ তেমন তীব্র হয়নি—কিন্তু তীব্র হয়ে উঠেছিল নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার, প্রমোদ সেন প্রমুখ BLP নেতাদের সঙ্গে কোনো কোনো CPI নেতার ব্যক্তিত্বের সংঘাত— যাকে এই বিচ্ছেদের অন্যতম কারণ বলে অনেকে মনে করেন।[১১০]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর বাঙলা তথা সমগ্র ভারতে ট্রেড ইউনিয়ন ও শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে এক ব্যাপক জোয়ার সৃষ্টি হয়েছিল। ১৯৩৯-৪১ সময় কালের শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে পূর্ববর্তীকালের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের কিছু চরিত্রগত পার্থক্য ছিল। প্রথমত, প্রাক্ যুদ্ধ পর্বের আন্দোলনে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী উপাদান যুদ্ধ পরবর্তীকালের মত এত প্রবল ছিল না। দ্বিতীয়ত, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে জনপ্রিয় প্রাদেশিক সরকার প্রতিষ্ঠিত থাকার ফলে শ্রমিক আন্দোলনগুলিকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলির প্রধানত কংগ্রেস-সরকারের তীব্র দমন পীড়নের সম্মুখীন হতে হচ্ছিল যার জন্য প্রত্যক্ষভাবে বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসকদের দায়ী করা যেত না। যেমন ১৯৩৮-এর নভেম্বরে বোম্বাইয়ের কংগ্রেস সরকার নিরস্ত্র সূতাকল শ্রমিকদের ওপর গুলিবর্ষণ করে এবং সর্দার প্যাটেল তাকে সমর্থন করেন।[১১১]

এই অস্বস্তিকর ও অনভিপ্রেত ঘটনা যুদ্ধকালীন সময়ে ঘটনার সম্ভাবনা ছিল না, কারণ ১৯৩৯-এর নভেম্বরের মধ্যে সবকটি প্রাদেশিক সরকার থেকে কংগ্রেস সরে গিয়েছিল। অবশ্য বাঙলার মতন মুসলিম লীগ শাসিত প্রদেশগুলিতেও শ্রমিক-দমন

অভিযান অব্যাহত ছিল। কিন্তু যেহেতু মুসলিম লীগ বৃটিশরাজের সহযোগীর অবস্থানেই ছিল তাই শ্রমিকশ্রেণীর ক্ষোভ বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে পরিচালনা করতে অসুবিধা হয়নি। তৃতীয়ত, যুদ্ধপূর্বকালে কমিউনিস্ট পার্টি (AITUC)-র মাধ্যমে শ্রমিক আন্দোলনে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করলেও বাংলা তথা ভারতের ট্রেড ইউনিয়নের ক্ষেত্রে নানা ধরনের বিভেদের অস্তিত্ব ছিল। ফলে কমিউনিস্টদের প্রাধান্য সামগ্রিক শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে অপ্রতিহত ছিল তা বলা চলে না। যেমন ১৯৩৮-৩৯ সালে নিবন্ধীকৃত মোট শ্রমিক ইউনিয়নের সংখ্যা পাওয়া যায় ৫৬২। যার মধ্যে AITUC ভুক্ত শ্রমিক ইউনিয়নের সংখ্যা ছিল মাত্র ১৮৮টি।[১১২]

কিন্তু ১৯৪০ সালে AITUC এবং ন্যাশানাল ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন (NTUF) সংযুক্ত হওয়ার পর AITUC-র প্রভাব বৃদ্ধি পায় এবং কার্যত ১৯৩৯-এ যুদ্ধ শুরুর পর থেকে সমগ্র ১৯৪০-১৯৪১ সাল ধরে বাঙলা, বিহার, যুক্তপ্রদেশ, মাদ্রাজ এবং বিশেষ করে বোম্বাইতে কমিউনিস্ট পার্টি এবং AITUC ভুক্ত অপরাপর বামপন্থী যুদ্ধ ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী দলগুলির প্রভাবই শ্রমিক আন্দোলনে ছিল সর্বাপেক্ষা অধিক। বস্তুত এমন অভিযোগও পরবর্তীকালে কোনো কোনো কমিউনিস্ট নেতা উত্থাপন করেছেন যে আলোচ্য সময়কালে ভারতীয় কমিউনিস্টদের (CPI) যখন সমগ্র সাম্রাজ্যবাদবিরোধী 'জনগণেরই নেতা' হয়ে ওঠার কথা তখন তারা শুধুমাত্র শ্রমিকশ্রেণীর নেতা রূপেই তাদের ভূমিকা সীমাবদ্ধ রেখে ছিল।[১১৩] এই বিতর্ক অবশ্য বারান্তরে আলোচিত হতে পারে—এখানে নয়।

নির্দেশিকা

১. সুমিত সরকার, *দ্য স্বদেশী মুভমেন্ট ইন বেঙ্গল, ১৯০৫-০৮ দিল্লী,* ১৯৭৩, ৫ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য এবং রজতকান্ত রায়, *সোশ্যাল কনফ্লিক্ট অ্যাণ্ড পলিটিকাল আনরেস্ট ইন বেঙ্গল,* দিল্লী, ১৯৮৪।

২. প্রেমসাগর গুপ্ত, *আ শর্ট হিস্ট্রি অব এ. আই. টি. ইউ. সি (১৯২০-৪৭)*; দিল্লী, ১৯৮০; পৃঃ ১৬৭।

৩. তদেব। এ. আই. টি. ইউ. সি.-র সদস্য সংখ্যা তখন (১৯২৯ সাল) ৫১টি ইউনিয়নের মোট ১,৮৯,৪৩৬ জন। এর অধিক সংখ্যক ইউনিয়নের অধিক সংখ্যার সদস্যই তখন আই. এফ. টি. ইউ-এর সঙ্গে গেলেও নাগপুর সম্মেলনের প্রতিনিধিদের মধ্যে (মোট ৯৩৮জন) যোশী-গিরি গোষ্ঠী ছিল সংখ্যালঘু। কার্যত এ. আই. টি. ইউ. সি. দ্বিধাবিভক্ত হয়েছিল। পৃঃ ১৫৮-৫৯।

৪. সুকোমল সেন, *ওয়ার্কিং ক্লাস অব ইণ্ডিয়া,* কলকাতা ১৯৭৯; পৃঃ ৩০৮-৩১৫।

৫. সুমিত সরকার, *মডার্ন ইণ্ডিয়া,* ম্যাকমিলান, ১৯৮৩; পৃঃ ২৮০-৮১।

৬. দ্রঃ বিমলানন্দ শাসমল, *স্বাধীনতার ফাঁকি*, কলকাতা, ১৯৬৭।

৭. রণেন সেন, *বাঙলায় কমিউনিস্ট আন্দোলনের সূচনাপর্ব*, পূর্বোক্ত; পৃঃ ৪২-৪৫। সেন এই ভাঙ্গনের জন্য সর্বতোভাবে কংগ্রেস নেতৃত্ব ও সুভাষচন্দ্র বসুকে দায়ী করেছেন। একজন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণও তিনি দিয়েছেন। হোম/পল/জি আই./ ফাইল নং ৭/২০/৩৪; পৃঃ ৭৩-এ সারদেশাইকে AITUC-র সহ সভাপতি (অন্যরা হলেন অ্যাণ্টনী, আব্দুল হালিম, বাদল গাঙ্গুলী) দেখানো আছে। সহঃ সম্পাদকরা ছিলেন পুরন্দর (বোম্বে), জয়মন্ত (নাগপুর), আব্দুল মোমিন ও অবনী চৌধুরী (বাঙলা)।

৮ রজনীপাম দত্ত, *ইণ্ডিয়া টু ডে*; কলকাতা, ১৯৮৩; পৃঃ ৪২৪।

৯. হোম/পল/জি. আই/ ফাইল নং ১০৯/১৯৩৪; দ্রঃ সুবোধ রায়; *কমিউনিজম ইন ইণ্ডিয়া*; ভল্যু-১; পূর্বোক্ত; পৃঃ ২৯৭।

১০. তনিকা সরকার, *ন্যাশনাল মুভমেন্ট অ্যাণ্ড পপুলার প্রোটেস্ট ইন বেঙ্গল*, ১৯২৮-৩৪। পি. এইচ. ডি থিসিস; দিল্লী ইউনিভার্সিটি, ১৯৮১, গ্রন্থ বেঙ্গল ঃ ১৯২৮-৩৪ — পলিটিক্স অব প্রোটেস্ট, ১৯৮৭।

১১. দ্রঃ ব্রাডলে-দত্ত, ট্রয়ার্ডস ট্রেড ইউনিয়ন ইউনিটি ইন ইণ্ডিয়া, *ইনপ্রেকর*, মার্চ ১৯৩৬।

১২. সুকোমল সেন; পূর্বোক্ত; পৃঃ ৩৪৮-৪৯।

১৩. সুকোমল সেন; পূর্বোক্ত; পৃঃ ৩৪৯-৫২ এবং ভি. বি. সিং (সম্পাদিত), *ইকনমিক হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া (১৮৫৭-১৯৫৬)*; দিল্লী।

১৪. ব্রাডলে ও পাম. দত্ত; *ট্রয়ার্ডস ট্রেড ইউনিয়ন ইউনিটি ইন ইণ্ডিয়া*; ইনপ্রেকর; ভল্যু-১৬; নং-১২; মার্চ ৭, ১৯৩৬।

১৫. রণেন সেন; পূর্বোক্ত; পৃঃ ২৯।

১৬. Jawharlal Nehru, *Press Statement, Amrita Bazar Patrika*, July 1, 1937.

১৭. নির্বাণ বসু, শ্রমিক আন্দোলনের পরবর্তী অধ্যায় (১৯৩৭-৪৭), নরহরি কবিরাজ সম্পাদিত অসমাপ্ত বিপ্লব *ঃ অপূর্ণ আকাঙ্খা*; কলকাতা, ১৯৯৭, পৃঃ ১৭৩-৭৪।

১৮. নির্বাণ বসু, তদেব এবং R. P. Dutta, *India Today*, Calcutta, 1983.

১৯. মনোরঞ্জন রায়, *সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রাম ও শ্রমিক আন্দোলন*; কলকাতা, ১৯৮৭, পৃঃ ৫৬-৫৮।

২০. Sukomal Sen, *Working Class of India*, Cal, 1977, pp. 369-70.

২১. মনোরঞ্জন রায়, পূর্বোক্ত; পৃঃ ৫৮।

২২. R. P. Dutt, *India Today,* Calcutta, 1983 (New ed). pp. 429-30

২৩. Sumit Sarkar, *Modern India,* Delhi, 1983, p. 361

২৪. R. P. Dutta, *India Today,* op. cit. pp. 491-92.

২৫. Sukomal Sen, *The Working Class of India : History of Emergence and Movement, 1830-1970;* Calcutta, 1977. p. 222.

২৬. Nirban Basu, *Politics and Protest, 1937-47 : A Comparative Study of four major industries in Bengal;* Calcutta, 2002; p. 15.

২৭. অমিতাভ চন্দ্র, *অবিভক্ত বাঙলায় কমিউনিস্ট আন্দোলন : সূচনাপর্ব,* কলকাতা, ১৯৯২; পৃঃ ১৭৮-৮০

২৮. সরোজ মুখার্জি, *ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও আমরা, প্রথম খণ্ড,* কলকাতা, ১৯৮২; পৃঃ ৯৬ রণেন সেন, *বাংলায় কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের প্রথম যুগ,* ১৯৩০-৪৮; পূর্বোক্ত; পৃঃ ৯৩ এবং অমিতাভ চন্দ্র; পূর্বোক্ত; পৃঃ ১৮৫-৮৬

২৯. Nirban Basu, *The Political Parties and the Labour Politics, 1937-47,* Calcutta, 1992.

২৯ক. সরোজ মুখার্জি; পূর্বোক্ত; পৃঃ ১৩১; রণেন সেন; পূর্বোক্ত; পৃঃ ১৪১ এবং অমিতাভ চন্দ্র; পৃঃ ১৮৬-৬৭। ১৯৩৯এ জুলাইতে প্রতিষ্ঠিত বলশেভিক পার্টির সাধারণ সম্পাদক প্রমোদ সেন কিন্তু BLP-র সাধারণ সম্পাদক ছিলেন নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার। দ্র. *National Front,* vol. II, No. 29; Sept.3; 1939 Bombay; p. 462.

৩০. Special Branch Report; Calcutta Police Archives; F. No. 529/35; *Report on Communism in Calcutta* by the D.I.G; S. B. dtd 9-4-1936.

৩১. সাক্ষাৎকার, রণেন সেন; জুলাই, ১৯৯৪।

৩২. S. B. File No. 502/1936 UoN 501/1938; op. cit. Police Archives.

৩৩. *Forward* (Weekly), March 11 & 18, 1939; 'Relation of class forces in the Indian Struggle : Task of the working class' by Sudhin Pramanik.

৩৪. *Amrita Bazar Patrika;* 9-2-1939.

৩৫. Nirban Basu; op. cit. p. 81.

৩৬. Kamaruddin Ahmed, *Labour Movement in East Pakistan;* Dacca, 1969; p. 25.

৩৭. Suhrawardi's speech at the 3rd Session of the Bengal Labour Conference on April 18, 1937; vide *Amrita Bazar Patrika;* 19-4-1937.

৩৮. *Ibid.*

৩৯. *Intelligence Branch File No. 506/38* dtd 8-4-1938 and 4.5.38.

৪০ বেঙ্গল লেবার কনফারেন্সের তৃতীয় অধিবেশনে সুহ্‌রাবর্দীর বক্তৃতা; পূর্বোক্ত।

৪১. S. B. File No. 516/38 dt. 15.8.1938, *Star of India;* 18 March, 1939.

৪২. *গণশক্তি*; সম্পাদক মনোরঞ্জন রায়; নবপর্যায়, দ্বিতীয় সংখ্যা, সেপ্টেম্বর, ১৯৩৮।

৪৩. AICC File No. G-57 & G-270 of 1937-38 (NMML, New Delhi).

৪৪. S. B. File No. 929/35; *Reprot on Communism in Calcutta* by Deputy Commissioner of Police, dtd 9-4-1936, সরোজ মুখার্জি, পূর্বোক্ত; ১ম খণ্ড।

৪৫ J. Gallagher, 'Congress in Decline : Bengal 1930-39' in Anil Seal et. al *Locality, Province and Nation*; Cambridge.

৪৬. Govt. of Bengal, *Annual Summary of Political Events in the Presidency of Bengal,* 1937. (Printed).

৪৭. দীনবন্ধু রায়ের নিবন্ধ 'চটশ্রমিক'; দ্র. *গণশক্তি*, জানুয়ারি, ১৯৩৯; নবপর্যায় দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা।

৪৮. Ira Mitra, Growth of Trade Union Consciousness among Jute Mill Workers, 1920-40 *EPW,* Special Number, Nov. 1981

৪৯. *Amrita Bazar Patrika,* April 7, 1937.

৫০. *Amrita Bazar Patrika,* April 7, 1937.

৫১. *Indian Annual Register :* 1937 vol. and *Amrita Bazar Patrika,* 30. April. 1937.

৫২. *Amrita Bazar Patrika,* 22 April, 1937.

৫৩. *Amrita Bazar Patrika,* May 1, 1937.

৫৪. *Indian Annual Register :* 1937, Vol I.

৫৫. *Amrita Bazar Patrika,* May 4 1937.

৫৬. *Amrita Bazar Patrika*, May7, এই সময়ে কলকাতা শহরে চটকল ধর্মঘট তুলে নেওয়ার উপদেশ সম্বলিত 'গান্ধীজির বাণী' পোস্টার ছাপিয়ে IJMA ও প্রশাসন থেকে জনসাধারণের মধ্যে বিভ্রান্তিকর প্রচার চালানো হয়েছিল। গান্ধীজি জানিয়েছেন যে তিনি চটকল শ্রমিকদের এ জাতীয় পরামর্শ দেননি। বোঝাই যায় এটি ছিল একটি সরকারী অপকৌশল।

৫৭. *Amrita Bazar Patrika*, 8 May 1937.

৫৮. দ্র. পঞ্চানন সাহা, *বাঙলা শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস*, কলকাতা ১৯৭২;পৃঃ ১৩৮।

৫৯. *Amrita Bazar Patrika*, 8 May 1937.

৬০. Home/Pol/File No. 7/7/37.

৬১. Govt of Bengal, Home/Pol Deptt. File No. 68; *Action Report in Connection with Communist Activity.*

৬২. Ira Mitra op. cit. *EPW;* spl. No. Nov. 1981.

৬৩. *The Communist* Vol I, No. 16 April, 1937.

৬৪. *Amrita Bazar Patrika*, January 10, 1937.

৬৫. *Amrita Bazar Patrika*, Feb. 11, 1937 পঞ্চানন সাহা পূর্বোক্ত পৃঃ ১১২।

৬৬. Nirban Basu, *Politics and Protest ; op cit;* Kolkata 2002, p. 173

৬৭. G. B. Home (Poll) *Weekly Report on Industrial Disputes* (WRID) 1937 dated 6-3-1937 and 20-3-1937 and 1937.

৬৮. Ibid dated 17.4.1937. (Hereafter WRID only)

৬৯. অনিল মুখার্জী, *শ্রমিক আন্দোলনে হাতেখড়ি*, কলকাতা. ১৯৭০।

৭০. *Amrita Bazar Patrika*, dated 1-5-1937 & I. B. File No. 244/26

৭১. G. B./WRID. 7.8.1937.

৭২. I. B. Report, File No. 248/26 and Nirban Basu, Politics and Protest, op. cit, p. 178.

৭৩. *WRID* dated 4. 9. 1937 & I. B. Report File No. 248/26.

৭৪. জ্ঞান চক্রবর্তী, *ঢাকা জেলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের অতীত যুগ*, ১৯৭২, পৃঃ ১৩।

৭৫. অনিল মুখার্জী, *শ্রমিক আন্দোলনেব হাতে খড়ি*, কলকাতা, ১৯৭০, পৃঃ ৪৩।

৭৬. মনোরঞ্জন রায়, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৯ Nirban Basu; op cit p-186.

৭৭. *National Front*, Report of Anil Mukherjee dated 20-8-1939.

৭৮. সরকারী প্রশাসন সুকুমার ব্যানার্জীর মৃত্যু সম্পর্কে যে তদন্ত রিপোর্ট প্রস্তুত *(S. D. O. Report to Mr. Twynam Chief Secretary to the Govt. of Bengal* D. O. No. 193C dated 30.12.1938) করা হয়েছিল তাতে এই হত্যাকাণ্ডকে দুর্ঘটনা বলে চালানোর চেষ্টা হয় এবং এর জন্য দায়ী করা হয়েছিল শহীদ সুকুমার ব্যানার্জীর হঠকারিতাকেই। অবশ্য রিপোর্টে এই উল্লেখও ছিল যে প্রত্যক্ষদর্শী ট্রেড ইউনিয়ন নেতা নিত্যানন্দ চৌধুরী একে হত্যাকাণ্ড বলেছেন এবং দুই ইংরাজ অফিসার মিঃ লো (Lowe) এবং মিঃ ব্রাউন (Brown)-কে এজন্য তিনি দায়ী করেছেন কারণ তাঁরা লরির ড্রাইভারকে প্ররোচিত করেন এবং স্বয়ং ব্রাউন নিজেই স্টিয়ারিং ধরে সুকুমারের উপর দিয়ে লরি চালিয়ে দেন কারণ সে গেটে দাঁড়িয়ে ভাড়াটে মজুরদের অবাঞ্ছিত প্রবেশ প্রতিরোধ করছিল। কিন্তু রিপোর্টে এই অভিযোগ উড়িয়ে দেওয়া হয়। এছাড়া এসংক্রান্ত আরো বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য সৈয়দ শাহেদুল্লাহ, *বর্ধমান জেলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের অতীত প্রসঙ্গ,* বর্ধমান ১৯৯১, পৃঃ ১৫৫।

৭৯. সৈয়দ শাহেদুল্লাহ, পূর্বোক্ত।

৮০. *Amrita Bazar Patrika,* 12 January & 17 January, 1939.

৮১. Govt. of Bengal, *Weekly Report of Industrial disputes,* 13 Feb. and 20 Feb. 1937

৮২. S. B. File No 52/38/dated 21.4.38; Nirban Basu op cit p. 110.

৮৩. *Hindustan Standard* 22.6.1938 &19.8.1938; S. B. No. 516/38.

৮৪. I. B. File No. 688-46. dated 18-10-38 (Asansol) and S. B File No. 502/38 dated 28.7.38 & 25.11.38; Nirban Basu/ op. cit pp. 110-11.

৮৫. *WRID,* 18-6-1938 & 25-6-1938.

৮৬. *Capital* (Organ of National Chamber of Commerce) February 11, 1938, p. 227.

৮৭. *Fortnightly Report* Bengal. 1st half, June 1938, GOB Home (Poll) *Monthly Report for Industrial Disputes,* June 1938, WRID 18.6.38 also *Hindustan Standard* 29.5.38 & 16.6.38.

৮৮. *Amrita Bazar Patrika* 6-6-38, 11-6-38 & 13-6-38.

৮৯. I. B. File No. 248/26, Intercepted letter from Sisir Roy to Nityananda Choudhuri dated 11.3.1938.

৯০. S. B. File No. 508/39; dated 27.6.38 & 13.7.38 also *WRID* 27.7.38, 30.7.38.

৯১. Sumit Sarkar, *Swadeshi Movement in Bengal;* Delhi 1973; p. 185 and *Report of the committee on Industrial Unrest in Bengal*, Calcutta 1921; Govt of West Bengal.

৯২. *WRID* dated 24.4.37; and 8.5.37 এছাড়াও দ্রষ্টব্য নির্বাণ বসু, বাঙলার ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে শ্রমিক আন্দোলন:ইতিহাস অনুসন্ধান-৮;পঃ বঃ ইতিহাস সংসদ ১৯৯৩।

৯৩. *Amrita Bazar Patrika;* 16-11-1938.

৯৪. *WRID* dtd. 4.3.39 and *F.N Report* Bengal; Sept. Ist half 1939.

৯৫. *The Communist* vol II No. 11 Sept 1939.

৯৬. সরোজ মুখোপাধ্যায়, *ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও আমরা*, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৬৪।

৯৭. পঞ্চানন সাহা, পূর্বোক্ত পৃঃ ১১৮-১২২;সরোজ মুখোপাধ্যায়, তদেব পৃঃ ১৬০ এবং Shyampada Bhoumik, *Bengal-Nagpur Railway Workers Movement*, Calcutta.

৯৮. Home/Poll/G.B. Notification No. 594 dtd. Feb 14, 1935.

৯৯. মৃণালকান্তি বসু, *স্মৃতিকথা*, কলকাতা ১৯৪৮ (১৩৫৫) পৃঃ ২১৯-৩০ এবং সিদ্ধার্থ গুহ রায়, 'কলকাতার ট্রাম শ্রমিক ইউনিয়ন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম যুগ'। *ইতিহাস অনুসন্ধান*-৩, ১৯৮৮।

১০০. *National Front*, April 2, 1939.

১০১. মৃণালকান্তি বসু, *স্মৃতিকথা*, কলকাতা ১৯৪৮ (১৩৫৫) দ্রষ্টব্য।

১০২. নির্বাণ বসু, কলিকাতার কারখানা বহির্ভূত শ্রমিকদের আন্দোলনঃ একটি বিস্মৃত অধ্যায়ে (১৯৩৭-৪০) ইতিহাস অনুসন্ধান ৪, পঃ বঙ্গ ইতিহাস সংসদ কলকাতা, ১৯৮৯, পৃঃ ৩৭৫-৩৮৩।

১০৩. মনোরঞ্জন রায়, পূর্বোক্ত; পৃঃ ২৮-৪২।

১০৪. Sukomal Sen, *Working Class of India* : op cit, p. 361.

১০৫. Ibid, p. 363

১০৬. Ibid, p. 367

১০৭ Dipesh Chakraborty, *Rethinking Working Class History; Bengal 1890-1940;* Calcutta, 1989.

১০৮. Sabyasachi Bhattacharya, 'The outsider' : A Historical Note' in Ashok Mitra (ed) *The truth Unites : Essays in to Samar Sen;*

Calcutta, 1985. and Depesh Chakraborty and Ranjit Dasgupta, *Some Aspects of Labour History of Bengal : Two veiws* (mimeographed, Occasional Paper No. 40, CSSSC; Calcutta 1941).

১০৯. Lukaces Georg, *History and Class Consciousness, 1971;* and Antonio Gramsci, *Selection from the Prison Note Books;* London 1971; pp. 196-200;

১১০. Mathur A. S. & J. S., *Trade Union Movement in India,* Allahabad; 1975 এবং পঞ্চানন সাহা, *বাংলার শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস*; কলকাতা, ১৯৭২, পৃঃ ১৫০।

১১১. সরোজ মুখোপাধ্যায়, *ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও আমরা*; পূর্বোক্ত; পৃঃ ১৬৮

১১২. Sukomal Sen, Working Class of India, op-cit; p. 358 and R. P. Dutta, *India Today;* op-cit, p. 434.

১১৩. বিশিষ্ট ঐতিহাসিক বিপানচন্দ্রের সঙ্গে এস. এ ডাঙ্গের এক দীর্ঘ সাক্ষাৎকার (ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৮) দ্রষ্টব্য Bipan Chandra, *Essays on Indian Nationalism* Har-Anand Publication, New Delhi, 1984; pp-192-203

৯

উনিশ শতকে পূর্বভারতের কয়লাশিল্পে ভূগর্ভের নারী শ্রমিক ঃ ঔপনিবেশিক শোষণের অবাধ ক্ষেত্র

রাখি রায় চৌধুরী*

"Sweated Industry" অভিধাটি খনি শিল্পের ক্ষেত্রে যতখানি প্রযোজ্য তেমন বোধহয় আর কোন সংগঠিত শিল্পের ক্ষেত্রেই নয়। জীবিকার প্রয়োজনে জীবন এখানে প্রতিমুহূর্তে আলিঙ্গন করে প্রাণঘাতী একাধিক বিপদের, অঙ্গহানি থেকে জীবনহানি এক লহমায় সবই ঘটে যেতে পারে। অথচ উপনিবেশিক নিয়ন্ত্রণে পূর্বভারতে বাংলা বিহারের বিস্তীর্ণ কয়লা খনির আদিম উত্তোলন পদ্ধতিতে শ্রমিক নিযুক্তির ধাঁচটি প্রথম থেকেই ছিল পারিবার-কেন্দ্রিক। খনিগর্ভে যে পুরুষখনক দিনে একটার বেশী পাত্র (tub) কয়লা কেটে পূর্ণ করতে পারে না, সেই কর্মী যদি সাহায্যকারী হিসাবে তার পরিবারের কোন মহিলাকে পাশে পায় তবে দিনে ৩টির মত tub পূর্ণ করতে পারে। আর যেহেতু দ্বিতীয় ধরণের কাজটির জন্য কোন বিশেষ দক্ষতার প্রয়োজন থাকে না তাই মহিলারা অনায়াসেই একাজে যথেচ্ছ ব্যবহৃত হতে পারে।

প্রধানত এদেশীয় শ্রমিকদের তীব্র পারিবারিক বন্ধন এবং জাতপাতের সামাজিক বিধিনিষেধের কারণেই খনিগর্ভে মহিলা শ্রমিকদের অবাধ প্রবেশ ঘটে এই শিল্পের জন্মলগ্ন থেকেই। শ্রমিক নিযুক্তির ক্ষেত্রে পারিবারিক ধাঁচটি একদিকে যেমন শ্রমিক যোগানদার বা ঠিকাদারদের কাজকে সহজতর করেছিল তেমনি খনি মালিকদের (১৮শ-১৯শ শতকে অধিকাংশই ইয়োরোপীয়) লাভের মুখ দেখাতে সাহায্য করেছিল।

*সিনিয়ার লেকচারার, ইতিহাস বিভাগ, শিবনাথ শাস্ত্রী কলেজ।

শ্রমিক নিয়োগের এই বৈশিষ্ট্যের কারণে ভারতীয় কয়লাখনির খনিজ উত্তোলন পদ্ধতি ইংল্যান্ডের খনি শিল্প থেকে ছিল সম্পূর্ণ পৃথক। A. A. Purcell এবং J. Hallswarth-এর মতো গবেষকদের মতে, "the absence of carriers for men, unwillingness of women of other castes to carry coal for men of another caste and envy at better wages earned by the miner who had been assisted by his wife and children – all contributed to a great extent in the increase in number of female workers" মূলত একারণেই পূর্বভারতে কয়লাশিল্পে মহিলা শ্রমিক বা খাদান কামিনদের ভূমিকা ছিল প্রথম থেকেই অপরিহার্য্য।

উনিশ শতকে পূর্বভারতীয় খনিগর্ভে নিযুক্ত খাদান কামিনদের সামাজিক ভাবে প্রধানতঃ তিনটি স্তরে বিন্যস্ত করা যেতে পারে - ১। বিবাহিত নারী, যারা নিজেদের পরিবারে পুরুষের সাহায্যকারী, ২) বিধবা কিন্তু পরিবারে অন্য কোন পুরুষের সাহায্যকারী আর ৩) স্বামী বা পুরুষ পরিত্যক্তা (দুস্ত্ কমিন)। বাংলা বিহার খনি অঞ্চলে এ সামাজিক বিন্যাসের চিত্রটি আরও বেশী প্রতিভাত হয় ১৯২৫-এর অক্টোবরের চীফ্ ইন্সপেক্টর অফ্ মাইনস্-এর প্রতিবেদন থেকে।

বাংলা বিহারের বিভিন্ন কয়লাখানিতে স্বামীর সহকারী ও দুস্ত্ কামিনদের (স্বামী-পরিত্যক্তা) শতকরা অংশীদারিত্বের হার

খনির মালিকানা	গণনায় উল্লিখিত মহিলা শ্রমিকদের শতকরা সংখ্যা	স্বামীর সহকারী মহিলা শ্রমিকদের শতকরা অংশীদারিত্ব	নিকট আত্মীয়দের সহকারী শ্রমিকদের শতকরা অংশীদারিত্ব	দুস্ত্ কামিন
রানীগঞ্জ (বাংলা)				
১। ইক্যুইটেবল কোল কোং	১৫০	৯১	৫২	৪৮
২ ঘুসিক মুসলিম কোলিয়ারী	১০০	৫৯	-	-
৩। বেঙ্গল কোল কোম্পানী	৫২২		৭১	২৯
৪। ভিলয়ার্স লিমিটেড	৭৩	৬১	৮২	১২
৫। ব্যানার্জী সন্তান	১৭	৯০	-	১০
৬। এন. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স	১৪০১	৫৬	-	-
৭। গজদার কাজোরা কোল কোং	৫৬	৮৮		

খনির মালিকানা	গণনায় উল্লিখিত মহিলা শ্রমিকদের শতকরা সংখ্যা	স্বামীর সহকারী মহিলা শ্রমিকদের শতকরা অংশীদারিত্ব	নিকট আত্মীয়দের সহকারী শ্রমিকদের শতকরা অংশীদারিত্ব	দুস্থ কামিন
৮। টাটা আয়রণ অ্যান্ড স্টীল	৪৮	১২	-	৮৮
৯। অ্যান্ড্রু ইয়ুল অ্যান্ড কোং	৬০৫	-	৫৫	৪৫
	মোট ২৯৭২			
ঝরিয়া (বিহার)				
১। ইস্টার্ন কোলফিল্ডস্ লিমিটেড	২৪১	৬১	৯৬	৪
২। পিওর ঝরিয়া কোলিয়ারী	-	-	-	-
৩। খারখারিয়ার কোলিয়ারী	৩৪	৩৫	৮২	১৮
৪। কুজ্মা কোল কোম্পানি	৫৪	৫০	৮৭	১৩
৫। ভুলানবাড়ী কোল কোম্পানি	২৮৯	৮৫	-	১৫
৬। স্ট্যান্ডার্ড কোলিয়ারী লিমিটেড	৭৪৫	৮৫	-	১৫
৭। এ.সি. ব্যানার্জী অ্যান্ড কোং	৮৬	৬৬	৮৭	১৩
৮। ই. জি কোল কোম্পানি লিমিটেড	৭৩০	৮২	-	১৮
৯। বরাকর কোল কোম্পানি লিমিটেড.	১৪৮৬	৭৭	৮৬	১৪
১০। টিস্‌কো	১৮৮	২১৩	২৩৬	৬৪
	মোট ৩৪৫৩			

(সূত্র—October 1925-এর Chief Inspector of Mines-এর রিপোর্ট)

বিগত শতকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ে খনিগর্ভে মহিলা শ্রমিকদের নিজের পুরুষসঙ্গীর সহায়ক উত্তোলক বা Loader এর ভূমিকার গুরুত্ববৃদ্ধির কারণে খনিগর্ভে তাদের কাজের পরিবেশ এবং ধরণধারণ সম্পর্কে ধারণা আরও স্পষ্টতর হওয়া প্রয়োজন। ১৮শ শতকের গোড়ার দিকে কয়লা উত্তোলন খননকাজে প্রথাগতভাবে দক্ষ বাউরিদের নিয়ে শুরু হলেও ১৮৮৭তে বেঙ্গল-নাগপুর রেলপথ খুলে দেওয়ার সাথে সাথে বিহারের ছোটনাগপুর অঞ্চলের বিভিন্ন আদিবাসী গোষ্ঠী বিশেষতঃ সাঁওতাল, কোরা, কোল নারীপুরুষেরা খনি অঞ্চলকে জীবিকার প্রধান ক্ষেত্র হিসাবে বেছে নেয়। নিম্ন বর্ণের বাউরিদের তুলনায় দৈহিকভাবে বলশালী. অদম্য সাহসী এবং অধিকতর

ঝুঁকি-প্রবণ হওয়ার সুবাদে সমস্ত রকম প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও পরিবারের মহিলা সদস্যসহ খনিগর্ভের অতলে নেমে যেতে তাদের অনাগ্রহ ছিল না।

এমন কী সেখানে শিশু জন্মের ঘটনার উল্লেখও ইন্ডিয়ান মাইনস্ অ্যাসোসিয়েশনের রিপোর্টে পাওয়া যায়। যদিও পাশ্চাত্যের কয়লাখনির তুলনায় ভারতীয় খনিগর্ভে অবতরণের প্রধান সুবিধা খনিগুলির অপেক্ষাকৃত ঋজু সুড়ঙ্গপথ, পোক্ত আস্তরণ ও প্রশস্ত দালান এবং অপেক্ষাকৃত কম খনিবাষ্প (gas), তবু মনে রাখতে হবে খনিগর্ভের অদ্ভুত আঁধার ও অনিশ্চিত পরিবেশ যে কোন সুস্থ মানুষের দেহমনের স্বাভাবিক ভারসাম্যের প্রতিকূল। আর ১৮শ এবং ১৯শ শতকে যখন মূলতঃ অনেকাংশেই অবৈজ্ঞানিক প্রথায় মনুষ্যশ্রমের উপর নির্ভরশীল হয়ে খনিজ উত্তোলন হত তখন অধিকাংশ খনিগর্ভেই সঠিক বায়ুরন্ধ্র বা ventilation-এর ব্যবস্থা ছিল না। ১৮৭৮-এর আগে মহিলা বা পুরুষ শ্রমিক ক্যাস্টর ওয়েলে ভেজানো কোন রজ্জুতে অগ্নিসংযোগ করে প্রজ্জ্বলিত সেই মশালবর্তিকা হাতে ধরে পথ প্রদর্শকের ভূমিকা পালন করত। একাজে টিনের কুপীর আমদানী হলো ১৮৭৮-এ।

টিনের কুপীর জন্য ব্যবহৃত হত দুর্গন্ধবাহী বর্মীয় খনিজ তেল যাতে খনিগর্ভে বাড়ত ধোঁয়া আর দূষণের মাত্রা। এই অমানবিক তথা অবৈজ্ঞানিক কর্মপদ্ধতি চালু থাকে পরবর্তী শতকের গোড়ার দিকেও। এ সময়ে বাংলা-বিহার অঞ্চলে কয়লাখনির পরিদর্শক হিসাবে Lord Curzon Reeder সাহেবকে নিয়োগ করে তৎকালীন কোলিয়ারীগুলির কর্মকাণ্ডের যে খবরাখবর পান তা তাঁর অনবদ্য ভাষায় ফুটে উঠেছে।

"In many of the mines, the head-gear and winding apparatus were unsafe. Elsewhere there was no attempt at proper ventilation. Frequently the managers were absent and the work was proceeding under no sort of control....In one case in a Bengal Coal mine, Mr. Reeder found 250 people (men, women and infants) at work where he reported the ventilation as nil, the air foul in the extreme with smoke and gases and the conditions unfit for human existence."[৩]

১৯১০-এ একই সাবধানবাণী উচ্চারিত হতে দেখা যায় Chief Inspector of Mines-এর রিপোর্টে—

"In reviewing the years' fatal accidents generally and those which were serious but not fatal, there is evident that in many

cases the cause in some instances direct and in others indirect, was want of supervision."[৪]

এই ধরণের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যেই সন্তানসম্ভবা কামিনরা নিজের পুরুষ সঙ্গীটির সহকারী উত্তোলক বা loader হিসাবে কাজ করেছে, এমনকী কয়েকজন মিলে কয়লাভর্ত্তি tubগুলোকে ছোট ছোট রেলের উপর ঠেলে ঠেলে tramming-cooly-র ভূমিকাও পালন করেছে। কেবল loader হিসাবেই নয়, এই কামিনদের খনিজকে ভূগর্ভ হতে ভূপৃষ্ঠে তুলে আনার জন্য carrier বা বাহক হিসাবেও নিরবচ্ছিন্নভাবে খনিমালিকরা ব্যবহার করেছে। ৬০ পাউন্ড থেকে ৮০ পাউন্ডের কয়লার বস্তা পিঠে নিয়ে তাদের প্রায় ২০০ গজ পর্যন্ত হামেশাই খনিগর্ভ থেকে উপরে উঠে আসতে হত। সেকারণেই সবার আগে তাদের স্বাভাবিক পঙ্গুতা দেখা দিত পা দুখানিতে, বিশেষত পায়ের পাতা দুটি জুড়ে। Dr. Curzel-এর রিপোর্ট সেদিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করে।[৫]

এই নিরবচ্ছিন্ন শোষণের হাত থেকে মুক্তির উপায় সহজ ছিল না। ১৮৯৪-র I.M.A.-র রিপোর্টে নজর দিলে যে সুরটা ধরা পাড়ে তাকে অন্তত শ্রমিক-দরদী বলে চিহ্নিত করা যায় না। বরঞ্চ I.M.A.-র অধিকাংশ সদস্যই (বেশীরভাগই ইয়োরোপীয়) নারী ও শিশুদের জন্য কোন নিরাপত্তামূলক শ্রম আইন প্রণয়নের প্রচণ্ড বিরোধী। এমন কী তারা খনি পরিদর্শক প্রধান পদটিতেও সরকারী পরিদর্শক নিয়োগের বিপক্ষে। কারণ এইসব খাদান কামিন যেমন অল্প মজুরীতে তুষ্ট এবং সহজেই নিয়ন্ত্রণাধীন তেমনই তাদের উপস্থিতি খনিগুলিতে পুরুষ শ্রমিকের দৈনিক উপস্থিতিকে অনেকটাই সুনিশ্চিত করে। তাই বাংলা বিহারের কয়লাশিল্পে নারী শ্রমিকদের অবাধ নিযুক্তি মালিক পক্ষের লাভকে সুনিশ্চিত করতে অপরিহার্য হয়ে ওঠে।

খনিগর্ভে নারীশ্রমিক শোষণের চিত্রটি অধিকতর স্পষ্ট হয় যদি তাদের দৈনিক শ্রমবিন্যাস বা work schedule-এর দিকে নজর রাখা হয়। ভূতলে মূলতঃ চারধরণের কাজে (traming, packing, gate-keeping, water-bailing) অগুনতি মহিলা শ্রমিকদের প্রথম থেকেই নিয়োগ করা হত। ১৯৩০ পর্যন্ত কোন খনিকর্মী নারী পুরুষ নির্বিশেষে সাধারণভাবে কারোরই কোন নির্দ্ধারিত শ্রমসূচী ছিল না। এই "Happy-go-lucky system"-এ না ছিল কোন নিয়ম-মাফিক সময়বাঁধা কাজ (regular shift system), না ছিল প্রাক্ নির্দ্ধারিত মাত্রার পরিমাণগত উৎপাদন। ঘন্টার পর ঘন্টা হাড়ভাঙ্গা-খাটুনির পর পরিবারসহ কর্মী খনক ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়ত, কখনও বা জিরিয়ে নিত ঘন্টাখানেক—দুটো অভ্যাসই ছিল তাদের অস্তিত্বের পক্ষে সম্পূর্ণ ঝুঁকি-প্রবণ।

১৯১৮তে হয়ত সে কারণেই Pandakonali কোল কোম্পানীর ম্যানেজার Starksfield, Industrial Commission-এর কাছে তাঁর লিখিত বয়ানে সুপারিশ করেন—"If a system of regular shift could be made compulsory by law it would be greatly to the benefit of the industry.....In Britain mine's shifts are regulated by law."[৬] মনে রাখার মতই শেষ বাক্যটি। স্বদেশে শিল্পোৎপাদন আইনের শৃঙ্খল মেনে করা গেলেও সাত সাগর পারে এই উপমহাদেশে শ্রমিকশোষণের জন্যেই যেন উদগ্রীব ঔপনিবেশিক প্রশাসন। বস্তুত ১৮৮৮ থেকে ১৯২২-এর মধ্যবর্তী সময়ে কয়লা তোলা হয়েছে খনি সংক্রান্ত কোনরকম বিধিনিষেধ ছাড়াই। ফলে এই পর্বে শ্রমিক শোষণ ছিল যেমনই নিরবচ্ছিন্ন তেমনই নিরঙ্কুশ। নীচের সারণি থেকে ১৯১০-১৯২৫ কালপর্বে কয়লাশিল্পে শ্রমিক নিযুক্তির 'হপ্তার' হিসাবে একটা সাধারণ ধারণা তৈরী হতে পারে।

১৯১০-১৯২৩ কালপর্বে খনিকর্মী ও মহিলা কর্মীদের সপ্তাহভিত্তিক ঘণ্টা-নির্ভর কার্যসূচী—

বর্ষ	কয়লা খনি	খনিগর্ভে নিযুক্ত শ্রমিক		খনিমুখে উপরিতলের শ্রমিব	
		পুরুষ খননকর্মী	নারী শ্রমিক	পুরুষকর্মী	নারী
	১। ঝরিয়া কয়লাখনি (বিহার)	৬০	৬০	৬০	৬০
১৯১০	২। রানীগঞ্জ (বাংলা)	৬৪	৬৪	৪৮	৪৮
	৩। গিরিডি (বিহার)		-	-	-
	১। ঝরিয়া (বিহার)	৫২	৪৮	৬০	৬০
১৯২৩	২। রানীগঞ্জ (বাংলা)	৪৮	৪৮	৪৮	৪৮
	৩। গিরিডি (বিহার)	৪৮	৪৮	৪৮	৪৮

(সূত্র ঃ ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রিস্ অ্যান্ড লেবার, বুলেটিন নং ৩১ এবং চীফ্ ইন্সপেক্টর অফ্ মাইনস্-এর বার্ষিক প্রতিবেদন - ১৯২৩)

এধরণের অমানবিক শোষণের বেড়াজাল থেকে মুক্তিব জন্য এ-অঞ্চলে কামিনদের

অপেক্ষা করতে হয়েছে ১৯২৩ পর্যন্ত। ১৯২৩-এর Mines Act-ই এসেছে মূলতঃ ১৯০১-এর Hours convention-এর সংশোধনী বা ratification নিয়ে।

এর উদ্দেশ্য ছিল হপ্তাপিছু ৬০ ঘণ্টা কাজের সময়সূচীকে বাস্তবায়িত করা। এই নূতন আইন মোতাবেক নারী-পুরুষ সকলেই হয় খনিগর্ভে সপ্তাহে ৫৪ ঘণ্টা, নয় উপরিতলে ৬০ ঘণ্টা কাজে নিযুক্ত থাকতে পারত। ১৯২৪ থেকে ১৯২৮-এ মহিলা কামিনদের সপ্তাহপিছু ঘণ্টামাফিক কর্মনিযুক্তির চিত্র স্পষ্ট হয় নীচের সারণী থেকে —

১৯২৭-৩৯ কালপর্বে মহিলা খনি শ্রমিকদের কর্ম নিযুক্তির ধারা

বর্ষ	নিযুক্ত শ্রমিকদের পূর্ণ সংখ্যা	নারীশ্রমিকদের পূর্ণ সংখ্যা	সামগ্রিক নিয়োগের অনুপাতে নারী নিযুক্তির অনুপাত
১৯২৭	১৬৫,২১৩	৪৭,৪৪০	২৮.৭
১৯৩২	১৪৮,৪৮৯	২৬,৮৪৭	১৮.১
১৯৩৭	১৭১,১৪৯	২২,৮৮৭	১৫.৪

সূত্র ঃ প্রসাদ রিপোর্ট (১৯৪০), ৪র্থ খণ্ড - প্রথম পর্ব, পৃঃ ২৬৪

স্বভাবতই ঔপনিবেশিক সরকার শ্রমিকদরদী ভূমিকায় তখনও অবতীর্ণ হতে পারেনি, আর পারেনি বলেই ১৯৩৫ পর্যন্ত চলেছে একাদিক্রমে এধরণের নিযুক্তি। পুরুষদের পাশাপাশি নারীরা এসময়ে একনাগারে ১৬-১৭ ঘণ্টা শ্রমদান করে গেছে। ১৯১৬তে শিল্পকমিশনে 1st December জনৈক সাক্ষীকে কমিশনার প্রশ্ন করেন—

"Your proposal of the division of day into two shifts, would that upset the labour?" প্রত্যুত্তরে সাক্ষী জানাতে ভোলেন না—"It might, at first but my object is to get labour working with some system at all."[১] তথাপি ১৯২৮ পর্যন্ত এক্ষেত্রে কোন সদর্থক পদক্ষেপই নেওয়া হয়নি। কামিনদের শ্রমদানের দৈনিকসীমা নির্দ্ধারিত হয় ১৯২৮-এর সংশোধনমূলক আইনের মধ্যে দিয়ে যাতে যে কোন খনি শ্রমিকের কী নারী কী পুরুষ একাদিক্রমে ১২ ঘণ্টার বেশী নিযুক্তি বে-আইনী ঘোষিত হয়। যদিও এর পেছনে Washington Conference (১৯১৯) ও I.L.O-র একটা প্রচ্ছন্ন ভূমিকা ছিল। তবে এদেশে ঐ আইনও বাস্তবে রূপ লাভ করে ১৯৩০-র April-এর পর থেকে। অবশ্যই এক্ষেত্রে স্মরণীয় ভূমিকা নিয়েছিলেন N. M. Joshi, Dewan Chamanlal এবং অপরাপর নেতৃবৃন্দ যারা Royal Commission on Labour-এর অধিবেশনগুলিতে প্রায় নিত্য উপস্থিত

থেকে খনি শ্রমিকদের শোষণের ছবিটাকে কমিশনের সামনে স্পষ্টতর করে তুলেছিলেন। ঔপনিবেশিক সরকার সে সময়ে ঝুঁকেছিলেন কামিনদের ও খনিকর্মীদের দৈনিক শ্রমদানের সীমা টানার পরিবর্তে যা হোক করে একটি সাপ্তাহিক কাজের সীমা নির্দ্ধারণ করতে যা বোঝা যায় সরকারের তৎকালীন বাণিজ্য শিল্প বিভাগের সদস্য চার্লস ইনের মনোভাবে।

নিয়মিত উপস্থিতির লক্ষ্যে ভারতে নিযুক্ত Royal Commission on Labour খনিশ্রমিকদের কাজের একটানা সময়সূচী সংক্ষেপ করার সুপারিশ আনলে এপ্রিল ১৯৩৫-এ ইন্ডিয়ান মাইনস্ অ্যাক্ট যে সংশোধনী আনে তাতে সপ্তাহে যে কোন খনি শ্রমিক ৫৪ ঘণ্টা কাজ পেতে পারে। এলো খাতায় কলমে এধরনের Shift ব্যবস্থা। কিন্তু দেশপাণ্ডের (১৯৪৬)-এর প্রতিবেদনও স্পষ্ট করে খনিগর্ভের অতলে নারী পুরুষদের প্রবেশ করা বা উঠে আসার জন্য কোন আইনই বাস্তবে তখনও কার্যকরী ছিল না।

কয়লা উত্তোলনের মত ঝুঁকি-প্রবণ কায়িক পরিশ্রমের ক্ষেত্রে শ্রমবিরতি ও ছুটির এক বিশেষ ভূমিকা আছে তা সকলেই মানবে। যেহেতু পুরুষদের পাশাপাশি খাদান কামিনরা সমশ্রমে অভ্যস্ত তাই তাদের শ্রমবিরতি বা ছুটি মঞ্জুরে পুরুষদের সাথে সমতা রক্ষা করতে মালিকপক্ষ ছিল উদগ্রীব। ১৮৯১-এর ভারতীয় কারখানা আইন (Indian Factories Act, 1891) মোতাবেক তারাও সোয়াদিন সপ্তাহে দুটি পেতে পারত। এরই পাশাপাশি অতিরিক্ত অপর একটি দিন ছুটি পেতে তাদের অপেক্ষা করতে হয় দীর্ঘ তিন তিনটি দশক। ১৯২২ থেকে বাংলা বিহার খনির ক্ষেত্রে রবি-সোম ছিল ঘোষিত ছুটির দিন। আর বছরভর এই অনুমতি খাদান কামিনদের তাদের পুরুষ সঙ্গীদের মতই বরাদ্দ ছিল সাকুল্যে ৮টি ছুটির দিন, যেমন দুর্গাপূজায় ৩ দিন, কালীপূজায় ২ দিন, মকরসংক্রান্তিতে (পিঠাপরব) ১দিন এবং হোলিতে (ফাগুয়া) ২দিন।

অসুস্থতার জন্যে ছুটি বরাদ্দ ছিল না। কাজে অনুপস্থিতিতে কোন মজুরি কেউ দাবী করতে পারত না। পুরুষদের মত কামিনদের কাছেও অসুস্থতায় অনুপস্থিতি ছিল অনশন মৃত্যুর সামিল। হাতেগোনা দুতিনটি কোলিয়ারী যেমন বরারী, কাঁকের (সেন্ট্রাল দানাগোরা কোলিয়ারী) বাদে অন্যত্র কেবল চার আনা খোরাকীর বেশী এঅবস্থায় তাদের কিছু আর মিলতই না। এমন কী ১৯৩৪-এর আগে পর্যন্ত খাদান কামিনরা মাতৃত্বের ছুটি পাওয়ার যোগ্য বলে মনে করাও হতো না। অপরদিকে ২০এর দশকে মূলত ১৯১৯-এর Washington Convention-এর পর থেকে এই মাতৃত্বের মত স্বাভাবিক প্রাকৃতিক পরিস্থিতিই মহিলা শ্রমিকদের কর্মনিযুক্তির বিপক্ষে মালিকপক্ষের হাতে জোরালো হাতিয়ার হয়ে ওঠে।

এই বিশেষ সময়ে মহিলা কামিনদের কাজে গরহাজির থাকার কারণে তাদের অসুস্থতাকালীন বীমা ও মাতৃত্বকালীন সুযোগসুবিধা দানে মালিকপক্ষের সদিচ্ছায় অন্তরায় হয়ে ওঠে। কিন্তু কেন তারা শিশু জন্মের ঝুঁকি খনিক্ষেত্রে নিতে অনিচ্ছুক ছিল তা পরিষ্কার হয় ১৯২৪-এর Indian Industries And Labour-এর ৩২ নম্বর বুলেটিন এবং Bihar Labour Enquiry Committee (১৯৪০)-এর প্রতিবেদন থেকে। এইসব অসংখ্য কামিনদের মাতৃত্ব সংক্রান্ত আইনবিধি পাশ হয় ১৯৩৪-এ (Mines Act XXV of 1934) যদিও তা হয়েছিল ১৯১৯ এর Washington Convention-এর সতর্কবাণী উপেক্ষা করেই। এই প্রসঙ্গে একঝলক দেখে নেওয়া যেতে পারে প্রথম আন্তর্জাতিক শ্রমিক সমাবেশে পাশ হওয়া সেই Convention-এ মহিলা শ্রমিকদের মাতৃত্ব সংক্রান্ত সুপারিশ কি ছিল ঃ

"The First International Labour Conference at Wastington... passed a convention in 1919 recommending that women must not be allowed to work six weeks before and after the confinement period. They must be paid benefits sufficient for the full and healthy maintenance of themselves and their children. They should be protected against dismissal during or just before the confinement period and should be allowed if they are nursing their children half an hour twice a day during the working hours for this purpose."

যদিও বিশ্বের অনেক দেশই উপরের সুপারিশ অনুযায়ী খনি-আইন প্রণয়নের গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিল, ভারতের ঔপনিবেশিক সরকার কেবল এর সম্ভাবনার জন্য ভেবে-বুঝে শপথ নেওয়ার অঙ্গীকার মাত্র করেছিল। কেবল স্বদেশী Tata এবং ভিনদেশী Andrew Yule-এর মত ব্যতিক্রমী কোলিয়ারী ছাড়া ১৯৪০ পর্যন্ত ভারত সরকারের প্রধান খনি পরিদর্শক পূর্বভারতের কয়লা ক্ষেত্রগুলিতে কামিনদের মাতৃত্বের ছুটির অস্তিত্ব না বাস্তবে না কাগজেকলমে খুঁজে পেয়েছিলেন। অবশেষে আরও পাঁচ বছর পর ১৯৪৫-এ ১০দিনের সবেতন ছুটি মঞ্জুর হয়, তাও আবার স্ত্রী পুরুষ কর্মী নির্বিশেষে। অবশ্য এর বহু আগেই ১৯২৫তে পাশ হওয়া আইন বলে ছোট ছোট শিশুদের মাতৃক্রোড়ে বা পরিবারের কোন কর্মীর সাথে খনি অঞ্চলে নিয়ে আসা নিষিদ্ধ হয়ে যায়। কিন্তু এক্ষেত্রে ক্রেশের অপ্রতুলতা ও তাদের প্রকৃত রক্ষণাবেক্ষণ কর্মী মায়েদের কাছে এক সমস্যা হয়ে ওঠে।

১৯৮৪-এর ক্ষেত্র সমীক্ষার অভিজ্ঞতায় জানা যায় যে কোম্পানীর আমলে অর্থাৎ

প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বে মহিলা উত্তোলকদের সন্তান সম্ভবা মনে হলেই তাদের প্রাপ্য 'হপ্তা' বন্ধ করে দেওয়া হত যাতে তারা খনি অঞ্চল ছেড়ে দেহাতের পথ ধরে। এই পরিবেশে হাতে গোনা কয়েকটি কোলিয়ারীই কেবল ইচ্ছুক ছিল Indian Maternity Benefit Schemes অনুযায়ী এইসব কামিনদের জীবনযাত্রা এই বিশেষ সময়ে সচল রাখতে। Indian Industries and Labour-এর ৩২ নম্বর বুলেটিন হতে জানা যায় যে বৃহৎ কোলিয়ারীগুলির মধ্যে Tataগোষ্ঠী তাদের নারী শ্রমিকদের সম্পূর্ণ মাতৃত্বকালীন অবসরের সময়ে দৈনিক ১টাকা থেকে ২টাকা করে মাতৃত্বের জন্য অনুদান দিত।

এছাড়া Andrew Yule-এর অধীনস্থ Bengal Nagpur Coal Company ৪০ পয়সা থেকে ৬০ পয়সা দৈনিক হারে কামিন মায়েদের দিত যতদিন না তারা কাজে যোগ দেয়। ঝরিয়ারই ভুলানবাড়ী কোলিয়ারী কোম্পানীর শিশু জন্মের অনুদান ছিল একমাসের জন্য দৈনিক ২৫ পয়সা। আরও চমৎকার ঝরিয়ার ভালগোরা কোল কোম্পানীর শিশু জন্মের অনুদান এককালীন ১ টাকা। উপরের ঘটনাগুলিই ইঙ্গিত দেয় কেন সন্তানের জন্ম দিতে শ্রমিক মায়েরা কর্মক্ষেত্র ছেড়ে আপন আপন গ্রামের উদ্দেশ্যে পা বাড়াত। Pure Jharia Colliery একটি মেটারনিটি হোম চালু করলেও সেখানে ছিল না পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা। আর সে সুবিধা নিতে পারত সেইসব স্থায়ী নারী শ্রমিকরা যারা বহু পূর্বেই নিজেদের জন্মস্থানের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করে ইতিমধ্যে খনি অঞ্চলেরই স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে গেছে।

জীবিকার প্রয়োজনে জীবনের সব ঝুঁকি নিয়ে ভূগর্ভে কয়লা কেটে তোলার জন্য যে সব নারী কর্মীরা অহরহ নেমে যেত তাদের পেশাগত বিপদ এবং দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার প্রসঙ্গটিকে এই আলোচনার বৃত্তের বাইরে রাখা হলে হয়ত শ্রমিক শোষণের পুরো ছবিটাই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। ১৯২১ থেকে '৩৫ প্রায় এই দেড় দশকে বাংলা-বিহার খনিক্ষেত্রে দুর্ঘটনার কারণগুলি খুঁটিয়ে দেখলে খনিগর্ভে কর্মরতা কামিনদের ক্ষেত্রে অন্যতম দুটি কারণ প্রধান হয়ে দাঁড়ায়—প্রথমত Pillar robbing এবং দ্বিতীয়ত, তাদের অজ্ঞানতাবশত অসতর্ক মুহূর্তে নিষিদ্ধ ঘেরা এলাকায় ঢুকে পড়া।

সহজাত অজ্ঞতা এবং সঠিক প্রশিক্ষণের অভাব যদি দ্বিতীয় ঘটনার কারণ হয় তবে প্রথমটির জন্য অবশ্যই দায়ী তাদের নিয়োগকারী আড়কাঠি শ্রমিক যোগানদার (raising contractor) স্বয়ং। কারণ তার সীমাহীন লাভের লোভ। এ দুটি ছাড়াও আরও একটি মারাত্মক কারণ ছিল খনিগর্ভে অহরহ দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ার যা কেউ আজ আর অস্বীকার করতে পারে না। কাজে নামার আগে পুরুষ সঙ্গীদের মতই খাদান কামিনদের আকণ্ঠ মদ্য পান। ভূগর্ভে ঝাঁপ দেবার আগে মালিকপক্ষের ব্যবস্থাপনাতেই

এদের উচ্চমাত্রায় মদ্যপান করানো হত। স্বভাবতই এই প্রাণঘাতী পেশার থেকে মেয়েদের সরে আসার সহজাত প্রবণতাকে নিঃশেষ করে দেবার জন্য সরকার থেকেই ঢালাও বিনি পয়সায় মদ যোগানো হত। রয়েল কমিশন অন লেবার এবং বিহার লেবার এনকোয়ারী কমিশনের সদস্যরা এই 'উচ্চহার' নিয়ে চিন্তিত ছিলেন। ১৯৩৯-এ অবস্থা আয়ত্বের বাইরে চলে গেলে বিহার সরকারকে ঝরিয়া, হাজারিবাগ, রাঁচিতে মদ বিক্রি বন্ধ করে দিতে হয়, হারাতে ২য় আবগারি শুল্ক।

এই কাল পর্বে খনিগর্ভে বেড়ে চলা দুর্ঘটনা এবং খনিকর্মীদের মাত্রাছাড়া মদ্যপান এই দুয়ের মধ্যে অদৃশ্য যোগসূত্রটি পরিষ্কার হয়ে যায় সমকালীন Workmen's Compensation Act in India-এর বার্ষিক প্রতিবেদন থেকে, যেখানে বলা হয়েছে—

"If the employer could prove that the employee concerned was 'drunk' and had disobeyed an explicit order or had removed any safety device....he (employer) was not liable to pay any compensation." Collin Simmons-এর মতে একমাত্র এইখানে ১৮৯৬তে পাশ হওয়া British Workmen's Compensation Act-এর প্রাসঙ্গিক ধারা থেকে ভারতীয় Workmen's Compensation Act, 1923-এর প্রধান বিচ্যুতি। কারণে বিলেতে মালিকপক্ষ 'were obliged to pay compensation in the case of death or serious and permanent 'disablement' on matter whose fault the accident was judged to be. The view was taken that in the event of death, the worker had been paid the penalty." উদ্ধৃতিটি দেওয়া থেকে বিরত থাকা গেল না কেবলমাত্র ঔপনিবেশিক সরকারী ব্যবস্থাপনায় খনিক্ষেত্রে শ্রমিক শোষণ কতখানি নিখুঁত, নিরঙ্কুশ ও সার্বিক করা যায় তার উদাহরণ হিসাবে তুলে ধরার জন্য।

এইভাবে একদা 'gin girls' হিসাবে পূর্বভারতের বিস্তীর্ণ কয়লাক্ষেত্রে যে রমণীরা নিজেদের পরিবারেব সঙ্গে নূতনভাবে নূতন পরিবেশে জীবন শুরু কবতে চেয়েছিল, এই খনিশিল্প প্রথম থেকেই তাদের নিযুক্ত করেছে ভূপৃষ্ঠে এবং ভূগর্ভে। তাদের দেখা গেছে এই শিল্পে নানা কাজে নানা ভূমিকায়, তাদের পুরুষ-কর্মীদের মতই নিজেদের অজান্তে একদিকে মালিক পক্ষ অপরদিকে আড়কাঠি ঠিকাদারদের লাগামছাড়া লাভের পাল্লাকে ভারী করতে গিয়ে বেচে থাকার ন্যূনতম শর্তটুকুই তাদের হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল।

এদের 'ধাওরা জীবন' আর দুঃখের 'বারমাস্যা' তাই বিরামহীন আর অফুরাণ। 'Industry and Empire'-এ Eric Hobsbawm নিজের দেশের খনিকামিন প্রসঙ্গে

যে অভিধাটি ব্যবহার করেছেন তা হল "Equal Labour in lesser pay", এ দেশে চিত্রটি আরও কালো, আরও করুণ, আরও মর্মান্তিক।

নির্দেশিকা

১। রিপোর্ট অন্ কন্ডিশনস্ ইন্ ইন্ডিয়া (Purcell-Hallsworth Report), লন্ডন, ১৯২৮

২। এম. জি এম ট্র্যানসাক্সন, কলকাতা,. ১৯৩৭, পৃঃ - ৮

৩। এল. ফ্রেজার প্রণীত ইন্ডিয়া আন্ডার কার্জন, লন্ডন ১৯১১, পৃঃ ৩২৮

৪। চীফ্ ইন্সপেক্টর অফ্ মাইনস ১৯১০-এর বার্ষিক প্রতিবেদন।

৫। ডি. কার্জেল প্রণীত উওমেনস্ লেবার ইন বেঙ্গল, ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রিস্ অ্যাণ্ড লেবার, ৩৫ নং, পৃঃ ৩২

৬। ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমিশনের ১৯১৮ প্রতিবেদন

৭। প্রাগুক্ত

৮। প্রথম লেজিসলেটিভ অ্যাসেমব্লির কার্যবিবরণী (তৃতীয় অধিবেশন, ১৯২২) পৃঃ ৭০৬।

১০

ঔপনিবেশিক বাংলায় বাবুকর্মীদের আন্দোলন

অনুরাধা কয়াল*

ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ঔপনিবেশিক শাসনের দরুন চা, কলিয়ারী, পাট এবং ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প এবং রেলের আবির্ভাবের পাশাপাশি একটি নতুন ধরনের শ্রমিক শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটেছিল সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে। এই শ্রমিকশ্রেণী White Collar Labour অথবা বাবুকর্মী রূপে চিহ্নিত হয়। ভারতবর্ষের মতো কৃষিভিত্তিক দেশে এই শ্রমিক নির্দিষ্ট কিছু অঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল, বাংলা ছিল পূর্ব ভারতের এই রকম একটি উন্নত মানের শিল্পাঞ্চল।

প্রাক স্বাধীনতার যুগে বাংলার শ্রমিকশ্রেণীকে কেন্দ্র করে নানা ধরনের গবেষণা হয়েছে তবুও শ্রমিকশ্রেণীর ইতিহাস চর্চায় বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা থেকে গিয়েছে। "The term working class is generally used to the industrial wage —earnls as a distinct social group and they do not imply the formation of the working class in the classical Marxian sense." শ্রমিকশ্রেণীর একটি অংশ যারা মাসিক বেতনভোগী তারা এতদিন পর্যন্ত ঐতিহাসিক ও সমাজ বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে অক্ষম ছিল। এই White Collar Class বা বাবুকর্মীরা ছিলেন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যারা কেরানী অথবা সরকারি ও বেসরকারি সংস্থায়, ব্যাঙ্ক. বীমা, স্কুল, পৌরসংস্থা ইত্যাদিতে কর্মরত। সামাজিক উৎস

* সিনিয়র লেকচারার, ইতিহাস বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা

ও কাজের প্রকৃতির ক্ষেত্রে বাবুকর্মীদের সাথে সাধারণ শ্রমিকশ্রেণীর পার্থক্য উপলব্ধি করা যায়। আধুনিক শিল্পায়ন, পশ্চিমী শিক্ষার প্রসার এবং নতুন পদ্ধতির প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বাবুকর্মীদের আবির্ভাব ঘটেছিল।

স্বদেশী বাংলায় বাবুকর্মীরা একটি দৃঢ় সামাজিক ভিত্তিতে এসে পৌছতে পেরেছিল। কেরানীবাবুদের সামাজিক অবস্থান মর্যাদাপূর্ণ জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছিল। বাণিজ্যিক সংস্থা অথবা কারখানায় কেরানীর চাকরি অথবা সরকারী বা পৌরসংস্থার অফিসের এমনকি সুদূর গ্রামাঞ্চলে স্কুল মাস্টারের চাকরিও মধ্যবিত্ত বাঙালি সম্প্রদায়ের কাছে বেশ লোভনীয় হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তাদের বেতন ছিল স্বল্প ও অনিয়মিত এবং চাকরী ক্ষেত্রে কোন নিরাপত্তা ছিল না। সর্বোপরি ইউরোপীয় কর্তৃপক্ষের উদ্ধত ব্যবহারের সম্মুখীন হতে হয়েছিল তাদের। কেরানীবাবুদের অসন্তোষের প্রথম বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল স্বদেশী আন্দোলনের যুগে। ১৯০৫ সেপ্টেম্বর নাগাদ ধাবাবাহিক আন্দোলনের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল হাওড়ার বার্ণ আয়রন ওয়ার্ক্স-এর কেরানীদের আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। এই সময় বার্ণ কোম্পানীর প্রায় ২৭৪ কেরানী আন্দোলন করতে শুরু করেছিল ইয়োরোপীয় মালিকদের বিরুদ্ধে। এছাড়াও বাউরিয়ার Fort Gloster Jute Mill-এর কেরানীবাবুরা এই সময় ইয়োরোপীয় মেনেজারদের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেছিল। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে কেরানীবাবুদের আন্দোলনের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল মুদ্রণকর্মী ও রেলকর্মীদের মধ্যে।

কলকাতার মুদ্রণকর্মীরা তাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক সচেতনতার কারণে একটি অভিনব পদমর্যাদা অর্জন করতে পেরেছিল এবং বাংলাদেশের প্রথম প্রকৃত শ্রমিক সংঘ স্থাপনের কৃতিত্ব তারাই অর্জন করেছিল।[১]

কলকাতার দুটো বড় সরকারি মুদ্রণ সংস্থায় কেরানীবাবুদের মধ্যে সহানুভূতিশূন্য কাজের পরিবেশ এবং ইউরোপীয় অফিসারদের দুর্ব্যবহারের বিরুদ্ধে অসন্তোষ ক্রমে বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৯০৫-এ যথাক্রমে ১৪৫০ এবং ৬৩৭ জন কর্মী সম্বলিত গভঃ অফ ইন্ডিয়া প্রেস এবং বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট প্রেসে বিবাদ-বিতর্ক শুরু হয়েছিল কতকগুলি অসন্তোষকে কেন্দ্র করে যথা স্বল্প অপর্যাপ্ত বেতন, জরিমানা, অতিরিক্ত কাজের ঘণ্টা ইত্যাদি।[২]

১৯০৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ভারত সরকারের (Govt. of India) প্রেসের কেরানীবাবুদের দ্বারা পাঠানো আবেদন পত্রটি কর্তৃপক্ষের দ্বারা অগ্রাহ্য হয়েছিল।[৩] নতুন বেতন কাঠামোয় পূজা অগ্রিমকে কমিয়ে দেওয়ার ফলে ধর্মঘট শুরু হয়েছিল।[৪] এ. সি. ব্যানার্জী, এ. কে. ঘোষ এবং বি. এম. চ্যাটার্জী এই ত্রয়ী ব্যারিস্টার ১৯০৫ এর ২৩শে সেপ্টেম্বর ময়দানে কর্মী মিটিং-এ আমন্ত্রিত হয়েছিল। সেই মিটিংয়ে একটি

বারো জনের কমিটি নির্বাচিত হয়েছিল। এ. সি. ব্যানার্জী কর্তৃপক্ষের কাছে পুনরায় আবেদন পত্র পাঠানোর পরামর্শ দেন। একই সাথে আগামী কার্যক্রমের জন্য তহবিল গঠনের পরামর্শকে অগ্রাহ্য করে কেরানীবাবুরা ২৭শে সেপ্টেম্বর ধর্মঘট শুরু করেছিলেন।[৫] বাণিজ্য ও শিল্প বিভাগের একটি বার্তায় প্রস্তাবিত হয়েছিল যে কলকাতা মুদ্রণকেন্দ্রগুলিকে মাদ্রাজ, এলাহাবাদ, লাহোর, বোম্বে ও সিমলার সরকারি প্রেসগুলিতে বিতরণ করা হবে এবং এর ফলে ক্যালকাটা গেজেটের প্রকাশনা ৪৮ ঘণ্টা বিলম্বিত হয়েছিল।[৬] অমৃত বাজার পত্রিকা ২৭ সেপ্টেম্বর কেরানীদের জন্য একটি প্রতিরক্ষা সমাজ গঠনের প্রস্তাব করেছিল।[৭] ২১শে অক্টোবর কলেজ স্কোয়ার-এর মিটিং-এ অপূর্ব কুমার ঘোষ-এর পরামর্শে একটি প্রিন্টার এবং কমপোজিটার লীগ গঠিত হয়েছিল।[৮] সান্ধ্য পত্রিকা দরিদ্র Compositar এবং ট্রাম Conductor-দের একত্রিত করে সংগ্রামে সামিল করেছিল। এছাড়াও ছাপাখানার Compositor-রা তাদের পরিবারের দুর্দশার মীমাংসা করতে ধর্মঘট শুরু করেছিল।[৯] এর ফলে কর্তৃপক্ষকে নতি স্বীকার করতে হয়েছিল। বাণিজ্য ও শিল্প বিভাগের প্রধান জে. পি. হেভেট সিমলা থেকে এসেছিলেন ভারত সরকারের প্রেসের (Govt. of India Press) কর্মীদের অসন্তোষের তদন্ত করতে।[১০] লেফটেন্যান্ট গভর্নর ফ্রেজার বেঙ্গল সেক্রটারিয়েট বিবাদ বিতর্কে ব্যক্তিগতভাবে হস্তক্ষেপ করেছিলেন এবং তদন্তের আশ্বাস দেওয়ার ফলে কর্মীরা পুনরায় কাজে যোগ দিয়েছিল।[১১] ১২ই সেপ্টেম্বর ১৯০৬ সালে একটি বিশেষ প্রতিবেদনে উল্লেখিত হয়েছিল যে কলকাতার প্রিন্টার প্রেসগুলিতে ধর্মঘট মহামারীর মত ঢুকে পড়েছে। যদিও অল্প কিছুদিনের জন্য এর প্রভাব পড়েছিল ছয়টি বেসরকারি প্রেস এবং Bengal Secretariat প্রেসের উপর।[১২] এই সময় থেকার স্প্রিঙ্ক প্রেসের Union টির বারোদিনের ধর্মঘটটি সাফল্য মন্ডিত হয়েছিল। ১২ই জুন ১৯০৬ সালে বিজয়বার্তা সম্বলিত হয়েছিল Cornwallis এবং College street-এ মুদ্রকদের মিছিলে।[১৩] ১৬ই জুন সম্বর্ধনাটিতে যোগদানের মধ্যে ছিলেন মুসলিম, হিন্দু, ইউরোপীয় এবং মাদ্রাজিগণ।[১৪]

মুদ্রণকর্মী ইউনিয়ন বা Printers Union এবং জাতীয়বাদী নেতৃত্বের সাথে এই সময় ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। ১৯০৬ সালে শিবাজী উৎসব উপলক্ষে কলকাতায় উপস্থিত মহারাষ্ট্রের জাতীয়তাবাদী নেতা বালগঙ্গাধর তিলক এবং ইউনিয়নের সদর কার্যালয়ে তাঁকে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়েছিল। ১৯০৭-এর একটি পুলিশ প্রতিবেদনের Printers Union-এর দুটি Meeting-এর কথা উল্লেখিত হয়েছিল।[১৫] স্বদেশী আন্দোলনের সময় ভারতীয় রেলে প্রায় ৪৫০০০ কেরানী ইউরোপীয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেছিল।[১৬]

বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য ধর্মঘটগুলির মধ্যে কেরানীদের ছুটি মঞ্জুর ও ভাতা সংক্রান্ত কিছু সুবিধা পাওয়ার দাবিকে কেন্দ্র করে ১৯০৬ সালে ২৫ থেকে ২৭শে জুন সাহেবগঞ্জ লুপলাইনে এবং আসানসোল বিভাগের কেরানীবাবুদের ধর্মঘট হয়েছিল। এগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ২৩শে জুলাই ১৯০৬ সালে হাওড়া ব্যান্ডেল শাখার ধর্মঘটের ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে যে ১৭ জন সদস্য বিশিষ্ট কর্মী প্রতিনিধিদের সংগঠিত আলোচনা ভেস্তে গিয়েছিল কারণ কোন্নগরের স্টেশন মাস্টার সুরেন্দ্রনাথ মুখার্জী মিটিং-এ জাতিগত বৈষম্যের প্রসঙ্গটি তোলার স্পর্ধা দেখিয়েছিলেন এবং সাময়িকভাবে বরখাস্ত হাওয়া ব্যান্ডেল বিভাগের Station Master এবং কেরানীদের মধ্যে ধর্মঘটের সমাপ্তি ঘটেছিল এবং ধর্মঘটগুলি মেন লাইনে বিস্তার করেছিল। ১৯০৬ সালের ১০ই আগস্ট থেকে রেলের শতাধিক কর্মীকে বরখাস্ত করা শুরু হয়েছিল।[১৭] এই পরিস্থিতিতে জাতীয়তাবাদী উকিল এবং সাংবাদিকরা ধর্মঘটীদের সাহায্যার্থে এগিয়ে এসেছিল এবং 'সন্ধ্যা' পত্রিকায় ঘোষণা করা হয়েছিল যে ধর্মঘটকে সাফল্যমন্ডিত করতে সবরকম ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এবং তার সাথে ধর্মঘটীদের কলকাতায় এসে জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনা করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। 'সন্ধ্যা' পত্রিকার অফিসটি মিটিং-এর কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল এবং ২৭শে জুলাই ১৯০৬ সালে এই অফিসেই Railway Union প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। রেল কর্তৃপক্ষ বরখাস্ত হওয়া ধর্মঘটীদের পুনর্বহাল না করার সিদ্ধান্তে অনড় থাকার ফলে এবং সরকার মধ্যস্থতা করতে অস্বীকার করা সত্ত্বেও জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ যথা বিপিনচন্দ্র পাল, চিত্তরঞ্জন দাস প্রমুখের অংশগ্রহণের ফলে ধর্মঘট বিস্তার লাভ করেছিল।[১৮] আসানসোল, রানীগঞ্জ, জামালপুর এবং সাহেবগঞ্জের রেলওয়ে Union কেন্দ্রগুলির প্রধান লক্ষ্য ছিল যাতে সেখানকার রেলওয়ে কর্মীরা Railway Union-এ যোগদান করতে পারে এবং ধর্মঘটে যোগদান করতে ইচ্ছুক Railway কর্মীদের সমর্থন করা হয়। Railway-র কেরানীবাবুদের Union ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছিল এবং এর একটি শাখা স্থাপিত হয়েছিল ১৯০৬ সালে আসানসোলে।

২৭শে আগস্ট ১৯০৬ সালে একজন ইউরোপীয় ওভারশিয়ার রেলওয়ে কর্মীদের মিটিং-এ যোগদানকে প্রতিহত করার চেষ্টা করার ফলে দাঙ্গার সূত্রপাত ঘটে। এ ঘটনার পরের দিন কেরানীবাবুরা কাজে যোগদান করতে অস্বীকার করেছিলেন। অবশেষে ৬ই সেপ্টেম্বর ১৯০৬ সালে নিঃশর্তভাবে ধর্মঘট তুলে নেওয়া হয়েছিল।

৫ই সেপ্টেম্বর ১৯০৬ সালে আসানসোল অঞ্চলে একটি ধর্মঘট শুরু হয়েছিল। সরকারি প্রতিবেদন অনুযায়ী Asansol Railway Traffic বিভাগের সমস্ত কেরানীবাবুরা এতে যোগদান করেছিল। এই পরিস্থিতিতে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, তারকনাথ

পালিত, উপেন্দ্র নাথ বসু এবং কৃষ্ণকুমার মিত্রের মতো নেতৃবৃন্দ Indian Association হলে একটি মিটিং ডেকেছিলেন এবং তারা চেয়েছিলেন ধর্মঘট বজায় থাকুক যাতে ধর্মঘটীদের বিক্ষোভ দূর করতে সরকারকে হস্তক্ষেপ করতে হয়। রেলের কেরানীবাবুদের দ্বারা পরিচালিত ধর্মঘটগুলি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছিল এবং তারা পূর্ণ প্রয়াস গ্রহণের শক্তি হারিয়ে ফেলেছিল। ১৯০৭ সালের নভেম্বরেই Indian Railway কেরানীরা আবার শিরোনামে উঠে এসেছিল। ১৮ই নভেম্বর আসানসোল-এ ধর্মঘট শুরু হয় এবং হাওড়া দিল্লী লাইনে ছড়িয়ে পড়েছিল। কেরানীবাবুরা সাফল্য লাভে ব্যর্থ হয়েছিল। ৩০শে নভেম্বর ধর্মঘটের অবসান হয়।

২৪-২৫শে নভেম্বর ১৯০৭ সালে খড়গপুর এর Bengal-Nagpur রেল প্রহরীদের মধ্যেও একটা ছোট ধর্মঘট হয়েছিল।[১১]

কেরানীবাবুদের দ্বারা পরিচালিত ধর্মঘটগুলির প্রতি জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলির মনোভাব অনিবার্যভাবেই কিছুটা দ্বিধাপূর্ণ ছিল।

১৯০৮-এর মধ্য লগ্ন থেকে কেরানীবাবুদের সমস্যার বিষয়ে জাতীয়তাবাদী আগ্রহের আকস্মিক ও তীব্র অবনতি ঘটতে থাকে। কেরানীবাবুদের সংবাদের ফাইলগুলি ১৯০৮ - ১৯২১ পর্যন্ত এর ফলে ফাঁকা ছিল।

অল্প সংখ্যার স্বতস্ফূর্ত ধর্মঘট তখনও ঘটে চলেছিল। কিন্তু বাংলার জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ সে বিষয়ে উৎসাহ হারিয়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরেই নতুন প্রজন্মের নেতৃবৃন্দ কেরানীবাবুদের আন্দালনকে পুনরুজ্জীবিত করতে এগিয়ে এসেছিলেন এবং তখন প্রাক্-স্বদেশী-ইতিহাস পর্বটিকে কখনো কখনো স্মরণ করা হয়েছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অবসানের পর সমাজের সকল শ্রেণীর অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠেছিল এবং এই পরিস্থিতিতে একটি বৃহৎ শ্রমিক ও কেরানী আন্দোলন আবশ্যক হয়ে উঠেছিল। এই সময় বাংলার বহু Trade Union প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১৯২০ সালে All India Trade Union Congress প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসানের পর অসহযোগ ও খিলাফৎ আন্দোলন সমগ্র ভারতবর্ষকে জাগ্রত করে তুলেছিল এবং শ্রমিক ও কেরানী আন্দোলনকেও উৎসাহিত করেছিল। এই নূতন আবহাওয়াতে এক শ্রেণীর জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ কেরানী সংগঠনগুলি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। যুদ্ধের পরবর্তী সময় সরকারি ও বেসরকারি কর্মী সংগঠন সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১৯১৮-১৯২০ মধ্যে বাংলায় বিভিন্ন কেরানী সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যথা - Corporation Employees Union, All Bengal Ministrial Officers' Association, Journalist And

Press Employees Association, All Bengal Teachers' Association, All Bengal University Teachers' Association ইত্যাদি।

১৯১৯ সালে ২৩শে আগস্ট Indian Employees Association প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই সংগঠনটির সভাপতি ছিলেন এইচ. সি. মুখার্জী, ক্রিষ্টেদাস মল্লিক এবং সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী। Secretary ছিলেন মনিমোহন মল্লিক এবং Assistant ছিলেন মুকুন্দলাল সরকার এবং বলাই চন্দ্র দে। পুলিশের একটি গোপন প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে এই সংগঠনটির সমর্থক ছিলেন রায় রাধাচরণ পাল, সচিন্দ্র নাথ বসু, ডঃ আর্থার রজার এবং শরৎ রায়।[২০] ১৯২০ সালে ফেব্রুয়ারী মাসের ১ তারিখে Corporation Employees Association প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই সংগঠনটির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন এ্যাকাউন্টস বিভাগের প্রধান কেরানী গোপাল চন্দ্র দে।[২১] কলকাতা কর্পোরেশন Employees Association প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯২৪-র ১০ই নভেম্বর।[২২] ২১শে জানুয়ারী ১৯২০ সাল নাগাদ Journalist and Press Employees Association প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই সংগঠনটির সভাপতি ছিলেন সি. আর. দাশ, সহসভাপতি ছিলেন বিপিন চন্দ্র পাল। Intelligence বিভাগের রিপোর্ট অনুযায়ী ইংল্যান্ড থেকে ফেরার পর বিপিন চন্দ্র পাল নিজেকে কেরানী আন্দোলনের সাথে চিহ্নিত করেছিলেন। চিত্তরঞ্জন দাশ ও বিপিন চন্দ্র পালের ঘনিষ্ঠ জিতেন্দ্র লাল ব্যানার্জী, "নায়কের" সম্পাদক পাঁচকড়ি ব্যানার্জী এবং একজন সংস্কৃত পণ্ডিত বসন্ত কুমার বিদ্যানিধি এই সংগঠনের প্রত্যেকটা মিটিং-এ অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং পুঁজিবাদ বিরোধী মানসিকতা এর সদস্যদের মধ্যে বিস্তার করেন।[২৩]

১৯২০ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে 'All Bengal Ministrial Officers Association' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই সংগঠনটি তার প্রতিষ্ঠা লগ্নে ঘোষণা করেছিল বেতন পরিকাঠামোর উন্নতির কথা, বেঙ্গল সরকারের বিভিন্ন বিভাগে কর্মরত কেরানীবাবুদের নানা সুযোগ-সুবিধার কথা ইত্যাদি। এছাড়াও এই সংগঠনটি সম্পূর্ণভাবে রাজনৈতিক প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়ার কথা ঘোষণা করেছিল। কিন্তু এই সংগঠনটি ১৯২৩ সালের নভেম্বর মাসে সরকারি স্বীকৃতি অর্জন করেছিল বেঙ্গল সরকারের কাছ থেকে।[২৪] এই সংগঠনটি ছাড়া বেঙ্গল সরকারের কর্মীরা আরো দুটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছিল। এই সময় Secretarial Association এবং Directorate Officers of Writers Building একত্রিত হয়ে ১৯২০ সালের ৪ঠা জুন গঠন করেছিল Writers Buildings Association।[২৫] Writers Buildings Association শেষ পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং বেঙ্গল Secretariat Association-এ নানা ধরনের পরিবর্তন ঘটে এবং All Bengal Ministrial Officers' Association-এর অস্তিত্ব আজ পর্যন্ত

পাওয়া যায়। যদিও এই সংগঠনটি রাজনৈতিক প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়ার কথা ঘোষণা করেছিল কিন্তু জাতীয়তাবাদী সংগঠনটি রাজনীতির প্রভাব থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হতে পারেনি। ১৯২৪ সালে এই সংগঠনটির বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেছিলেন বিপিন চন্দ্র পালের মতো বিখ্যাত জাতীয়তাবাদী নেতা। সেই বছর বিপিন চন্দ্র পাল এই সংগঠনটির সদস্যদের নানা সমস্যা নিয়ে বেঙ্গল সরকারের প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনা করেন। ২৭শে মার্চ ১৯২১ সালে অল বেঙ্গল কলেজ ও ইউনিভার্সিটি টিচার্স এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই সংগঠনটির সভাপতি ছিলেন বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যক্ষ জি. সি. বসু, সম্পাদক ছিলেন অধ্যাপক রাজকুমার চক্রবর্তী, এছাড়াও অন্যান্য সদস্যরা ছিলেন যেমন ডাঃ পি. সি. মিত্র, ডাঃ গৌরাঙ্গ ব্যানার্জী, মৃণাল কান্তি বসু, অধ্যাপক নৃপেন্দ্র চন্দ্র ব্যানার্জী প্রমুখ ব্যক্তিরা। ১৯২৬ সালের ২৯ ও ৩০শে আগস্ট এই সংগঠনটির প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ ভবনে এবং এই অনুষ্ঠানটিতে পৌরোহিত্য করেছিলেন শ্রী পি. সি. রায়।

১৯২৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল All India Federation of Teachers. ১৯২৮ সালে প্যারিসের আন্তর্জাতিক শিক্ষা কর্মীরা এই সংগঠনটির সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছিল কিন্তু ব্রিটিশ সরকার তাদের সর্বপ্রকার প্রচেষ্টাকে বিফল করে দিয়েছিল।[২৭] প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী পরিস্থিতিতে Reserve Bank-এর কেরানীরা সংগঠন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। Currency Association নামক একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং ১৯২৫ সাল একটি অধিবেশনের মধ্যে দিয়ে কলকাতায় All India Reserve Bank Employees Association প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।[২৮]

এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক ও Imperial Bank তাদের সংগঠন প্রতিষ্ঠিত করেছিল ১৯২৫ সালের পূর্বে কলকাতা ও বোম্বেতে।[২৯]

১৬ই জুলাই ১৯২৬ সালে Employees Association প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই সংগঠনটির সভাপতি ছিলেন সুরেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য ও মুকুন্দলাল সরকার। গোয়েন্দা বিভাগের রিপোর্ট অনুযায়ী মুকুন্দলাল সরকার ছিলেন Employees Gazette নামক এই সংগঠনটির মাসিক পত্রিকার সম্পাদক এবং তাঁর সঙ্গে আন্তর্জাতিক শ্রমিক নেতাদের সম্পর্ক ছিল। ১৯২৬ সালে এই সংগঠনটির সদস্যপদ ছিল ২০০০। সদস্যরা প্রতি মাসে চার টাকা করে সংগঠন অনুদান প্রদান করত। গোয়েন্দা বিভাগের রিপোর্ট অনুযায়ী মুকুন্দ লাল সরকার All Bengal Clerk's Conference-এর আয়োজন করেছিলেন ১২ই ডিসেম্বর ১৯২৫ সালে এ্যালবার্ট হলে। এই অধিবেশনের সভাপতি

ছিলেন আই. বি. সেন। এই অধিবেশনটি বহু ভারতীয় ও বিদেশী শ্রমিক সংগঠনের কাছ থেকে সমর্থন অর্জন করেছিল।[৩০]

১৫ই অক্টোবর ১৯২০ সালে Port Trust Employees Association প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই সংগঠনটির সভাপতি ছিলেন আই. বি. সেন, সহ সভাপতি ছিলেন মানবেন্দ্রনাথ রায়, জেনাবেল সেক্রেটাবি বা সাধারণ সম্পাদক ছিলেন শিবনাথ ব্যানার্জী, সম্পাদক ছিলেন এস. এল. তাজদানি।[৩১] কিন্তু এই সংগঠনটি কিছুদিনের মধ্যে বন্ধ হয়ে যায়। বাংলার একজন বিখ্যাত Trade Union Organiser মৃণাল কান্তি বসুর উদ্যোগে এই সংগঠনটি পুনরায় ১৯২৮ সালে ২০ই ফেব্রুয়ারী প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল।[৩২]

কেরানী আন্দোলনের ইতিহাসে ডাক বিভাগের বাবুকর্মীদের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। 'লেবার' পত্রিকা সঠিকভাবে উল্লেখ করেছিল যে কেরানী আন্দোলনের ইতিহাসে Indian Postal এবং R.M.S. বিভাগেব বাবুকর্মীদের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল এবং তারা কেরানীদের সংগঠিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ প্রয়াস গ্রহণ করেছিল।[৩৩] কিছুদিনের মধ্যেই ডাক বিভাগের বাবুকর্মীদের মধ্যে ভাঙ্গন দেখা গিয়েছিল এবং Lower Grade কর্মীরা উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছিল। ফলে ১৯২৯ সালে The All India Postman and Lower Grade Staff Union প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এছাড়াও ডাক বিভাগে আরো অনেক Union ক্রমশ প্রতিষ্ঠিত হতে শুরু করেছিল।[৩৪] ১৮ই ডিসেম্বর ১৯১৯ সালে Press Employees এসোসিয়েশন পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। গোয়েন্দা বিভাগের রিপোর্ট অনুযায়ী এই সংগঠনটি প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯০৬ সালে Press Karmachari Sangha এই নামে। এই সংঘ 'Unity' নামক একটি সংবাদপত্র প্রকাশ করেছিল এবং কিছুদিনের মধ্যে এই সংঘ বন্ধ হয়ে যায়। ১৮ই ডিসেম্বর ১৯১৯ সালে এই সংগঠনটি পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সাহিত্য পরিষদ হলে একটি মিটিংয়ের মধ্যে দিয়ে C. R. Das-এব সভাপতিত্বে। ১৯২৬ সালে এই সংগঠনটির সদস্য ছিল ৪০০০। ২৬শে ও ২৭শে জুন ১৯২৬ সালে সর্বভারতীয় মুদ্রণ কর্মচারী সংঘের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল কলকাতার টাউন হলে টি. সি. গোস্বামীর সভাপতিত্বে।[৩৫]

১৯২০ দশক জুড়ে বাংলার বিভিন্ন কেরানী সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হতে শুরু করেছিল। নতুন প্রজন্মের নেতৃবর্গ এই সময় কেরানীদের শোচনীয় অবস্থায় প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করতে শুরু করেছিল। বাংলার কেরানীবাবুদের দাবি-দাওয়া আদায়ের ক্ষেত্রে নতুন নেতৃবৃন্দ ১৯২০-র দশকে কেরানী আন্দোলনকে সঠিক পথে পরিচালনা করেছিল।

১৯৩০ ও ৪০-এর দশকে সমগ্র ভারতবর্ষ নানা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সাক্ষী হয়ে উঠেছিল। নানা আন্দোলন ও উত্থানের আবহাওয়ায় শুধু বাংলাতেই নয়, সমগ্র ভারতবর্ষে

কেরানী ও শ্রমিক আন্দোলন নতুন মাত্রা অর্জন করেছিল। ১৯৩০ ও ৪০-এর দশকে বাংলার কেরানী সংগঠন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে মৃণালকান্তি বসু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। বাংলার ১২৯২ সালে (ইংরেজির ১৮৮৬) যশোর শহর থেকে পাঁচ মাইল দূরে ফতেপুর নামক একটি ক্ষুদ্র পল্লীতে মৃণাল কান্তি বসুর জন্ম।[৩৬] ১৯০৫ সালে তিনি Metropolitan Institute-এ ভর্তি হন।[৩৭] ১৯০৭ সালে বি. এ. পাশ করেন। ১৯০৭ সালেই তিনি আইন পরীক্ষা দেন ও ১৯১০ সালে উকিল হন।[৩৮] এর পর 'যশোহর' পত্রিকাতে তার সাংবাদিকতা শুরু হয়েছিল।[৩৯] ১৯২৩-এর আগস্ট মাসে শ্রীঅরবিন্দ ঘোষের অনুরোধে তিনি 'বিজলী' কাগজের সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এরপর তিনি 'Forward'-এ যোগদান করেন। ১২ ই নভেম্বর ১৯২৪ সালে তিনি Forward থেকে পদত্যাগ করেন ও Amrita Bazar পত্রিকাতে যোগদান করেন। ১৯১২ সালে Indian Journalist Association প্রতিষ্ঠিত করেন মৃণাল কান্তি বসু।[৪০] মৃণাল কান্তি বসু চাকুরে সাংবাদিকদের অবস্থার উন্নতির জন্য একটি স্থায়ী কমিটি গঠন করেন। ১৯২০ সালে তিনি All India Trade Union Federation এর সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং ১৯৪০ পর্যন্ত প্রতি বছর বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পুনঃনির্বাচিত হয়েছেন। ১৯৩০ ও ৪০-এর দশকে বাংলার কেরানীবাবুরা নিজেদের অধিকার সম্পর্কে আরো সচেতন হয়ে উঠেছিলেন এবং তারা বিভিন্ন সংগঠন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে নিজের আন্দোলনকে সঠিক পথে পরিচালিত করেছিলেন। মৃণাল কান্তি বসু এই সময় বাংলার কেরানীবাবুদের নতুন সংগঠন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ করেন। ১৯৩০ ও ৪০-এর দশকে সমগ্র ভারতবর্ষ যখন বিভিন্ন ঘটনায় উত্তাল হয়ে উঠেছিল তখন বাংলার বহু নতুন কেরানী সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যথা Book Sellers and Publishers Employees Union, Zamindari Employees Union, Fire Service Employees Union, Insurance Employees Union, Registration Employees Union. এছাড়াও বেশ কিছু পুরাতন Employees Union পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যথা Mercantile Employees Union, Press Employees Union ইত্যাদি। বাংলার কেরানীবাবুরা নিজেদের দাবি-দাওয়া আদায়ের উদ্দেশ্যে নিজেদের সংগঠিত করেছিলেন এবং এই সংগঠনগুলির মধ্যে দিয়ে তারা নিজেদের অধিকারগুলি সম্পর্কে আরো সচেতন হয়ে উঠেছিলেন। Bengal Registration Employees Association গঠিত হয়েছিল ১৯২৮ সালে এবং ১৯৩০ সালে এই সংগঠনটির প্রথম আঞ্চলিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল।[৪১] মৃণাল কান্তি বসু এই সংগঠনটির সঙ্গে প্রথম থেকে যুক্ত ছিলেন এবং তার অনুরোধে ক্ষিতিশ চন্দ্র চক্রবর্তী এক বছরের জন্য এই সংগঠনের সভাপতি হন। Registration Employees Association বিশেষ কারণবশত ১৯৩০-এর পর হঠাৎ বন্ধ হয়ে

যায়। ১৯৩৫ সালে এই সংগঠনটি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং মৃণাল কান্তি বসু সভাপতি নির্বাচিত হন।[৪২] ১৯৩৯ সালের Press কেরানী সংগঠনের বাৎসরিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই সংগঠনের সভাপতি ছিলেন A. K. Acharia. প্রেস সংক্রান্ত বহু প্রস্তাব এই অধিবেশনে পাস করা হয়েছিল, যথা — প্রেস কর্মীদের সঠিক বেতন, P.F. এর সুবিধা, ছুটি সংক্রান্ত প্রস্তাব, প্রেসের স্থায়ী কর্মী ইত্যাদি।[৪৩] ১৯৩৯ সালের আগস্ট মাসে প্রেসকর্মীদের একটি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। Abdul Halim Gaznabi ছিলেন এই সংগঠনের সভাপতি। মৃণাল কান্তি বসু প্রেস কর্মীদের শোচনীয় অবস্থার কথা Abdul Halim Gaznabi-কে বলেন এবং শ্রী বসু মনে করেন যে শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে প্রেসকর্মীরা তাদের দাবি আদায় করতে পারবে।[৪৪]

Mercantile Office গুলি নিজেদের সংগঠিত করার উদ্দেশ্যে ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে একটি অধিবেশন অনুষ্ঠিত করেছিল। এই সংগঠনটির সভাপতি ছিলেন মৃণাল কান্তি বসু।[৪৫] বিভিন্ন Mercantile Office-এর মালিকপক্ষ স্বল্প বেতন দিয়ে কর্মচারীদের শোষণ করত। মৃণাল কান্তি বসু এই ধরনের শোষণের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন। Zamindari Employees এসোসিয়েশন ১৯৪০ সালের মে মাসে তাদের বাৎসরিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত করেছিল। বাংলার জমিদাররা নানা ভাবে তাদের কর্মচারীদের শোষণ করতেন। তাদের বেতন ছিল স্বল্প, এছাড়া তাদের পদোন্নতির কোন সুযোগ ছিল না। জমিদারি কর্মচারীরা তাদের বাৎসরিক অধিবেশনে নিজেদের সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনা করেন। মৃণাল কান্তি বসু বলেন যে স্বল্প বেতনের দরুন এই সংগঠনের কর্মচারীরা অসৎ উপায় অর্থ উপার্জন করত।[৪৬] ১৯৪৩ সালের ডিসেম্বর-এ মৃণাল কান্তি বসু Postal ও R.M.S. Union-এর সভাপতি রূপে তাদের অধিবেশনে যোগদান করেন। মৃণাল কান্তি বসু এই অধিবেশনে বলেন যে ১৯৪৩-৪৪ সাল নাগাদ ডাক ও তার বিভাগ প্রায় সাত কোটি টাকা লাভ করেছিল এবং এই অর্থের কিছু অংশ ডাক ও তার বিভাগের কর্মচারীদের দেওয়া উচিত কারণ তাদের বেতন ছিল স্বল্প।

১৯৪৫ সালের জানুয়ারী মাস থেকে ই. আই. রেলের কেরানীবাবুরা তাদের দাবিগুলি পেশ করতে থাকে। এর ফলে কর্তৃপক্ষ কেরানীদের বরখাস্ত করতে শুরু করেছিল। এই ধরনের বরখাস্তের ফলে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে, শেষ পর্যন্ত ১৯৪৫ সালের ১৯শে অক্টোবর একটি মিটিং-এর মাধ্যমে রেলের জেনারেল ম্যানেজার প্রতিশ্রুতি দেন যে একমাসের মধ্যে তিনি রেলের কেরানীদের অবস্থা উন্নতি করার ক্ষেত্রে সচেষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করবেন।[৪৭] ১৯৪৬ সালের মার্চ মাস নাগাদ Fire Service

Employees Union একটি নোটিস পেয়েছিল যে ৩১শে মার্চের পর তাদের বরখাস্ত করা হবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় দমকলবাহিনী (Fire Service-এর) কর্মচারিরা সরকার ও জনসাধারণকে বহু ধরনের সাহায্য করেছিল। যুদ্ধের পর যদি Fire Service-এর কেরানীবাবুদের চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয় সেই ক্ষেত্রে তারা নানা ধরনের অসুবিধার সম্মুখীন হবেন—এই মর্মে তারা সরকারের কাছে একটি পিটিশন পাঠিয়েছিলেন কিন্তু সরকার তা অগ্রাহ্য করেছিল। এর ফলে ১৯৪৬ সালের ২৩শে এপ্রিল থেকে (Fire Service Employees) আন্দোলনের পথ অবলম্বন করেন।[৪৮] শ্রমিক কর্মচারীদের আন্দোলনের ফলে হাওড়া ও কলকাতার প্রায় ১৬টি ফায়ার স্টেশন বন্ধ হয়ে যায়। আন্দোলনকারীরা কর্তৃপক্ষের নোটিস সত্ত্বেও কাজে যোগ দেয়নি এবং শেষ পর্যন্ত একটি দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান হয়েছিল।[৪৮]

১৯৪৪-৪৫ সাল নাগাদ ভারতের কমিউনিস্ট দল (Communist Party of India) শ্রমিক আন্দোলনের পাশাপাশি কেরানীদের সংগঠিত আন্দোলনকে সমর্থন করতে শুরু করেছিল। এই সময় কমিউনিস্টরা কলকাতার ডালহাউসি স্কোয়ার ও অন্যান্য অঞ্চলের সরকারি ও বেসরকারি অফিসের কেরানীবাবুদের আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়েছিল। এই সময় প্রদ্যোত ঘোষের নেতৃত্বে Marcantile Office Employees Union গঠিত হয়। ১৯৪৫ সাল নাগাদ প্রদ্যোত ঘোষ Communist Party থেকে পদত্যাগ করেছিলেন কিন্তু তিনি তার জীবনের শেষদিন পর্যন্ত কেরানী আন্দোলনকে সমর্থন করেছিলেন।

এছাড়াও দেখা যায় যে কমিউনিস্ট ট্রেড ইউনিয়ন নেতা আব্দুল মোমিন এগিয়ে এসেছিলেন কেরানী আন্দোলনকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে। কৃষ্ণ গোপাল ঘোষের মতো বিখ্যাত নেতাও এগিয়ে এসেছিলেন সরকারি দফতরের কেরানীবাবুদের সংগঠিত করার উদ্দেশ্যে।[৪৯]

সুনীল চট্টোপাধ্যায় ১৯৪০ সালে তার নাটক 'কেরানী'-তে দেখিয়েছিলেন যে মেনেজাররা প্রতিনিয়ত কেরানীবাবুদের অপমান করত এবং কেরানীবাবুরা এই ধরনের অপমানকে বরখাস্ত হওয়ার ভয়ে সহ্য করত।[৫০] কিন্তু ক্রমশ এই চিত্রের পরিবর্তন ঘটতে শুরু করেছিল। কেরানীবাবুরা তাদের অবস্থান সম্পর্কে সচেতন হতে শুরু করেছিলেন এবং ক্রমশ কেরানীবাবুরা রাজনৈতিকভাবে সচেতন ও সংগঠিত হয়ে উঠেছিল।

বাংলার বাবুকর্মী অর্থাৎ কেরানীবাবুরা ছিলেন শিক্ষিত মধ্য-শ্রেণীব। মার্ক্সবাদী চিন্তাধারা তাদের শ্রেণী সংগ্রামে উদ্‌বুদ্ধ করেছিল এবং তারা রাষ্ট্র ও পুঁজিবাদিদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে শুরু করেছিল।

বাংলার এই কেরানী সম্প্রদায় স্বাধীনতার পরবর্তী অধ্যায়ে আরো সংগঠিত ও রাজনৈতিকভাবে সচেতন হয়ে উঠেছিল এবং তাদের আন্দোলনকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে পেরেছিল। উপরের আলোচনা থেকে আমাদের সিদ্ধান্ত এই :

"The overall fact remains that in Bengal the white collar employees who were once tortured, exploited and unorganised became gradually much more organised and aware about their rights.

The white collar class may be termed as labour elite as against large masses of manual labour."

নির্দেশিকা

১। আর. সি. মজুমদার, *হিষ্ট্রি অফ্ দ্য ফ্রিডম মুভমেন্ট ইন ইন্ডিয়া খন্ড -২* (১৯৬২) সুমিত সরকার প্রণীত *দ্য স্বদেশী মুভমেন্ট ইন বেঙ্গল* ১৯০৩-০৮ উদ্ধৃত (পিপলস পাবলিশিং হাউস ১৯৭৩ পৃঃ ১৮২)।

২। আই. এম. রিনসার এবং এন এন. গোল্ড বার্গ (সম্পাদিত), *তিলক এ্যান্ড দ্য স্ট্রাগল ফর ইন্ডিয়ান ফ্রিডম* (নিউ দিল্লী ১৯৬৬) ঐ।

৩। এই পুস্তকগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ

(ক) যাদু গোপাল মুখার্জী, বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি (১৯৫৬)। ১৯০৫-০৬-র মধ্যে সংঘটিত গাড়োয়ান, বার্ন কোম্পানীর কেরানী, ট্রাম কনডাক্টর, মুদ্রণ ও রেলকর্মীদের ধর্মঘটগুলি উল্লেখ রয়েছে এবং প্রভাত কুসুম রায়চৌধুরী ও অপূর্ব কুমার ঘোষ কর্তৃক প্রচারিত সুদৃঢ় সমাজ তান্ত্রিক মতাদর্শেরও উল্লেখ করা হয়েছে এখানে।

(খ) ডাঃ ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত, *ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম* (১৯৪৯) এতে স্বল্প পরিচিত অপূর্ব কুমার ঘোষ সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য রয়েছে।

(গ) কৃষ্ণ কুমার মিত্র, *আত্মচরিত* (১৯৩৭) ১৬ই অক্টোবর ১৯০৫-এ অশ্বিনী কুমার ব্যানার্জী কর্তৃক আয়োজিত গাড়োয়ানদের হরতালটির বিবরণ রয়েছে। ঐ পৃঃ ১৮৩।

৪। ঐ অধ্যায় - ৫, বিভাগ - ৩

৫। বিজয়া-সম্মিলন - *বঙ্গদর্শন*, কার্তিক ১৩১২ (১৯০৫) পি. আর, ঐ পৃঃ ১৮৯।

৬। *সঞ্জীবনী,* ২৮শে ১৩১২;৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯০৫ সঠিক সংখ্যা দেওয়া হয়েছে, ঐ পৃঃ ২০০

৭। অমৃতবাজার পত্রিকা, ৯ই সেপ্টেম্বর, ১৯০৫ সি এফ হাওড়ার মাসিক সংখ্যা দেওয়া হয়েছে। হাওড়া মান্থলি আলোচনা, আশ্বিন ১৩১২। এখানে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাবুদের প্রতি দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা দুর্ব্যবহারের প্রেক্ষাপট রয়েছে। এ বিষয়ে জনৈক কেরানীবাবু উল্লেখ করেছেন একটি পত্রে, যেটি প্রকাশিত হয়েছে ১০ই সেপ্টেম্বর ১৯০৫ *বেঙ্গলী* পত্রিকায়। ঐ।

৮। *বেঙ্গলী,* ৪ঠা অক্টোবর ১৯০৫। ঐ।

৯। *জ্ঞান চন্দ্র ব্যানার্জীর অপ্রকাশিত ডায়েরী,* লেখা হয়েছে ৪ঠা অক্টোবর ১৯০৫। ঐ।

১০। *বেঙ্গলী,* ১৯শে অক্টোবর, ১৯০৫। ঐ পৃঃ ২০৪।

১১। *অমৃতবাজার পত্রিকা* ১৭ ঐ।

১২। ২৬টি বেসরকারি মুদ্রণ সংস্থার ৯টিতে কর্মরত ৫০ জনেরও বেশি কলকাতাতে সংবাদপত্রগুলির অংশভুক্ত ছিলেন। *স্টেটমেন্ট অফ ইন্ডাষ্ট্রিয়াল লেবার (১৯০১-০৫) গভর্নমেন্ট অফ বেঙ্গল জেনারেল মিসলেনিয়াস প্রোগ্রেস বি,* সেপ্টেম্বর, ১৯০৭, ঐ পৃঃ ২০৬।

১৩।,বঙ্গ সরকার প্রথম পাক্ষিক প্রতিবেদন, বঙ্গ বিভাজনের বিরুদ্ধে আন্দোলন এবং স্বদেশী সংগ্রামের প্রগতির বিষয়ে। এফ. এ. আর. নং ১, ১৭ই সেপ্টেম্বর ১৯০৬, প্যারা ১০ হোম পাবলিক প্রোগ্রেস, বি. অক্টোবর ১৯০৬, পৃঃ ১৩ ঐ পৃঃ ২০৭।

১৪। *অ্যাডমিনিষ্ট্রেশন অফ বেঙ্গল,* অ্যান্ড্রু ফ্রেজার, ১৯০৩-১৯০৮ বিভাগ 'ইন্ডাস্ট্রিয়াল' আনরেষ্ট ঐ পৃঃ ২০৯।

১৫। *ডেইলী হিতবাদী,* ২৩-২৪শে মার্চ ১৯০৬ আর. এন. পি. (বি) সপ্তাহান্তের জন্য ৩১ শে মার্চ ১৯০৬। ঐ।

১৬। ১৯০৫-এ রেলকর্মীরা ৩৭২, ৯৫১ সংখ্যক লাইনগুলি খোলেন। তাছাড়া, রেলপথগুলির সাথে সংযুক্ত কারখানাগুলিতে ৭৯,০৮২ জন কর্মী নিযুক্ত ছিলেন। বাংলাদেশে এই রকম তিনটি কারখানায় — লিলুয়ায়, খড়গপুরে এবং জামালপুরে যথাক্রমে প্রায় ৫০০০, ৩৬০০ এবং ৮২০০ জন মানুষ কর্মরত ছিল। ঐ ২১৫।

১৭। এফ এ আর-এর ৯নং অনুচ্ছেদ ২, ৮ অক্টোবর ১৯০৬ (বাংলা থেকে পাক্ষিক প্রতিবেদন) *হোম পাবলিক প্রোগ্রেস*, এ, ডিসেম্বর ১৯০৬ এন ১৪৪ ঐ পৃঃ ২২৪।

১৮। ঐ পৃঃ ২২৫

১৯। ঐ।

২০। পঞ্চানন সাহা, *হিস্টরি অফ ওয়ার্কিং ক্লাস মুভমেন্ট* ইন বেঙ্গল, নিউ দিল্লী, ১৯৭৮, পৃঃ ২১৮।

২১। ঐ পৃঃ ২২০।

২২। ঐ পৃঃ ২২৩।

২৩। ঐ পৃঃ ২১৯।

২৪। সুকোমল সেন, ওয়ার্কিং ক্লাস অফ ইন্ডিয়া ঃ হিস্টরি অফ ইমারজেন্স এবং মুভমেন্ট, ১৮৩০-১৯৭০, কলকাতা ১৯৭৭, পৃঃ ৪২৮।

২৫। ঐ পৃঃ ৪২৮।

২৬। ঐ পৃঃ ৪৩০।

২৭। ঐ পৃঃ ৪৩০।

২৮। ঐ পৃঃ ৪২৭।

২৯। ঐ পৃঃ ৪২৯-৪৩০।

৩০। পঞ্চানন সাহা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২২৩।

৩১। মৃণালকান্তি বসু, স্মৃতিকথা, কলকাতা, ১৩৬২ বঙ্গাব্দ, ফৃঃ ২১৩।

৩২। ঐ পৃঃ ২১৩।

৩৩। সুকোমল সেন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪২৪।

৩৪। ঐ পৃঃ ৪২৫।

৩৫। পঞ্চানন সাহা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২২৩।

৩৬। মৃণালকান্তি বসু - স্মৃতিকথা প্রাগুক্ত, পৃঃ ২।

৩৭। ঐ পৃঃ ৩৪।

৩৮। ঐ পৃঃ ৪৭।

৩৯। ঐ পৃঃ ৯৩।

৪০। ঐ পৃঃ ১২৩।

৪১। ঐ পৃঃ ২১৪।

৪২। ঐ পৃঃ ২৪১।

৪৩। ঐ পৃঃ ২২৮।

৪৪। ঐ পৃঃ ২৪২।

৪৫। ঐ পৃঃ ২৪২।

৪৬। ঐ পৃঃ ২৫৭।

৪৭। ঐ পৃঃ ৩২০।

৪৮। ঐ পৃঃ ৩৩১

৪৯। সরোজ মুখার্জী, *ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি ও আমরা,* ১৯৮৬, দ্বিতীয় খন্ড, পৃঃ ৩২৬-৩৭।

৫০। সুনীল চট্টোপাধ্যায়, *কেবানী* (বাংলা নাটক), কলকাতা, ১৯৪০।

১১

ইউরোপের শ্রমশক্তি

*রঞ্জিত সেন

উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে ইউরোপে শ্রমসংগঠনের কাঠামো বদলাতে থাকে। এই বদলানোর কাজ শুরু হয় প্রথমত ইংল্যান্ডে। সেখানে শিল্পবিপ্লব চলছিল, পুঁজির প্রকোপ বাড়ছিল আর তার সঙ্গে বাড়ছিল পুঁজিবাদীদের দাপট। এদিকে দেশের জনসংখ্যাও বাড়ছিল আর তার সঙ্গে তাল রেখে বাড়ছিল নির্বাচকমন্ডলীর (Electorate) আয়তন। এক ক্রমপ্রসারশীল নির্বাচকমন্ডলীর উপর নিজেদের প্রাধান্য বজায় রাখার জন্য রাজনৈতিক দলগুলিও নিজেদের কাঠামোর সংস্কার ও বিস্তারের জন্য নতুন নতুন পরিকল্পনা করছিল। ইতিমধ্যে ১৮৬৭ ও ১৮৬৮ সালে রিফর্ম এ্যাক্ট (Reform Act) দুটি চালু হওয়ার ফলে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি বদলাচ্ছিল। ১৮৩০-এর দশক থেকে শুরু করে একটানা তিরিশ, চল্লিশ বা পঞ্চাশ বছর সমস্ত ইংল্যান্ড জুড়ে চলছিল আলোড়ন। জনমত উথালপাতাল হচ্ছিল এই ধারণায় যে উনিশ শতক পর্যন্ত যে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলি ইংল্যান্ডে গড়ে উঠেছিল তা নতুন যুগের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, তার আমূল পরিবর্তন দরকার। সরকার অস্বস্তিতে ভুগছিল এই ভেবে যে নতুন পরিস্থিতিতে পরিবর্তিত জনমত সরকারের সমর্থনে আসছে না কারণ সরকারের সংগঠনগুলি আর কোনভাবেই যুগোপযুগী বলে গণ্য হচ্ছে না। অর্থাৎ যে ভিক্টোরিও শান্তির (Victorian peace) কথা ইংল্যান্ড গর্ব করে বলতে শুরু করেছিল তার মর্মমূলে ছিল অশান্তি। চার্টিষ্ট আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছিল একথা ঠিক, কিন্তু তার

---

* অধ্যাপক, ইসলামিক ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

অপূর্ণ দাবী দেশময় একটা উত্তেজনার পরিবেশ তৈরী করেছিল। জন ব্রাইটের (John Bright) মতো উদারনৈতিক ব্যক্তিরা গোপন ব্যালটের জন্য আন্দোলন করছিলেন এবং লর্ড জন রাসেলের মতো উদারনৈতিক হুইগ নেতারা ফ্র্যান্‌চাইস (Franchise) অর্থাৎ নির্বাচকমন্ডলীর বিস্তারের জন্য লড়াই করছিলেন। এমনকি ১৮৫৯ সালে রক্ষণশীল ডিসরেলিও পার্লামেন্টে একটি জটিল সংস্কার বিলের উত্থাপন করলেন। এইরকম পরিবর্তনের জন্য উদগ্রীব জাতির হাল ধরেছিলেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী গ্ল্যাডস্টোন তাঁর প্রথম শাসনকালে (১৮৬৮-১৮৭৪)। পাঁচ বছরের এই শাসনকালে তিনি ইংল্যান্ডের রাজনীতি ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় নানা পরিবর্তনের সূচনা করেছিলেন। নির্বাচনে ব্যালটের গোপনীয়তা থেকে শুরু করে সামরিক বিভাগ, আইন ও বিচার বিভাগ প্রভৃতি সমস্ত নানা দিকে তিনি সংস্কার চালু করেছিলেন। দেশ জুড়ে এসেছিল একটা নতুন পরিবর্তনের হাওয়া।

এই পরিবর্তনের মধ্যে দুটি সংস্কার কার্য দেশের অর্থনীতিকে পরোক্ষভাবে, কিন্তু গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। একটি হল ১৮৭৩ সালের বিচারবিভাগ সংক্রান্ত আইন (*Judicature Act of 1873*)। এই আইন দেশের আদালতগুলির কাঠামো এবং বিচার বিভাগের অন্তর্নিহিত নীতি ও পদ্ধতি উভয়কেই বদলে দিয়েছিল। দ্বিতীয়টি হল, ১৮৫৩ থেকে ১৮৬০-এর মধ্যে দেশের বাজেট রচনার সময়ে আর্থিক পরিবর্তনের নীতি ও পরিবর্তনের রূপরেখা স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল। আর্থিক সংগঠন ঢেলে সাজানোর কাজ শুরু করেছিলেন পীল (Peel)। তাকে সমাপ্তি পর্যন্ত নিয়ে গেলেন গ্ল্যাডস্টোন। ইতিমধ্যেই ১৮৬৬ সালে চালু হয়েছিল অডিটিং ব্যবস্থার (auditing system) পরিবর্তন। সরকারি আয়-ব্যয়ের হিসাব পর্যালোচনার নতুন ও আধুনিক বন্দোবস্ত চালু হল। দেশের public accounts-কে পরিশীলিত পর্যালোচনা করার এই ব্যবস্থা দেশের ব্যবসা ও বাণিজ্যের জগতে আগামী দিনের নতুন সংগঠনের সুবিধা এনে দিল।

উনিশ শতকের তৃতীয় দশক থেকে ইংল্যান্ডে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে ফ্রান্সে পুঁজি ও বাণিজ্যিক উদ্যোগ ও সংগঠনের পরিবর্তন আসছিল। পশ্চিম ইউরোপের অর্থনীতিতে দুটি জিনিষের প্রাধান্য বাড়ছিল — এক, limited liability company বা সীমিত দায়িত্বের কম্পানী এবং দুই, *joint stock capital for investment* বা বিনিয়োগের জন্য যৌথ পুঁজি। এর ফলে উৎপাদন ব্যবস্থায় দুটি মৌল উপাদান, মালিকানা (ownership) ও ব্যবস্থাপনা (management) এই দুই-এর সম্পর্ক নতুনভাবে নিরূপিত হতে লাগল। এই নতুন সম্পর্ক রচনার পটভূমিকা রচনা করে দিয়েছিল পশ্চিম ইউরোপের কিছু শিল্প ও বাণিজ্যিক আইন — ইংল্যান্ডের ১৮৫৫ ও ১৮৬২

সালের কম্পানী আইন (*Company Legislations of 1855 and 1862*), ফ্রান্সের ১৮৬৩ ও ১৮৬৭ সালের অনুরূপ আইন এবং ১৮৬১ সালের জার্মানির বাণিজ্যিক আইনবিধি (*Commercial Code of 1861*)। এই আইনগুলি বাণিজ্যিক সংগঠন ও ব্যবস্থাপন, পুঁজির ঘনীভবন ও প্রয়োগ এবং শোষণের মুখোমুখি শ্রমের নবোদ্বোধন ঘটানোর জন্য অনেকখানি দায়ী ছিল। বলা যেতে পারে যে ১৮৬০-এর দশক থেকে জয়েন্ট স্টক কম্পানী বা যৌথ পুঁজির উদ্যোগ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সহজ ও সাধারণ নিয়ম হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। একজন ঐতিহাসিক বলেছেন যে প্রসারশীল নির্বাচকমন্ডলী যেমন শাসন ব্যবস্থাকে গণতন্ত্রীকরণ করছিল সেইভাবে এইরকম ব্যবসায়ের যৌথ সংগঠন পুঁজির গণতন্ত্রীকরণে সাহায্য করছিল। এইসময় থেকে হিসাবশাস্ত্র (Accountancy) বাণিজ্যের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় একটি শৃঙ্খলারূপে আত্মপ্রকাশ করে। সাম্রাজ্যবাদ ও সামুদ্রিক বাণিজ্যের হাত ধরে দেশীয় ব্যবসা যখন অন্তর্দেশীয় ব্যবসা হয়ে মহাদেশীয় ও শেষে বৃহত্তর ভুবনিক ব্যবসা হয়ে দাঁড়াচ্ছিল তখন বাণিজ্যের গাণিতিক রূপ একটি পরিশীলিত হিসাবশাস্ত্রের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করছিল। এইসময় থেকে এ্যাকাউন্ট্যান্সি বা হিসাবশাস্ত্র একটি স্বতন্ত্র বিষয়রূপে পঠিত হতে থাকে এবং উদীয়মান প্রজন্মের কাছে এই শাস্ত্র একটি নতুন জীবিকার দ্বার খুলে দেয়। এইসময় থেকে হিসাবরক্ষকদের সমাজ ও সংগঠন (Societies of Accountants) গড়ে উঠতে থাকে এবং আর্থিক হিসাব নিকাশের (financial accounting) আরও বৌদ্ধিক ও বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতি আবিষ্কৃত হতে থাকে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে পুঁজির ব্যবস্থাপনার বাণিজ্যিক একক ও শিল্প সংগঠনগুলির আয়তন ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছিল এবং তারা ভুবনায়িত বাণিজ্যের চাপে অতিকায় রূপ নিচ্ছিল। এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে শ্রমসংগঠনগুলিও ধীরে ধীরে প্রকান্ড এক একটি এককরূপে আত্মপ্রকাশ করছিল। এক সময়ে ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে সন্দেহের চোখে দেখা হত। ভাবা হত যে শ্রমিক ঐক্য বাণিজ্য-বিরোধী, পুঁজির যথোপযুক্ত প্রয়োগের অন্তরায় এবং দেশের জনগণের স্বার্থরক্ষাকারী সাধারণ আইন বা common law-এর বিরুদ্ধে সংগোপন ষড়যন্ত্র। এ ধারণা বদলাতে থাকে ১৮৬০-এর দশক থেকে। ১৮৭১ সালে ব্রিটিশ ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে সংরক্ষণের জন্য আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হল। তাদের তহবিল, তাদের সম্মিলিত ও সংগঠিত রূপ, মালিকদের ও পুঁজিপতিদের মুখোমুখি তাদের নিজেদের দর বুঝে নেওয়ার যৌথ ক্ষমতা (collective bargaining) এই সমস্ত কিছুকে একটা আইনি প্রতিরক্ষার মধ্যে আনা হল। এতদিন ধরে ভাবা হত যে ট্রেড ইউনিয়নগুলি দেশের সাধারণ আইন (Common Law) ও সংবিধানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী। এই সন্দেহ এবার দূরীভূত হল। অর্থাৎ ১৮৭০-এর দশকের সূচনা থেকে

ট্রেড ইউনিয়নগুলি তাদের জর্জরিত অবস্থা কাটিয়ে অনেকটা মুক্ত সংগঠনের রূপ নিল। ১৮৬০-এর দশক থেকেই দেশের রাজনৈতিক সংস্কারের সাথে সাথে শ্রমিকদের সম্বন্ধে ভিন্নতর সচেতনতা দেখা যাচ্ছিল। ১৮৬৮ সালে ম্যানচেষ্টারে ব্রিটেনের ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের (Trades Union Congress) প্রথম অধিবেশন বসে। এটি ছিল সংক্ষিপ্ত আকারের অধিবেশন। এই অধিবেশন সারা দেশের ১,১৮,০০০ ট্রেড ইউনিয়নিষ্টদের প্রতিনিধিত্ব করেছিল। এ ঘটনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ব্রিটিশ শ্রমশক্তির জাতীয় সংগঠন (*National Organization of British Labour*) এইভাবেই আত্মপ্রকাশ করেছিল দেশের রিফর্ম এ্যাক্টস বা সংস্কার আইনগুলির সমান্তরালভাবে। পশ্চিম ইউরোপের শ্রমশক্তির সংগঠনের নতুন যুগ আরম্ভ হল। মনে রাখতে হবে যে ইংল্যান্ডে এই যে জাতীয় শ্রমসংগঠনের উদ্ভাবন তা কিন্তু কোন স্বতন্ত্র ঘটনা নয়। এক বিরাট শিল্পায়ন ও গণতান্ত্রিকতার উদ্ভাবন ও উদযাপন হচ্ছিল এই সময়ে। নির্বাচন বনিয়াদের প্রসারণ (expansion of the franchise), বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, আর্থিক ব্যবস্থা, প্রশাসন, বিচার ব্যবস্থার সমস্ত কিছুর মধ্যে সংস্কার, পরিবর্তন, স্ফীতি ও বিবর্তন দেখা যাচ্ছিল। শ্রমব্যবস্থা ও সংগঠনও তারই অঙ্গীভূত সমাজ গঠনতন্ত্রের একটি দিক মাত্র। পশ্চিম ইউরোপের শ্রমব্যবস্থার উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের পরিবর্তনকে এরই প্রেক্ষিতে ভাবতে হবে।

একথা মনে রাখা দরকার যে কোন দেশের শ্রমশক্তির সংগঠন ও শ্রম আন্দোলন সেই দেশের সমবায় আন্দোলনের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত। ইউরোপে সমবায় আন্দোলনের পীঠস্থান ছিল ফ্রান্স এবং ইংল্যান্ড। ফ্রান্সে ১৮৩০-এর দশক থেকে উৎপাদনকারীদের (producers) সমবায় আন্দোলন ধীরে ধীরে গতিলাভ করছিল। ১৮৮০-র দশকে এই আন্দোলন আরও বিস্ফারিত রূপ নিয়েছিল। এই কারণে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই ফ্রান্সকে 'উৎপাদনকারীদের সমবায়ের আশ্রয়স্থল' — *home of producers' co-operatives* — বলে চিহ্নিত করা হয়েছিল। ১৮৮০ থেকে ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাকমুহূর্ত পর্যন্ত উৎপাদনকারী মালিকদের সমবায় ১০০ থেকে বেড়ে হয়েছিল ৪৫০। শিল্পায়নের দুরন্ত প্রবাহ টালমাটাল করে তুলেছিল মালিক ও শ্রমিক উভয়ের অস্তিত্বকে। তাই উৎপাদনকারী মালিকরা ১৮৯৪ সালের পর 'পরামর্শ দপ্তর' বা consultative chamber নামে একটি সংগঠন গড়ে তুলেছিল যার কাজই ছিল বিভিন্ন উৎপাদনকারীদের সমবায়গুলিকে একটা সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থার মধ্যে আনা। উৎপাদনকারীদের সমবায়ের বিপরীত ছবিকে গড়ে তুলেছিল ব্রিটেন। সেখানে গড়ে উঠেছিল ভোক্তাদের সমবায় (Consumers' Co-operative)। ফ্রান্সের মুখোমুখি ব্রিটেনকে বলা হয়ে থাকে *traditional home of consumers' co-operative* বা ভোক্তা সমবায়ের প্রথাগত আশ্রয়। সেখানে রকডেল (Rochdale)

নামক স্থানে ১৮৪৪ সালে সর্বপ্রথম ভোক্তাদের সমবায় (Consumers' Co-operative) গড়ে উঠেছিল। আর সেই সমবায়ের গতি শতাব্দীর শেষে ব্যাপক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ১৮৬৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ইংলিশ কো-অপারেটিভ হোলসেল সোসাইটি (*English Co-operative Wholesale Society*)। এর পাঁচ বছর পরে অনুরূপ একটি সংগঠন স্কটল্যান্ডে স্থাপিত হয়েছিল। বিচ্ছিন্ন, বিশ্লিষ্ট, একক সমবায়গুলিকে একত্রিত করে তাদের সংযুক্ত অস্তিত্ব গড়ে তুলে জাতীয় পর্যায়ের একটি ভোক্তা সংগঠন গড়ে তোলাই এর লক্ষ্য ছিল। এই দুটিই ছিল ফেডারেশনধর্মী সংগঠন — ভোক্তা সমাজের জোট (*Federation of Consumers' Societies*)। যে কোন ভোক্তা সমবায়ের মতো এদেরও লক্ষ্য ছিল ব্যবসায়ে মধ্যব্যক্তির (middleman) অপসারণ। ১৮৭০-এর দশকে ভোক্তা সমবায়ের কর্মসূচী এত বেড়েছিল যে উৎপাদন, বীমা, ব্যাঙ্কিং এবং এমনকি জমির মালিকানাতেও (landowning) তাদের তৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। ইংল্যান্ডে ও ফ্রান্সে যত তাড়াতাড়ি এবং যত গভীরভাবে উৎপাদনকারী ও ভোক্তাদের সমবায় গড়ে উঠেছিল জার্মানিতে তত দ্রুত ও গভীরভাবে এই সমবায় প্রথা গড়ে ওঠেনি। শতাব্দীর শেষে, ১৮৯৯ সালে, হামবুর্গে এরকম একটি সমাজ আত্মপ্রকাশ করেছিল। তার নাম ছিল 'হামবুর্গ উৎপাদন সমাজ' (*Hamburg Society of Production*)। এদের লক্ষ্য ছিল উৎপাদনের সঙ্গে বৃহত্তর সমাজ সংগঠন। হামবুর্গ সমাজ আত্মপ্রকাশ করাব ছয় বছর আগে ১৮৯৩ সালে সেখানে গড়ে উঠেছিল একটি নতুন সমাজ যাকে ইংরাজী ভাষায় বলা হত *Wholesale Society*। এর উদ্দেশ্য ছিল পারস্পরিক সাহায্যার্থে আর্থিক সমবায় গড়ে তোলা। আধুনিককালে এইরকম সমবায়কে বলা হয় *Mutual Credit Association*। মূলতঃ কৃষি শ্রমিক ও কৃষকদের সহায়তা করার জন্য এই সমবায় আত্মপ্রকাশ করেছিল। কৃষিকাজের বাইরে শিল্প শ্রমিকদের জন্য ভিন্নতর এক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছিল। সরাসরি তারা যাতে ব্যবসায়ে অংশগ্রহণ করতে পারে, মালিকানার অংশীদার হতে পারে, ব্যবসা বা শিল্প থেকে আগত মুনাফার ভাগ পেতে পারে তার জন্য তাকে ব্যবসার সহ অংশীদার বা co-partner করার চেষ্টা চলতে লাগল। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা। ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও জার্মানিতে এই প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছিল। সেখানে মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক ঠিক রেখে শিল্পের উৎপাদন ও বাণিজ্যের প্রসার অব্যাহত রাখার জন্য কিছু কিছু কোম্পানী বা ফার্ম (Firms) এই ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল। শ্রমিককে কো-পার্টনারশিপে আনার পরীক্ষা চালিয়েছিল ফ্রান্সের কয়েকটি ব্যাঙ্ক, ক্রেডিট ফার্ম ও বীমা কোম্পানী। ইংল্যান্ডে এ প্রয়াস গ্রহণ করেছিল কয়েকটি গ্যাস কোম্পানী। জার্মানিতে কৃষি উৎপাদনের খামার জাতীয় ফার্ম, জমি ব্যবসায়ের কোম্পানী ও সম্পত্তি তদারকির প্রতিষ্ঠান (estate managing firms)। প্রথমদিকে এই বৈপ্লবিক নীরিক্ষা কিছুটা

সফল হলেও ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগেই এই প্রয়াস ভাটা পড়তে থাকে এবং শ্রমিককে মুনাফার অংশীদার করার আন্দোলন নিস্তেজ হয়ে পড়ে।

সমবায় আন্দোলন ইউরোপের এক একটি দেশে তাদের নিজেদের অর্থনীতির সঙ্গে মানানসই ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছিল। ডেনমার্ক, ইটালি, নেদারল্যান্ডস, ফিনল্যান্ড ও আয়ারল্যান্ডে সমবায় গঠিত হয়েছিল মূলতঃ কৃষিপণ্য ও দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য নিয়ে। কৃষিপণ্যও সেখানে শিল্পের আকার নিয়েছিল এবং ডেয়েরি (daries) শিল্প সেখানে প্রকান্ড আকার ধারণ করেছিল। ডেনমার্কে ডেয়েরি এত ব্যাপক সমবায়ের রূপ নিয়েছিল যা কোথাও দেখা যায়নি। ১৮৯২ সালের মধ্যে সেখানে ১০০০টি ডেয়েরি সমবায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সেখানে ডিম, দুধ, ফল, মাংস, মাখন ইত্যাদি খাদ্য দ্রব্যের উৎপাদন ও বিপণন প্রায় সম্পূর্ণভাবে সমবায়ের মাধ্যমে ঘটছিল। এ বিষয়ে ইটালিও পিছিয়ে ছিল না। ১৯০০ সালেব মধ্যেই সেখানে ৪০০টি সমবায়িত ডেয়েরির আবির্ভাব ঘটে। সমবাযের এই ঘটা ও সাফল্য দেখে সেখানকার রাজমিস্ত্রী ও দক্ষ শ্রমিকরাও জাতীয় পর্যায়ে সমবায় গঠনের প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছিল। উৎপাদনকারী ও ভোক্তাদের সমবায় পশ্চিম ইউরোপে খুব স্বাভাবিক ঘটনা ছিল। দক্ষিণ ইউরোপে শ্রমিক সমবায়ের এই পরিকল্পনা ছিল খুবই অভিনব। ১৮৭৩ সালে ঘেন্টে একটি অভিনব ঘটনা ঘটেছিল। সেখানে বেকারি (Bakery) শ্রমিকরা একটি সমবায়িত বেকারি স্থাপন করে। সমবায়িত শ্রমিক প্রচেষ্টায় সুলভে রুটি ও খাদ্য সরবরাহ করার ফলে সেখানে রুটির দাম কমে যায়। শ্রমিকদের চেষ্টায় দ্রব্যমূল্য কমানোর এই ঘটনা অভিনব। এই ঘটনার থেকে শিক্ষা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল ভুরউইট (*vooruit*) — এক ব্যাপক সমবায় সংগঠন যার প্রেরণায় বেলজিয়ামের প্রত্যেকটি বড় শহরে ছোট বড় নানা ধরণের সমবায়ের বিকাশ ঘটেছিল। দোকান, বিপণন কেন্দ্র, কাফে (cafe), আহার-ভান্ডার, পানশালা, পাঠাগার, বেকারি, সুরা ও পানীয় উৎপাদন কেন্দ্র (brewery) সমস্ত কিছুকেই সেখানে সমবায়ের মধ্যে আনা হয়েছিল। ফলে সেখানে আধুনিক জীবনমানের অনেক দিকই পরিশীলিত সমবায় পরিষেবার মধ্যে এসে পড়েছিল। ১৮৮১ সালে ব্রাসেলসে (Brussels) শুরু হয়েছিল মায়সোঁ·দ্যু পিউপল্ (*Maison du Peuple*) যা উপরিউক্ত ধারার মধ্য দিয়ে বিকাশ লাভ করেছিল। দ্বিতীয় ইন্টারন্যাশনালের (Second International) হেড কোয়ার্টার্স প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ব্রাসেলসে। সুইডেনে সমবায় আন্দোলন শুরুতে ব্যাপক হতে পারেনি। ১৮৯৯ সালে wholesale society গঠিত হওয়ার সময় পর্যন্ত সেখানে সমবায় আন্দোলন ছিল সীমিত ও স্থানিত (localized) এরপর থেকে এই আন্দোলনের পালে হাওয়া লাগে এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত তা বড় জলে ভাসতে থাকে।

একথা মনে রাখা দরকার যে পশ্চিম ইউরোপ বা জার্মানির তুলনায় রাশিয়াতে শিল্পায়ন দেরিতে শুরু হয়েছিল। সেখানে শিল্পায়ন ছিল ধীর, শিল্প সংগঠন ছিল সনাতন ও সঙ্কীর্ণ এবং সমবায় আন্দোলন সেখানে আত্মপ্রকাশ করেনি। খনি, যানবাহন ও নির্মাণ শিল্পে সেখানে সবচেয়ে জনপ্রিয় ও গ্রাহ্য সংগঠন ছিল আরটেল (*artel*)। এইটি হল শ্রমিক গোষ্ঠীর সমবায় যাকে ঐতিহাসিকরা সমবায়িত শ্রমিক গোষ্ঠী (Co-operative labour group) বলে থাকেন। এই ব্যবস্থায় একজন শ্রমিক চুক্তিবদ্ধ আয়ের নিজস্ব ভাগটি (agreed share of the earning) গ্রহণ করতেন। তার বদলে শিল্পকে (industry) তিনি দিতেন চুক্তিবদ্ধ শ্রমের নিজস্ব ভাগটি (agreed share of the work)। মালিকপক্ষ বা শিল্পের (industry) সঙ্গে শ্রমিক গোষ্ঠীর চুক্তি স্বাক্ষরের সময়ে আলাপ আলোচনার মধ্য দিয়ে বার্গেন (Bargain) করার দায়িত্বে থাকতেন একজন দক্ষ শ্রমিক নেতা। তিনিই কাজের ও চুক্তিবদ্ধ আয়ের বন্টন করে দিতেন শ্রমিকদের মধ্যে। কখনো কখনো আর্টেল হত ভ্রাম্যমান। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে ভ্রাম্যমান আর্টেলের সদস্য হত ছুতোর বা রাজমিস্ত্রীরা। এইরকম ২০ থেকে ২০০ জন ছুতোর বা রাজমিস্ত্রী নিয়ে এক একটি আর্টেল তৈরী হত। কর্মশক্তির (work force) এমন দলবদ্ধ ভ্রমণ সচরাচর অন্য কোথাও দেখা যেত না। আসলে পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলিতে কর্মসংস্থান ছিল অনেক বেশী, ফলে সেখানে দক্ষ কর্মীরা স্থিতিশীল থাকতে পারত। ইউরোপে মধ্যযুগে দশম শতাব্দীর পর থেকে — অর্থাৎ যে সময়টিকে ঐতিহাসিকরা High Middle Ages বলে থাকেন সেই সময়ে — ইউবোপের অনেক কারিগর দেশ-দেশান্তর ঘুরে বেড়াতেন। রোমান সাম্রাজ্য পতনের পর, বর্বর আক্রমণের ধ্বংসলীলা শেষ হওয়ার পর আস্তে আস্তে ইউরোপে নির্মাণের প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়েছিল। ক্যারোলিঞ্জিয়ান সাম্রাজ্য ইউরোপে ঐক্য এনেছিল, আর শার্লম্যানের শাসন এনেছিল শান্তি। এর প্রেক্ষিতে তৈরি হচ্ছিল গির্জা, অট্টালিকা ইত্যাদি। ঐতিহাসিক R.H.C. Davis বলেছেন যে এটি ছিল নগরায়ণের সূচনার সময়। ফলে সারা মহাদেশ জুড়ে দরকার হচ্ছিল রাজমিস্ত্রী, ছুতোর প্রভৃতি শ্রমিক-কারিগরের। তাদের ডাক পড়ছিল দেশ-দেশান্তর থেকে। তারা ঘুরে বেড়াচ্ছিল সারা মহাদেশে।

আর্টেলের অন্তর্ভুক্ত মিস্ত্রীরা ছিল প্রধানত গ্রামের মানুষ। নির্দিষ্ট শ্রমিক নেতা-ঠিকাদারের অধীনে শহরে কাজের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়ে তারা দল বেঁধে শহরে চলে যেত। সেখানে সারা বছর তারা কাজ করে চুক্তির শর্ত প্রতিপালন করত। শীতের আগেই তাদের কাজ শেষ করতে হত। শীতের শুরুতে তারা গ্রামে ফিরে আসত এবং তিন থেকে চার মাস তারা নিজ নিজ গৃহে বসবাস করত। গ্রামে সারা বছর যে কৃষক শ্রমিকরা থাকত তারাও অনুরূপ পদ্ধতিতে সঙ্ঘবদ্ধ হত। সুতোকাটা (spinning),

তাঁত বোনা, ধাতুজ কর্ম করা (metal work) যেমন লোহার, কামার ইত্যাদিদের কাজ, গাছ কাটা ও কারুশিল্প (wood work) ইত্যাদি গ্রামে নিজেদের বাড়িতে বা কর্মশালায় ও কারখানায় করতে হত। এইসব কারিগর শ্রমিকরাও যূথবদ্ধতার নীতি গ্রহণ করেছিল। কারখানাগুলি হয়ে উঠছিল সমবায়িত কর্মশালা। আপন গৃহাভ্যন্তরের কারখানাও এই সমবায়ের অঙ্গীভূত হচ্ছিল। কারিগরদের দেখাদেখি কৃষক ও কৃষি-শ্রমিকরাও অনুরূপভাবে সমবায় গড়ে তোলার চেষ্টা করছিল।

আর্টেল বা সমজাতীয় সংগঠন ছিল একেবারেই রুশ উৎপাদন ব্যবস্থা যা সমস্ত অর্থেই অভিনব যার মধ্যে সাময়িক সার্থকতা ও দীর্ঘমেয়াদী অনগ্রসরতা লুকিয়েছিল। এর সার্থকতার দিকটি ছিল এইরকম। এটি শ্রমিকদের দলবদ্ধ করেছে, তাদের সঙ্ঘশক্তিকে বাড়িয়েছে, তাদের কালেকটিভ বার্গেনের (collective bargain) ক্ষমতাকে জোরদার করেছে। এটি তাদের গ্রামীণ অসহায়তা কাটিয়ে চতুর শহরে ব্যবস্থার মুখোমুখি দাঁড়ানোর ও নগর জীবনের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার মতো শক্তি জোগাত। এছাড়া এর দ্বারা বাড়ত তাদের কারিগরি দক্ষতা (craftsmanship), তাদের অপরিচিত পরিবেশে পরিশ্রম করার ক্ষমতা (industriousness), তাদের বিরতিহীন কর্মনিযুক্তির সম্ভাবনা। এর দ্বারা গ্রামীণ কর্মসম্ভাবনা (employment potential) বৃদ্ধি পেত এবং বেকারির (unemployment) মাত্রা কমে যেত। সবচেয়ে বড় কথা গ্রাম্য শ্রমিকদের জীবিকার বিপন্নতা এর দ্বারা বন্ধ হয়েছিল এবং শহর থেকে নগদ অর্থ যা গ্রাম্য অর্থনীতিতে ছিল অপ্রতুল তা গ্রামে ফিরে আসত এবং কৃষির জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের জোগানকে অব্যাহত রাখত। কিন্তু এই ব্যবস্থার বিপদের দিকটি ছিল আরও বড়। এর দ্বারা শহর গ্রামের উপর নির্ভরশীল থাকত এবং শহরের নিজস্ব কোন শ্রমিক শ্রেণী (urban proletariat) এর দ্বারা সৃষ্টি হত না। শহরের শিল্প গ্রামের কৃষি কাজের সঙ্গে যুক্ত থেকে নিজের অগ্রগতির প্রেরণা হারিয়ে ফেলত। এর ফলে শিল্প থেকে যেত গ্রাম্য শ্রমিক ও গার্হস্থ্য কারিগরির মধ্যে আবদ্ধ একটা ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থায় যন্ত্রের প্রয়োগ হত কম, তার প্রয়োজনীয়তাও গড়ে উঠত না। ফলে শিল্পের ভেতর থেকে পুঁজির উদ্ভব হত না এবং শেষ পর্যন্ত যন্ত্রায়িত (mechanized) না হওয়ার ফলে শিল্প থেকে যেত অনগ্রসর। প্রগতিহীন কৃষিব্যবস্থার সঙ্গে শিল্পের অদৃশ্য বন্ধন শেষ পর্যন্ত রুশ অর্থনীতির পক্ষে মঙ্গলজনক ছিল না। এর ফলে রুশ অর্থনীতি থমকে গিয়েছিল। এই থমকে যাওয়া অর্থনীতিকে বদলানোর জন্য বিশ শতকে রাশিয়াকে বিপ্লবের পথে যেতে হয়েছিল।

রাশিয়ার শ্রমিক ইতিহাস বুঝতে হলে অন্য একটি বিষয়কেও বুঝে নিতে হবে — তা হল রাশিয়ার আয়তন ও জনসংখ্যা। রাশিয়া ছিল একটি বিরাট দেশ যার সর্বত্র

জনসংখ্যা এক ছিল না। পূর্বদিকে বিস্তীর্ণ অঞ্চল ছিল জনবসতিহীন বা স্বল্পবসতিপূর্ণ। সাইবেরিয়া ও ট্রান্স ককেসিয়া অর্থাৎ ককেসিয়ার পরপারের ভূখন্ড ছিল এইরকম অঞ্চল। এই অঞ্চলে জন-অভিবাসনের নীতি ১৮৬৫ সাল পর্যন্ত সরকার গ্রহণ করেনি। দেশের পশ্চিম থেকে পূর্বে জনগোষ্ঠীকে সরিয়ে নিয়ে গেলে পশ্চিমের শ্রমিক যোগান কমে যাবে, সেখানকার উন্নয়ন ব্যাহত হবে এবং ঠিকাদার ও ভূস্বামী ও কারখানার মালিকদের বার্গেন (Bargain) করার ক্ষমতা কমে যাবে, শ্রমিকরা অনেক বেশী মজুরি দাবী করবে — শেষ পর্যন্ত দেশের স্থিতিশীল অর্থনীতি উচাটন হয়ে পড়বে — এমন আশঙ্কা সরকারের ছিল। এছাড়া গ্রামের যৌথ সম্পত্তি সংরক্ষণের যে সংগঠন ছিল 'মীর' (*Mir*) তার তরফ থেকেও এইভাবে জনগোষ্ঠীকে সরিয়ে নেওয়ার বিরুদ্ধে শক্তিশালী প্রতিরোধ ছিল। গ্রামের করভার মীরদের অন্তর্ভুক্ত কৃষকদের মধ্যে বন্টন করে দেওয়া হত — ফলে কৃষক সংখ্যা বেশী হলে করভার লাঘব হত আর কম হলে করভার বেশী হত। ফলে মীর-এর পক্ষ থেকে শ্রমজীবী মানুষদের স্থানান্তরে বসতি স্থাপনের যে কোন প্রচেষ্টার বিরোধিতা করা হত। এই চাপের (restriction) ফলে শ্রমজীবীব গতিশীলতা (mobility) কমে যেত। দেশের মূল ভূভাগ থেকে ইউরোপে স্বেচ্ছা-সমবায় (voluntary association) বিপুলভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছিল। ১৯০৩ সালে ব্রিটেনে শ্রমিকদের শিক্ষা সংগঠন — *Workers' Educational Association* প্রতিষ্ঠিত হল। এর সাথে সাথেই এল অনেক নারী সমিতি (*Women's League*), যুবক সঙ্ঘ (*Youth Clubs*) ইত্যাদি। জার্মানিতে দেখা গিয়েছিল এক অত্যুৎসাহী এবং অস্থির যুব আন্দোলন (*Wondervogel*)। ফ্রান্সে দেখা গিয়েছিল ক্যাথলিক সংগঠন *French Catholic Popular Institutes* — এগুলি সংক্ষেপে Popular Institutes বা জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান নামে বিখ্যাত। এইভাবে সমাজব্যাপী নানা সংগঠন ও সমবায় প্রতিষ্ঠিত হতে থাকলে শ্রমিকরা নানা প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত হতে থাকে এবং শ্রমিকদের গতিশীলতা (mobilization) প্রতিষ্ঠানিত (Institutionalized) হয়ে পড়ে। যারা একটু শিক্ষিত ছিলেন তারা — জনগণের মধ্যে আলোকপ্রাপ্ত মানুষরা — সংগঠন ও পরিচালন (Organization and Management) সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা ও শিক্ষালাভ করতে থাকেন। সমস্ত দেশব্যাপী একটি করে সুসংগঠিত সমাজ আত্মপ্রকাশ করছিল এবং একটি পূর্ণ সমাজের নয়া অনুভূতি a new sense of community মানুষদের স্পর্শ করছিল। আত্মশক্তি ও জাতীয় সংহতির থেকে আহৃত বৃহত্তর নিরাপত্তাবোধ থেকে জন্ম নিচ্ছিল এক নতুন বৌদ্ধিক ও বৈষয়িক উন্নয়নের আকাঙ্ক্ষা। আর এই আকাঙ্ক্ষা মুক্ত করে দিয়েছিল বিকাশের চারটি দরজা — নগরায়ণ, শিক্ষার উন্নয়ন, জাতীয়তাবাদ ও তার উন্মোচনশীল নয়া প্রকরণ এবং গণতন্ত্র ও তার অন্তর্নিহিত বোধগুলির উদ্বোধন।

সীমান্তের দিকে জনবসতির অভিবাসন কখনোই হয়নি। শ্রমের অভাবে অনুন্নত অঞ্চল বছরের পর বছর অনুন্নত থেকেই যেত। ১৮৬৬ সালের পর থেকে সরকারের গৃহবসতি নীতি — homestead policy-র ফলে ট্রান্সককেসিয়ায় একটু একটু করে বসতি বাড়তে থাকে। এক একটি ১৩৫ একর জমির উপর শ্রমিকদের ডেরা বাঁধার এক একটি একক গঠন করার পরিকল্পনা হয়। তদনুযায়ী অভিবাসন হতে থাকে। কিন্তু তার গতিও ছিল মন্থর কারণ পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন ছিল শ্লথ ও সবিরাম। ১৯০৫ সালের আগে সাইবেরিয়াতে রেল ব্যবস্থা পৌঁছায়নি। এর পরেও আরও দীর্ঘদিন লেগেছে রাশিয়ার পূর্বদিকে বিস্তীর্ণ এশিয় পশ্চাদভূমিতে তার উন্নয়নের রথকে পৌঁছে দিতে। রাশিয়ার ইউরোপীয় অঞ্চল থেকে তার এশিয় অঞ্চলে জনগোষ্ঠীকে তুলে নিয়ে যেতে বলপ্রয়োগ করতে হয়েছিল। শাস্তিমূলক ব্যবস্থা ছাড়া এই উপনিবেশায়ন (colonization) সম্ভব ছিল না। বলপ্রয়োগ করে ১৮৫৩ থেকে ১৮৭৪ সালের মধ্যে প্রায় আড়াই লক্ষ লোককে সাইবেরিয়াতে প্রেরণ করা হয়েছিল। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তা ছিল নিতান্তই কম।

রাশিয়া যখন তার জনগণের বিষম বন্টন, শ্রমশক্তির স্থান-বিশেষ (region specific) অবস্থান, তার অভিবাসন নীতি, আর্টেল ইত্যাদি নিয়ে ব্যস্ত ছিল তখন ইউরোপের অন্য দেশ শ্রমজীবীদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংগঠনের বাইরেও ভিন্নতর সাংস্কৃতিক সংগঠন ও সমবায় নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাচ্ছিল। বেলজিয়াম, জার্মানি প্রভৃতি দেশে এইসব সংগঠন রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু তাদের মূল কাজ কখনোই রাজনৈতিক ছিল না। এই সময়ে সমস্ত ইউরোপে নানাবিধ স্বেচ্ছাসংগঠন (voluntary associations) গড়ে উঠেছিল। ১৯০৩ সালে ইংল্যান্ডে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল শ্রমিক শিক্ষা সংগঠন (*Workers' Educational Association*)। এর সাথে সাথে মহাদেশের নানা স্থানে দেখা যেতে লাগল নানাবিধ নারী সঙ্ঘ (Women's Leagues) ও যুবক সঙ্ঘ (Youth Clubs)। জার্মানিতে দেখা দিল এক অস্থির যুব আন্দোলন (*German Youth Movement*) — *Wondervogel*। ১৯০০ সালের মধ্যেই ফ্রান্সে অসংখ্য ফরাসী ক্যাথলিক জন-শিক্ষালয় (*French Catholic Popular Institutes*) আত্মপ্রকাশ করেছিল। এছাড়া সারা মহাদেশ জুড়ে গড়ে উঠেছিল নানা বণিক-প্রতিষ্ঠান, বাণিজ্য সভা (Chamber of Commerce) ও ব্যবসায়িক পরামর্শমন্ডলী (Trade Councils)। সমাজের প্রত্যেক স্তরেই সমবেত হওয়ার, সম্মিলিত কর্মসূচী গ্রহণের এবং একক প্রচেষ্টার বদলে যৌথ উদ্যোগের একটি পরিমন্ডল আত্মপ্রকাশ করেছিল। এইভাবে প্রত্যেক ক্ষেত্রে সম্মিলিত যে সমাজ গড়ে উঠেছিল তার মধ্য দিয়ে ইউরোপের মানুষ সংগঠন করার অভিজ্ঞতা (experience of organization) ও পরিচালনের দক্ষতা

(management skills) অর্জন করছিল। তার সাথে তারা শিখছিল নিজেদের একক অবস্থানের স্থলে সম্মিলনধর্মী উদ্যোগ গ্রহণের গুরুত্ব। এইভাবে আস্তে আস্তে ইউরোপে একটি নতুন পরিবেশে সমাজের ধারণা আত্মপ্রকাশ করছিল। যে প্রজন্ম এই নতুন পরিবেশে আবির্ভূত হল তারা এই নয়া সমাজবোধের দান (product of a new sense of community)। এই নয়া সমাজে উদীয়মান প্রজন্ম শিখছিল এক নতুন আত্মনির্ভরতা, গ্রহণ করছিল সমবায়ের মধ্য দিয়ে আত্মশক্তি ও বুদ্ধির প্রশিক্ষণ, গড়ে তুলছিল এক জাতীয় সংহতি এবং সেই সংহতির মধ্য দিয়ে একটি জাতীয় ও সামাজিক নিরাপত্তা। এইরকম একটা পরিমন্ডলের মধ্যে একটা বৌদ্ধিক বিকাশ ও বৈষয়িক উন্নতির দ্বার খুলে গিয়েছিল। এইরকম যে সংহতি ও উন্নতির পরিমন্ডল তার মধ্যে জন্ম নিয়েছিল চারটি অতি আধুনিক ধারা — নগরমনস্কতা (urbanism), শিক্ষা (education), জাতীয়তাবাদ (nationalism) এবং গণতন্ত্র (democracy)। এইভাবে বিংশ শতাব্দীর শুরুতেই ইউরোপের মানুষ জেগে উঠল এক নতুন যুগের ভোরে। শুরু হল তার নতুন পদসঞ্চার।

এইরকমভাবে সমাজব্যাপী যখন গুচ্ছবদ্ধ হওয়ার প্রবণতা দেখা দিচ্ছিল তখন শ্রমশক্তির মধ্যেও সঙঘবদ্ধ হওয়ার প্রবণতা দেখা দেয়। ১৮৭১ সালের মধ্যেই পশ্চিম ইউরোপে শ্রমসংগঠন এক শক্তিশালী ঐতিহ্য গড়ে তুলেছিল। এখন বৃহৎ ব্যবসায়ের চাপে নতুন করে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন দেখা দিতে লাগল। সামাজিক সম্মিলনের যুগে ব্যবসায়ের মধ্যে গুচ্ছবদ্ধতার প্রবণতা দেখা দিয়েছিল। এর ফলে পুঁজির ঘনীভবন ঘটছিল। ব্যবসায়ের সঙঘবদ্ধ ও পুঁজির ঘনীভবন শ্রমিকদের উপর নতুন চাপ সৃষ্টি করছিল। এই চাপকে প্রতিরোধ করতে গিয়ে শ্রম আন্দোলনের মাঝে ট্রেড ইউনিয়নের ধারাকে আরও তীব্রভাবে জাগিয়ে তুলেছিল। ১৮৭১ সালের পর অর্থনৈতিক প্রসার ঘটছিল। তারই সূত্র ধরে আসছিল নতুন সুযোগ-সুবিধা, নতুন উৎসাহ, নতুন প্রেরণা, নতুন কর্মোন্মোদনা। সমস্ত ইউরোপের যে সব অঞ্চল শিল্পায়িত হয়েছিল সেই সমস্ত অঞ্চলে এই ছবি এক, তাদের উন্নয়নের নক্সা ছিল প্রায় একই। বিশালাকারের ফ্যাক্টরি, কারখানা, কর্মশালা (firms) আত্মপ্রকাশ করছিল। তারা শ্রমের সারটুকু শুষে নিতে চাইছিল। শ্রমিকদের বাঁচার তাগিদে ঐক্যবদ্ধ হতে হল। ফ্যাক্টরি বড় বড় হওয়াতে শ্রমিকদের সংখ্যাও বৃদ্ধি হচ্ছিল, আর সংখ্যাধিক্যের ফলে তাদের সঙ্ঘশক্তিও মজবুত হচ্ছিল। এর ফলে শ্রম-একক (labour units) এই সময়ে একটি যূথবদ্ধ বড় এককে পরিণত হচ্ছিল। সব মিলিয়ে শিল্প বনাম শ্রমের দ্বন্দ্ব ও পারস্পরিক দেওয়া-নেওয়া এক নতুন মাত্রা পাচ্ছিল। এদিকে বড় শিল্প-একক (industrial unit) তৈরী হওয়ার ফলে দক্ষ মালিক (competent owners), নতুন শিল্পে ক্ষমতা সম্পন্ন নতুন নেতৃত্বেরও (*powerful new captains of industry*) আবির্ভাব ঘটছিল। এইরকম

শক্তিশালী নয়া শিল্প নেতৃত্বের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হলে নয়া শ্রমসংগঠন ও শ্রমনেতৃত্বেরও দরকার ছিল। তাই শ্রমশক্তিকে প্রতিষ্ঠানবদ্ধ (Institutionalized) হওয়ার প্রয়োজন ছিল। প্রতিষ্ঠানবদ্ধ হলে শ্রমিকরা তাদের যৌথ বার্গেন-ক্ষমতা (collective bargaining) বৃদ্ধি করে মালিকপক্ষের সঙ্গে লড়াই করতে পারত। এই সময়ে ইউরোপে গণতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণা বৃদ্ধি পাচ্ছিল। ফলে সংগঠন করার স্বাধীনতা (freedom of association) এবং আইনের নিরাপত্তা (legal protection) এই দুইই বৃদ্ধি পাচ্ছিল। তার সুযোগ নিয়ে শ্রমিকদের মধ্যে ইউনিয়ন করার অধিকার ও প্রবণতা ক্রমশ একটা নিশ্চিত রূপ নিচ্ছিল। শ্রমসংগঠনের তহবিল (union funds) , তাদের অভ্যন্তরীণ কর্মচারী ও পদাধিকারীরা (officials) এবং মালিক পক্ষের সঙ্গে তাদের বার্গেন করার সাহস ও সক্ষমতা — সবকিছুই একটা নির্দিষ্ট বিন্যাসের মধ্যে আসছিল। প্রতিষ্ঠানবদ্ধতা তাই হয়ে দাঁড়াচ্ছিল এই সময়ের শ্রম আন্দোলনের একটি স্বাভাবিক গতি। বলা যেতে পারে বিংশ শতাব্দী শুরু হওয়ার কিছুকাল আগে ও পরে এমন একটি সময়ের সূচনা হয়েছিল যখন ট্রেড ইউনিয়ন ইতিহাসের একটি নতুন যুগ শুরু হল। ১৮৭১ সালে ব্রিটেনে ট্রেড ইউনিয়নকে আইনের স্বীকৃতি দেওয়া হয়। ফ্রান্সে এ স্বীকৃতি দেওয়া হল ১৮৮৪ সালে, অস্ট্রিয়াতে ১৮৭০ সালের মধ্যেই, জার্মানিতে ১৮৯০ সালে বিসমার্কের সমাজতন্ত্র বিরোধী আইনগুলির (anti-socialist laws) মেয়াদ শেষ হলে পর এবং স্পেনে ১৮৮১ সালে। এর অর্থ হল এই যে ১৮৭১ সালে প্যারিস কমিউন নামে পৃথিবীর প্রথম প্রলেতারিয় শাসনতন্ত্র ফ্রান্সে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময় থেকে ইউরোপে শ্রম আন্দোলন নতুন রূপ নিচ্ছিল। তবে একথা ভাবার কোন কারণ নেই যে শুধুমাত্র সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের জন্যই শ্রম আন্দোলন প্রতিষ্ঠানবদ্ধ (Institutionalized) আন্দোলনের রূপ নিচ্ছিল। আসলে পুঁজির ঘনীভবন ও শিল্পের অতিকায় আকৃতিধারণ শ্রমিক শ্রেণীকে সঙ্ঘবদ্ধ ও প্রতিষ্ঠানবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনকে বাড়িয়ে দিয়েছিল। আর এই প্রতিষ্ঠানবদ্ধতার জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশ এনে দিয়েছিল গণতান্ত্রিকতা ও রাষ্ট্রচিন্তায় নতুন শ্রম সম্বন্ধে উদারিকরণের ভাবনা। সব মিলিয়ে একটি নতুন শ্রম-উজ্জীবনের ঘটনা ঘটতে চলেছিল এই সময়ে। আরম্ভ হয়েছিল ইউরোপ তথা পৃথিবীর শ্রম ইতিহাসের নতুন যুগ।

রঞ্জিত সেন এম. এ., পি এইচ ডি., ডি. লিট. কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক। তিনি ১৯৯২ সালে পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদের আধুনিক ভারত শাখার সভাপতি ছিলেন। ১৯৯৮ সালে তিনি সভাপতিত্ব করেছেন ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের আধুনিক ভারত শাখার অধিবেশনে। তাঁর চল্লিশ বছর শিক্ষকতার জীবনে তিনি দুইশটিরও বেশি প্রবন্ধ লিখেছেন। গ্রন্থও লিখেছেন অসংখ্য। তাঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণগুলি নীচে উল্লিখিত হল --

1. The Metamorphosis of the Bengal Polity 1700-1793
2. The Economics of Revenue Maximization in Bengal 1757-1793
3. Understanding Indian History
4. Social Banditry in Bengal : A Study in Primary Resistance 1757-1793
5. Calcutta in the Eighteenth Century Vol. I
6. A Stagnating City Calcutta
7. Property, Aristocracy and the Raj [in the press]
8. The Twin in the Twist : Bose and Gandhi
9. Class, Caste and the Raj [Coauthor Dr. Snigdha Sen]
10. New Elite and New Collaboration

বাংলা বই

১। স্বদেশ ও সমকাল

২। আবহমান ভারত

৩। মহাবিদ্রোহ ও ভারতীয় উদাসীনতা (সহলেখক ডঃ স্নিগ্ধা সেন)

৪। ভাবিত পুরুষ ও অভাবিত নারী

৫। বাংলার সামাজিক ডাকাতি ঃ একটি প্রাথমিক প্রতিরোধ ১৭৫৭-১৭৯৩

৬। বাংলাদেশের রাজস্ব শাসন ঃ ১৮ শতক

৭। স্বদেশ ও সভ্যতা

প্রকাশিতব্য বাংলা গ্রন্থ

১। পত্রগুচ্ছ (সম্পাদনা)

২। মহাবিদ্রোহ ও অনাদৃত ভারতবোধ (সহলেখিকা ডঃ স্নিগ্ধা সেন)

৩। বাংলার শ্রমশক্তি (সম্পাদনা)

৪। কলকাতা

৫। লুপ্ত শতক

প্রকাশিতব্য ইংরাজি গ্রন্থ

1. The Captive Lady
2. Between a Revolt and a Rebellion : The Empire on the Anvil 1857-1905